উৎসর্গ

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

করকমলে—

এই লেখকের :—

ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
রাত্রির তপস্যা
নববধূ
দুর্ঘটনা
ভাড়াটে বাড়ী
ছুটি
আব্ছায়া
রজনীগন্ধা
পুরুষ ও রমণী
বহুবিচিত্র
স্বর্ণমুকুর
রাত্তমোহানা
প্রভাতসূর্য্য
জ্যোতিষী
মালাচন্দন
সীমান্তরেখা
কোলাহল
সমারোহ
কমা ও সেমিকোলন
কাছে আছে যারা
চতুর্দোলা
স্মরণীয় দিন
কঠিন মায়া
শ্রেষ্ঠ গল্প
গল্পসঞ্চয়ন
জন্মেছি এই দেশে
মিলনান্ত
প্রভৃতি—

একটা বন্যা বা ঐরকম একটা কিছু দুর্ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে একটা অভিনয় করবে। আপাতত নাটকটা রিহার্স্যাল দিয়ে রাখা যাক—দুর্ঘটনার অভাব হবে না। নাটক ঠিক হ'ল। এইবার অনুরোধ এল মলয় আর তপতীকে অভিনয়ে নামতে হবে।

তপতী প্রথমটা রাজী হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মলয়ের আগ্রহে যখন রাজী হ'ল তখন দেখা গেল তারই চাড় বেশি। আসলে উচ্চ মধ্যবিত্তের এই কর্মহীন জীবনে তার তখন অরুচি ধরে গেছে। তবু রিহার্স্যালেও ততটা বোঝা যায়নি—যথাসময়ে অভিনয়ে গিয়ে দেখা গেল যে নাচে গানে অভিনয়ে তপতী অসাধারণ। সকলের মুখেই তার প্রশংসা। মেয়েদের চোখে ঈর্ষা ও পুরুষের চোখে স্তুতি—তপতীকে সাফল্যের নেশা লাগিয়ে দিলে। সে সেই রাত্রেই পরের অভিনয়ের তারিখ ঠিক ক'রে ফেললে।

এইবার তার জীবন নতুন গতিপথ খুঁজে পেলে। এক বড় ফিল্ম কোম্পানীর মালিক এসে চেক আর কনট্রাক্ট্ ফর্ম ফেলে দিলেন। তাঁদের আগামী আকর্ষণে নায়িকার ভুমিকায় নামতে হবে। তাঁরা এর আগের অভিনয়ে ফ্ল্যাশ ফোটো নিয়েছিলেন, সে ফোটো খুব ভাল উঠেছে। ছবি ভালই হবে তাঁরা আশা করেন। চেক্-এ অঙ্ক বসানো নেই—তপতী যে-কোন টাকার অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারে।

তপতীর চোখ জ্বলে উঠল—সেই সঙ্গে মলয়েরও। তপতী সর্ত করলে মলয়কেও কোন ভুমিকা দিতে হবে। প্রযোজক যিনি—তিনি আরও একটু বেশী ক'রে স্থবিধা দিলেন, বললেন,—'বেশ ত অভিনয় উনি করুন। আর সেই সঙ্গে আমাদের ডিরেক্টারকেও য়্যাসিস্ট্ করুন না। ও কাজটা শিখে গেলে আর ভাবনা কি ?'

মলয় সাগ্রহে রাজী হ'ল। শুধু সাহেবীয়ানাতে ওরও একটু একটু অরুচি ধরে আসছিল বোধহয়।

তপতীর প্রথম ছবিই—ছবিও'লাদের ভাষায়—হিট্ করলে। সাফল্যের নেশায় তপতী মেতে উঠল।

এক সঙ্গে একদিনে তিনটে কোম্পানির সঙ্গে কনট্রাক্ট করলে। তার ভেতর একটিতে মাত্র মলয় রইল—বাকী দুটোতে শুধুই তপতী।

মলয় মৃদু আপত্তি তুলেছিল বৈ কি !

'ইউ আর গোয়িং টু ফাস্ট, মাই ডিয়ার !'

ঈষৎ সুরারক্ত দুটি চোখ স্বামীর মুখের ওপর মেলে, একটু বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে তপতী প্রশ্ন করেছিল, 'আর ইউ গেটিং জেলাস—ডার্লিং ?'

'অফ্ কোর্স নট !' জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিল মলয়, 'আই য়্যাম্ ওনলি থিঙ্কিং অফ্ ইউ !'

'ডোণ্ট ট্রাবল্ ইওর ব্রেন আননেসেশারিলি, আই ক্যান ওয়েল্ টেক্ কেয়ার অফ্ মাই সেল্ফ্ !' আর একটু হেসেছিল তপতী।

মলয়ের মুখ আগুনের মতই রাঙা হয়ে উঠেছিল কিন্তু প্রতিবাদের কোন ভাষা খুঁজে পায়নি।

এরপর একটু একটু ক'রে কিন্তু সত্যিই তপতী দূরে সরে যেতে লাগল।

প্রতিদিনই শ্যুটিং থাকে ওর—সারাদিন কাজ করে কিন্তু তারপরও সে বাড়ি আসে না। ওখান থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী অঞ্চলের কোন ক্যাবারেতে গিয়ে মদ খায় আর জুয়া খেলে। বাড়ি ফেরে রাত তিনটে চারটেয়—কোন কোন দিন একেবারেই ঘুমোয় না। মলয়ের সঙ্গে দেখাই হয় না। মলয় যখন ওঠে তখন তপতীর ঘুমের শুরু। দশটা নাগাদ উঠেই সে স্টুডিও যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। ড্রেসিং টেবিলের ধারে গিয়ে প্রসাধনরত স্ত্রীর নাগাল ধরতে হয় মলয়ের। তাও তপতীর মেজাজ থাকে তখন খারাপ। আর একটু মদ পেটে না পড়লে মাথা-ধরা ছাড়ে না।

মলয় মিনতি করে, 'কী করছ বুলবুল, এসব ছাড়ো। শরীর যে গেল ?'

'শরীর রেখে কি লাভ বলতে পারো ?' চোখের পাতা আঁকতে আঁকতে বলে তপতী, 'যতদিন আছে ততদিন ব্যবহার ক'রে নেওয়াই ভাল।'

'কিন্তু এ যে অপব্যবহার।'

'কি জানি। এর চেয়ে ভাল ব্যবহার ত কখন শিখিনি। তুমি ত শেখাওনি ! লিভ্ ফাস্ট—এই কি তোমার শিক্ষা ছিল না ?'

'কখনও না। একটু আধটু—এটা ওটা। সে হ'ল শখ-মেটানো। কিন্তু তাই ব'লে আমি কি ক্যাবারেতে গিয়ে মদ খেতে আর জুয়া খেলতে বলেছি ?'

'গাছ যখন পোঁতা হয় ঠাকুর মশাই, তা সামান্যই থাকে। ঐ একটু আধটু—কিন্তু তা ক্রমে বাড়ে। মহীরুহে পরিণত হয়। বিষবৃক্ষের বেলাতেও তাই খাটে। তুমি যে সাহিত্য পড়নি, কাকে বোঝাবো। বঙ্কিমের বই পড়লে বুঝতে ! ...হাউ এভার, এর ফাণ্ডামেণ্টাল কথাটা বোঝবার মত সহজ জ্ঞান আশা করি তোমারও আছে। সেটা কি ভেবে দ্যাখোনি ?'

'বুলবুল—চলো কোন দূরদেশে কোথাও যাই।'

'ছ-টা কন্‌ট্রাক্ট ডিয়ারী, তাছাড়া নিউ এম্পায়ারে তিনটে দিন নিয়েছি—কিছু টাকা তুলতে হবে। গত সপ্তাহে খুব হেভিলি হেরেছি। দেনা হয়ে গিয়েছে। টাকা চাই। রেডিওতে দুটো প্লে আছে। সময় কোথা?'

'আমি কি আজই যেতে বলছি! বেশ, এই কটা সেরে নাও। আর নতুন কন্‌ট্রাক্ট নিও না।'

'পাগল! এইবেলা সৌভাগ্যের জোয়ার এসেছে। ভাঁটা পড়বার আগে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট নিয়ে নিতে হবে। আউট অফ সাইট ইজ আউট অফ মাইণ্ড!'

রাগে ঠোঁট কামড়ায় মলয়। হাত মুঠো করে। কিন্তু জোর করতে পারে না। জোরের বাইরে চলে গেছে তপতী। আজ আর মলয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় না তাকে। তাছাড়া সেভাবে প্রথম থেকে চলেওনি মলয়। আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

তপতী সবই যে নিজে খরচ করে তা নয়। বাইশহাজার টাকা দিয়ে একখানা হাল মডেলের গাড়ি উপহার দিয়েছে সে স্বামীকে—জন্মদিনের উপহার হিসেবে। আর এক জন্মদিনে দিয়েছে দশহাজার টাকা দিয়ে পুরীর সমুদ্রতীরে এক বাড়ি। সংসারেও মধ্যে মধ্যে পাঁচ-সাতশ টাকা দেয়। কিন্তু তা আয়ের তুলনায় কমই। ব্যাঙ্কে একটা হিসেব আছে—তবে সেখানে জমে না এক পয়সাও; সেটা মলয় ভাল ক'রেই জানে।

মলয়ের ভাল লাগে না কিছু। নিজের বাড়ি মনে হয় হোটেলের চেয়েও নির্বান্ধব স্থান। চাকর-বাকররা যেটুকু করে—তাই। পুরোনো চাকর আর নেই। নতুন চাকরদের মায়া কম—দুহাতে চুরি করে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তিনচার দিন অন্তর। অবশেষে একদিন প্রকাশ্যেই রাগারাগি হয়ে গেল। তপতী ওর নিজস্ব মালপত্র নিয়ে সাহেব-পাড়ার একটা হোটেলে চলে গেল। মলয় তাকে ধরে রাখবার বা ফেরাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে না। বরং তার ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল সে বেঁচে গেল। সেও মালপত্র কিছু বেচে, কিছু একটা ঘরে গুদাম ক'রে রেখে, মোটা টাকায় বাড়িটা ভাড়া দিলে এবং নিজে গিয়ে উঠল ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে। ফুলের মালা, শঙ্খ, উলুধ্বনি এবং সানাইয়ের বাঁশীতে যার সূচনা হয়েছিল সেই উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটল মুটে ও লরির কলরবে। বিদায়ের দিন কেউ কারুর জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না।

জোয়ার বেশী দিন থাকে না। এই সাত বছরেই ভাঁটা পড়ে যায়। তবে সেটা কালের দোষ নয়—সে দোষ তপতীরই। আজকাল দিনরাতই সে মদে চুর্ হয়ে থাকে। প্রযোজকরা 'সেট' সাজিয়ে বসে থাকেন, নায়িকার দেখা মেলে না। দেখা মিললেও এমন অবস্থায় মেলে যে তাকে দিয়ে কাজ হয় না। হাজার হাজার টাকা লোকসান হয়। শুধু স্টুডিও কি সেট-এর ভাড়া নয়—অপরাপর অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও খেসারত দিতে হয়। ছবির কাজ পেছিয়ে পেছিয়ে যায়, অনির্দিষ্ট কালের ধাক্কায় গিয়ে পড়ে। ভাল অভিনেতারা তারিখ দিতে চান না আর। ওর নাম থাকলে ডিষ্ট্রিবিউটাররা টাকা দাদন দিতে চান না। যে নাম ছিল একদা চিত্রজগতের আকর্ষণ—তা হয়ে উঠল দায়।

কিন্তু চাঁদ অস্ত গেলেই বুঝি সূর্য ওঠে—প্রকৃতির নিয়ম। তপতীর ভাগ্যে যখন ভাঁটা পড়ছে মলয়ের ভাগ্যে তখনই জাগছে জোয়ার। মলয় এর আগে ছবি তুলেছিল—নাম হয়নি। ওদিকে ওর ঝোঁকও ছিল না। মোটকথা কিছুই করেনি এতকাল; শুধু টুকিটাকি বাজে কাজ ছাড়া। তপতীর সঙ্গে বিচ্ছেদ (আর সেই বিচ্ছেদের আড়ালে যে অপমান ছিল হয়ত বা—তাও) ওর মনে অদ্ভুত একটা কর্মপ্রেরণা এনে দিলে। কাজের মধ্যেই ভুলতে চাইল নিজের কৃতকর্মের ফল। কাজ করতে চায় সে। কিন্তু কি করবে? কোন কাজই জানা নেই। এমনি সময় হঠাৎ এল এক ফিল্ম কোম্পানী, ছবি পরিচালনার ভার দিতে চাইল ওকে—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে।

রাজী হ'ল মলয়।

এই রাজী হওয়াটা ওর নিজের কাছেই লাগল বিচিত্র।

তিক্ততা ছিল মনে, স্টুডিওর সমস্ত জগৎটা সম্বন্ধেই ছিল ঘৃণা। হয়ত ছিল—তবু, কাজ যে তখন ওর চাই-ই। যা হয় একটা কিছু করতে হবে ওকে। নিষ্ক্রিয়তা যে আরও অসম্ভব। শুধু সেই কারণেই হয়ত সে রাজী হ'ল এবং সমস্ত মন দিয়ে খাটতে লাগল দিনরাত।

চিত্রনাট্য যা হাতে এসেছিল তা বারবার পড়ে এবং অনেক ভেবে—আগাগোড়া ঢেলে সাজলে। সহজ গল্প সহজ ক'রে বলতে হবে এবং মানুষের উপভোগ করার মত ক'রে বলতে হবে—এটা মলয় বুঝেছিল। তারপর সে আর এক অসমসাহসিক কাজ ক'রে বসল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের ডেকে মোটামুটি একটা রিহার্স্যাল দিয়ে নিলে। এটা কোন চিত্রপ্রতিষ্ঠানই আজকালআর করেন

না—রিহার্স্যাল হয় একেবারে ক্যামেরার সামনে। মহাজন এই বাড়তি-খরচের জন্য একটু আপত্তি করেছিলেন কিন্তু মলয় তাকে বুঝিয়েছিল যে এতে শেষ পর্যন্ত খরচ কমই হবে। সেট-এ পৌছে অনেক সময় কম লাগবে। মলয় যা ভূতের মত পরিশ্রম করেছিল তা দেখে একটু নরম হয়েছিলেন প্রযোজক। তিনি আর আপত্তি করলেন না।

দ্রুত ছবি উঠল। মলয় যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিল কাজে। আহার-নিদ্রা জ্ঞান ছিল না ওর। দিনরাত খাটতে পারলেই সে বাঁচে। ফলে ছবি ভালই দাঁড়াল। কাগজওয়ালারা সাধারণত ভাল ছবি হ'লেও অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে চান না—তাঁরা কিছু কিছু ত্রুটি দেখালেন কিন্তু দর্শকদের প্রশংসা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে ছবি 'হিট' করল, প্রযোজক আশাতিরিক্ত টাকা পেলেন। এই ছবি খোলবার পনেরোদিনের মধ্যে মলয় মোটা টাকা পারিশ্রমিকের অঙ্গীকারে এবং বেশ মোটা রকমের কিছু অগ্রিম নিয়ে ছুটি নতুন ছবির চুক্তিপত্রে সই করলে।

এরপর শুরু হল ওর জয়যাত্রা। একটার পর একটা ছবি ক'রে চলল মলয় ; সবগুলিই অবশ্য 'হিট' করল না কিন্তু লোকসান হ'ল না কোনটাতেই। ফলে প্রযোজক মহলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ওকে নিয়ে। বোম্বে মাদ্রাজেও ডাক পড়ল।

কিন্তু একটানা কাজেও মনের শূন্যতা ভরে না। ভোর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ ক'রে যখন জনহীন ফ্ল্যাটে ফিরে আসে তখন একটা অজানা অবসাদে মন যেন ভেঙে পড়ে। দেহ চায় কার কোমল হাতের সেবা, কান চায় কিছু চটুল হাসির শব্দ শুনতে, কিছু অর্থহীন মিষ্ট প্রলাপ। টেবিলের উপর গরম টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার থাকে—অর্ধেকদিন তা খাওয়াই হয়না। চাকররা ঘুমে অচেতন—তাদের কি গরজ মনিবকে জোর ক'রে খাওয়াবার ?

অথচ আশ্চর্য ! এ শূন্যতাবোধ ত এতকাল ছিল না। যখন সেবা অযাচিত ভাবে আসত, তখন এই ভৃত্যরাজক-তন্ত্রই যেন ছিল কাম্য। মনে হ'ত এই জীবনই আসল জীবন। এই হ'ল ঠিক বেঁচে থাকা। গৃহগত-প্রাণ লোকগুলোর জীবন সঙ্কুচিত, ব্যাহত। ওরা জীবন্মৃত। ওদের করুণার চোখে দেখত মলয় এতদিন।

আজ কিন্তু এসব জীবন যেন অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন মনে হয়।

আলমারীতে মদের বোতল সাজানো থাকে। মলয় আর স্পর্শ করে না। লাঞ্চের সময় তার বহুদিন আগেকার খাওয়া ঘি-মাখা ভাতের সঙ্গে মোচার ঘণ্টর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মার হাতের এটা-ওটা, প্রায়-ভুলে-যাওয়া ব্যঞ্জনের কথা।

দীর্ঘশ্বাস চেপে খেতে খেতেই উঠে পড়ে মলয়। অর্দ্ধেক কোর্স তখনও বাকী থাকে। চাকররা প্রশ্নও করে না। মলয় আবার দ্বিগুণ জোরে কাজে হাত দেয়। কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে নিজেকে।

এই যখন মনের অবস্থা হঠাৎ একদিন বোম্বে থেকে ট্রেনে ফিরতে হ'ল ওকে। এয়ার রিজার্ভেশান পাওয়া গেল না। তাছাড়া নির্জনে একটু ভাবাও দরকার হয়ে পড়েছিল মলয়ের। সে পরের দিনের জন্য অপেক্ষা না ক'রে ট্রেনেই রওনা হয়ে পড়ল। একটা ফার্স্ট ক্লাস 'কুপে'তে সে একা। ভালই হ'ল—ভাবতে ভাবতে যেতে পারবে মনে ক'রে সে খুশী হ'ল।

ভাবতে চেয়েছিল যে আগামী ছবির কাহিনীটা, কিন্তু মন চলে গেল ওর নিজের কাহিনীতে। সারা পথই নিজের জীবনের ব্যর্থতা ওকে পীড়া দিতে লাগল। এই খ্যাতি, যশ,—অযাচিত এবং নিষ্প্রয়োজন অর্থ—এর কি মূল্য পুরুষের জীবনে? জীবন মহত্তর, স্ত্রীপুত্র গৃহসুখ—এর দাম ঢের বেশী। ভাবতে ভাবতে একটা কথা মনে প'ড়ে আশ্চর্য হয়ে গেল মলয়। আজ ওর জীবনে কোন আত্মীয় নেই কোথাও। অথচ ছিল সবাই। মাসী ছিল, কাকা ছিল, পিসী ছিল। মার মৃত্যুর পর যখন মুসলমান বাবুর্চি এল এবং দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে বসে স্ত্রীর সঙ্গে মদ খেতে লাগল তখন তাঁরা পালাতে পথ পেলেন না। এই সম্পর্কের যারা ভাইবোন ছিল, তারা ওর পয়সার দিকে চেয়ে আছে এই কথা কল্পনা করেই মলয় তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আছে সবাই—কাছাকাছি আছে, অথচ একান্ত নির্বান্ধব কাটছে তার জীবন।

ভাবতে ভাবতে সেদিনও ওর সারারাত ঘুম হ'ল না। ভোরের দিকে খড়্গপুরে ট্রেন থামতে ওর সহসা বিদ্যুৎ-ঝলকের মত মনে পড়ে গেল ওর বড় পিসীমা থাকেন মেদিনীপুরে; খুবই বুড়ো হয়েছেন নিশ্চয়ই, কারণ তিনি ওর বাবার চেয়েও কুড়ি বছরের বড়—একবার তাঁকে দেখে যাওয়া উচিত। হয়ত আর কোনদিন এ পথে যাওয়ার সুযোগই মিলবে না।

সে তাড়াতাড়ি, প্রায় শেষ মুহূর্তে মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ল খড়্গপুরে।

বড় পিসীমা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিনতে পারলেন না ওকে। তারপর কেঁদে-কেটে একেবারে পাগলের মত কাণ্ড করতে লাগলেন। মলয়ের বড় পিসতুতো ভাই ওর বাবার বয়সী—তিনি এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আদর-যত্ন খাওয়া-দাওয়ার কোন ত্রুটি হ'ল না। মলয়ের মনে হ'ল যে পুরো এক জন্ম ডিঙ্গিয়ে সে যেন আবার পূর্বজন্মে ফিরে এসেছে। এ যেন ঝাপ্‌সা-হয়ে-যাওয়া গত জন্মের একটা স্মৃতি। এ শুধু স্বপ্ন।

কিন্তু এইখানে আর একটি ঘটনা ঘটল।

বাড়ি ঢোকবার মুখে ওর নজরে পড়ল একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণী মেয়ে ঐ বাড়িরই পুকুর থেকে স্নান ক'রে উঠে যাচ্ছে। রূপ খুব বেশী না থাকলেও অদ্ভুত একটা লাবণ্য ছিল মেয়েটির—চোখের পলকে মলয় মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই মেয়েটিকে বাড়ির মধ্যেও দেখলে। পিসীমার ভাগ্নীর মেয়ে—পরিচয় পাওয়া গেল—সুষমা নাম। সুষমা ওর পরিচর্যাও করলে কিছু কিছু, জলখাবার দিয়ে যাওয়া, পরিবেশন করা, চা দিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চলচ্চিত্র পরিচালকের চোখ—ওর প্রত্যেকটি ভঙ্গীর মধ্যে অপূর্ব এক সুষমার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

একবেলা থাকবার কথা—একটা পুরো দিনরাতই কেটে গেল ওখানে।

পরের দিন ফেরবার সময় পিসীমা কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সবই ত শুনেছি বাবা, এমন ক'রে আর কতকাল কাটাবি ? আর একটা বিয়ে-থা কর্। বলিস ত আমার নাৎনী সুষুর সঙ্গেই কথাটা পাকা ক'রে ফেলি। বাপ-মা-মরা মেয়ে, পিছুটান নেই। ঝিয়ের মত খাটবে খাবে। তুই এত রোজগার করছিস—ঘরে যদি সুখ আরাম না থাকে ত সবই বৃথা যে! সুষু মেয়ে ভাল—তুই অমত করিসনি বাবা। তোদের পাল্‌টি ঘর—সম্পর্কেও বাধবে না।'

একেবারে 'না' বলতে পারল না মলয়—বললে, 'ভেবে দেখি একটু, পরে জানাবো পিসীমা।'

কলকাতায় ফিরে ভেবে দেখলে। দুই দিন রাত ধরে ভাবলে। বরং বলা চলে যে এদুটো দিন ভাবা ছাড়া আর কিছুই করলে না।

তারপর চিঠি লিখে দিলে, 'আমি রাজী আছি পিসীমা, তোমরা ব্যবস্থা করো!...'

মনটা স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ অসম্ভব রকমের হাল্‌কা হয়ে উঠল। ওর মন যেন তার কল্পনার পাখা মেলে সুষমার স্বপ্নচিন্তায় সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতে

লাগল। পিসীমার উত্তর না আসা পর্যন্ত কিছুই করতে পারলে না সে। গুন্-গুন্ ক'রে গান গেয়ে শুধু সে বাড়ীতে পায়চারী করে এবং বিকেল হ'লে একা গাড়ি নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে আসে। ফিল্ম ডিরেক্টারদের সঙ্গে আঠার মত যে একদল সহকারী এবং স্তাবক লেগে থাকে—এই ক-টা দিন তাদের নানা কৌশলে এড়িয়ে চলল।

পিসীমা একেবারে দিন স্থির ক'রে চিঠি দিলেন, 'তোকে কিছুই করতে হবে না বাবা, শুধু চলে আয়, এইখানেই একেবারে ফুলশয্যা সেরে কলকাতায় ফিরে যাবি!'

সেই আদেশই শিরোধার্য করলে মলয়। খানকতক দামী গহনা এবং শাড়ী কিনে, এখানে সাঙ্গোপাঙ্গদের জবরদস্ত রকমের গোটা-কতক মিছে কথা ব'লে—একটি মাত্র চাকর সঙ্গে ক'রে সে মেদিনীপুর রওনা হয়ে গেল।

বিবাহের আয়োজন এখানে সবই তখন প্রস্তুত। বাকী যেটা—সেটা মলয় সঙ্গে ক'রে এনেছিল। অর্থাৎ কাপড় ও গহনা। ওর পিসীমা ওর সামনেই সুষমাকে ডেকে এনে দেখালেন মুল্যবান বেনারসী; মাদ্রাজী, শান্তিপুরী, ধনেখালি, মুর্শিদাবাদীর বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল সমারোহ। মেলে ধরলেন নতুন চুড়ী হার আর জড়োয়া নেকলেশের বাক্স। মলয় সব গহনাই জড়োয়া আনতে পারত কিন্তু ইচ্ছে ক'রেই আনেনি। এবার সে তার ঘরের বধূকে নিয়ে যাচ্ছে—মেমসাহেবকে নয়।

এই আশাতীত সৌভাগ্যের সামনে দাঁড়িয়ে সুখে ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সুষমা; তার ফলে তাকে আরও সুশ্রী, আরও লোভনীয় দেখাল। মলয় মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক চোখে চেয়ে কল্পনা করতে লাগল তার সেই লজ্জাস্তিমিত চোখ দুটিতে আসন্ন আত্ম-নিবেদনের আবেশ-বিহ্বলতা। ওর মনে হ'ল মধ্যের এই দুটো তিনটি দিনের প্রতীক্ষাকে অধীর দুই হাতে সরিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যেত সে।

রাত্রে পল্লীগ্রামের এই অদ্ভুত পরিবেশে, অনভ্যস্ত গৃহে ও শয্যায় শুয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগল যে, সে ফুলশয্যায় সহস্র পুষ্পস্তবকের মধ্যে বসে সুষমার দেবতা-বাঞ্ছিত সুদুর্লভ তনুলতাটিকে বাহু বন্ধনে বেঁধে তার লজ্জা-নিমিলীত অক্ষিপল্লবে অজস্র চুম্বন এঁকে দিচ্ছে। আর সেই স্বপ্নেই মনে হ'ল তার ব্যর্থ ও অশান্ত জীবন এতদিনে খুঁজে পেয়েছে সার্থকতা এবং শান্তি!

পরের দিন সকালে বাগানের ভেতর চেয়ার পেতে বসে চা খেতে খেতে মন যখন পূর্বরাত্রির স্বপ্নচিন্তারই রোমন্থন করছে তখন অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী পিসতুতো ভাইটিও চায়ের কাপ হাতে ক'রে পাশে এসে বসল। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ ব'লে বসল, 'তোমার সেই তাঁকেও যে দেখলুম পরশু!'

বুকের মধ্যেটা ধক্ ক'রে উঠল কি মলয়ের ?

সে কথা কইলে না। নিস্পৃহতা দেখানোই হয়ত উচিত ছিল কিন্তু দৃষ্টি যেন নিজের অনিচ্ছাতেই জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল।

'ছি ছি! যে অবস্থায় দেখলুম—মনে হ'ল যে ধরিত্রী দ্বিধা হও, আমি তাতে প্রবেশ করি। এতবড় বংশের বউ তুই—তোর কিনা এই কাণ্ড!'

'কো—কোথায় দেখলে ?'

'কোথায় আবার। চৌরঙ্গীতে। জামাটা ছেঁড়া, শাড়ীটাও তথৈবচ। তার আঁচলটা মাটিতে লুটোতে লুটোতে যাচ্ছে। চোখ দুটি জবাফুল একেবারে। চারদিকে দশহাত অব্দি মদের গন্ধে ভরপুর, দেখি এক ব্যাটা সাহেবকে দিব্যি চৌ-চাপটে চেপে ধরেছে—এক পেগ মদের দামের জন্যে। ওর ঐ অবস্থা, অথচ ফট ফট ক'রে ইংরেজী বলছে মেমেদের মত—সব দেখে শুনে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাহেবটা শেষ পর্যন্ত সত্যিই বার করলে একটা টাকা। টাকা নিয়ে সোজা চলল লিণ্ডসে স্ট্রীটের মদের দোকানটার দিকে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল—তাও কোন লজ্জা নেই। ছোঃ!'

যেটা এতক্ষণ ফাগুনের লঘু দক্ষিণাবাতাস ব'লে মনে হচ্ছিল, তাই যেন অকস্মাৎ দম্‌কা ঝাপ্‌টার মত একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস রচনা ক'রে দিয়ে গেল! মলয়ের মনে হ'ল আজ আর কোথাও বাতাস নেই, ছোট্ট পৃথিবীটা তার চারিদিকে কারাগার রচনা ক'রে আড়াল করেছে তার নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসটুকুও।

সে যেন অস্থির হয়ে উঠল।

আরও কত কি ব'লে চলেছে ওর পিসতুতো ভাই গিরীন। কিন্তু সেদিকে তখন কান নেই মলয়ের। এ কী হ'ল তার ? কেন—কেন এমন বিশ্রী লাগছে ? অমৃতের স্বাদ মুখের মধ্যে এমন তিক্ত হয়ে গেল কি ক'রে ?

কিছু কিছু কি শোনেনি এর আগে ? শুনেছে বৈকি! হয়ত এতটা শোনেনি। তাছাড়া তখন একটা বিতৃষ্ণাই অনুভব করেছে সে। আজ, আজ যেন নিজেকে অপরাধী বোধ করতে লাগল। আজ, কেন তা সে জানে না,

আজ যেন প্রথম মনে হ'ল—তার এই সর্বনাশের জন্য মলয়ই দায়ী। মূলত এবং প্রধানত।

বেলা বেড়ে চলল। আগামী কাল বিবাহ। আনন্দের নানা আয়োজন চারিদিকে। ঠাট্টা তামাসা করছেন আত্মীয়ারা, বিশেষত বৌদি-সম্পর্কের যাঁরা। নগদ টাকাও মলয় কিছু ধরে দিয়েছিল আগের দিন পিসীমার হাতে। দস্তুর-মত সমারোহের সঙ্গেই আয়োজন চলেছে। কেবল বড়দা রসুনচৌকী আনাতে চেয়েছিলেন, মলয় বারণ করেছে। এক স্ত্রী বর্তমানে আর একটা বিবাহ। তাতে আবার সানাই! ছি!

এই সব আয়োজন আজ প্রভাত পর্যন্ত কি এক নেশার মত আমেজ এনে দিয়েছিল মলয়ের মনে। সে নেশা চলে গেল একেবারে। উদ্‌ভ্রান্তের মত বাগান থেকে বেরিয়ে এসে রৌদ্রের মধ্যেই মাঠের পথ ধরল মলয়।

সত্যিই তপতীর এই অবস্থা হয়েছে? তার স্ত্রীর? তাদের কুলবধূর?

একেবারে প্রথম দিক্‌কার বিবাহিত জীবনের কথা মনে পড়ল। আজ সুষমার মধ্যে যে সম্পদের আভাস পেয়ে সে লোলুপ লালায়িত হয়ে উঠেছে, সে সমস্ত সম্ভাবনাই কি একদিন তপতীর মধ্যে ছিল না? তপতীও কি তার অন্তরের প্রথম অর্ঘ্য, বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভার সাজিয়ে দেয়নি তার সামনে? সেদিনকার তার বিকৃত রুচি তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল বলেই সে অমৃতে তার তৃপ্তি হয়নি। সে চেয়েছে তপতীর রূপের ওপর মুখোশ, সে চেয়েছে নারীর সহজাত সলজ্জ মানসিক গঠনকে নির্লজ্জ গণিকার মনোভাবে রূপান্তরিত করতে। এ ত তারই ফল। স্ব-খাত সলিল।

পিসীমার কাছ থেকে স্নানাহারের তাগিদ এল। মলয় কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই স্নানাহার করলে। ভোজ্যের বিপুল ও বিচিত্রায়োজনে বিস্ময় প্রকাশ করতেও সে ভুলে গেল; তাতে বরং বৌদির দল একটু ক্ষুণ্ণই হলেন। কিন্তু তার মন তখন স্মৃতির রোমন্থনে ব্যস্ত। প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্য আজ আশ্চর্য স্পষ্টতার সঙ্গে মনের পর্দায় ফুটে উঠছে—ছায়াছবির দৃশ্যের মতই, একটার পর একটা।

তাহ'লে কি সে সত্যিই তপতীকে ভাল বেসেছিল একদিন?

না—এটা শুধুই অনুশোচনা?

ভাল ক'রে খাওয়া হয় না মলয়ের, অর্দ্ধপথেই উঠে পড়ে। মহিলারা একযোগে হাঁ-হাঁ ক'রে ওঠেন। তাতে বরং আজ বিরক্তিই বোধ হয় ওর।

বিশ্রামের আয়োজন ছিল। কিন্তু মলয় শুয়ে থাকতে পারলে না। একটু পরেই উঠে এসে বাগানে বসল। বাগান থেকে রাস্তায়। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সামনেই পেয়ে গেল একটা বাস। বাস খড়্গপুর যাচ্ছিল। খড়্গপুর স্টেশনে পৌঁছেই দেখলে একটা ট্রেন ছাড়ছে। কোনমতে একখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে উঠে পড়ল। কলকাতায় পৌছে পিসীমার নামে এক দীর্ঘ জরুরী তার পাঠালে—'বিয়ে করা হ'ল না। মন শেষ অবধি সায় দিলে না। কাপড় গহনা এবং টাকা, যা রেখে এসেছি সবই যেন সুষমাকে দেওয়া হয়। ভাল পাত্রে তার বিবাহ দিও। আরও খরচ লাগে আমি দেব। আমার সুটকেসটা কেউ যদি কলকাতায় আসে, তাকে দিয়ে পাঠিও।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল মলয়। গত কয়েক ঘণ্টা তার যে যন্ত্রণায় কেটেছে তা অবর্ণনীয়। একটা দিক থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত। একটা ভুলের মূল্য দিতে আর একটা বৃহত্তর ভুল করতে যাচ্ছিল হয়ত—একটা অপরাধ ভোলবার জন্য আর একটা কঠিনতর অপরাধ ক'রে বসেছিল। সে দায় থেকে ত অব্যাহতি পেলে!

সে স্নান ক'রে খানিকটা কড়া কফি খেয়ে নিলে। অবসন্ন দেহ আবার সতেজ হয়ে উঠতে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। নিজের গাড়ী বার করায় হাঙ্গামা ঢের, সে একটা ট্যাক্সী নিলে—এবং বিশেষ কিছু ভেবে দেখবার আগেই হুকুম দিলে—ধর্মতলা!

ধর্মতলার মোড়ে নেমে কিছু শঙ্কা কিছু উদ্বেগ নিয়ে হেঁটে হেঁটেই এগিয়ে চলল মলয়।

কেন সে এখানে এল? মোড়ে নেমে একটু বিহ্বলভাবেই নিজেকে প্রশ্ন করে মলয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রশ্নের নির্বুদ্ধিতাটা নিজের মনেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি গিরীনের কথা মিথ্যে হয় ত যেন সে বাঁচে। অন্তত আজ না দেখা হয়। তবু চোখ যেন ওর কিছু উৎসুক হয়েই চারিদিকের ভীড়ে কী যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। বেশীক্ষণ খুঁজতেও হ'ল না। খানিকটা এগিয়েই ওর চোখে পড়ল একটা ছোটখাটো ভীড়। যেন কোন পাগলকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলো বেকার লোক কৌতুক উপভোগ করছে।

কাছে এসে দেখলে পাগল নয়, মাতাল।

আর সে মাতাল—ওরই স্ত্রী।

এক নিমেষের ভেতর মানুষ যে এমন ঘেমে উঠতে পারে—তা এর আগে

কোনদিন টের পায়নি মলয়। দুই কান ওর অপমানে যেন জ্বালা করতে লাগল, জামাটা যেন মনে হ'ল গলায় চেপে বসেছে, নিঃশ্বাস টানতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যেই মনে হ'ল যে সে পালিয়ে যায় কোথাও। এখান থেকে অনেকদূরে কোথাও। যেখানে এ অপমানের বার্তা পর্যন্ত পৌঁছবে না। সে ঘুরেও দাঁড়াল একবার।

কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার মনকে শক্ত করলে।

না—পালালে চলবে না। প্রায়শ্চিত্ত করতেই ত সে এসেছে।

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল সে। কাছে গিয়ে ওর কাঁধটা ধরে বললে, 'তপতী, বাড়ি চলো।'

'কে? ও—মলয়? গুডলাক্। গ্ল্যাড টু মিট ইউ! কাণ্ট ইউ লেণ্ড মি সাম্ মানি? সে, টেন চিপ্‌স্? অর ফাইভ? অর এনিথিং! মাইরি মলয়—কতকাল যে ভাল বিলিতি মাল পেটে পড়েনি। দাও না দশটা টাকা—শুনেছি ত তোমার অবস্থা এখন ভাল যাচ্ছে। রোলিং ইন্ মানি!'

'ছিঃ তপতী। এরা হাসাহাসি করছে। বাড়ি চলো!'

'বাড়ি? হোম—সুইট্ হোম? ওয়েল, ওয়েল, ওয়েল! দেয়ার্স নো হোম—য়্যাট্ লিস্ট ফর মি! তিনমাস হোটেলওয়াকে এক পয়সাও দিইনি। সেখানে আর নাক-গলানো চলবে না। আমি পথেই বেশ আছি। ওন্‌লি দেয়ার্স নো মানি, দ্যাট্‌স্ দ্য ডিফিকাল্‌টী! আই ম্যস্ট হ্যাভ সাম্‌থিং ফর এ ড্রিঙ্ক! ওণ্ট ইউ স্ট্যাণ্ড মি এ ড্রিঙ্ক; মাই ডার্লিং?'

'বুলবুল—' বলতে গিয়েও যেন কথা বেধে যায় মলয়ের। দুই চোখে জল ভরে আসে অকস্মাৎ। কত আদরের ডাক ওর। প্রথম প্রণয়ের চিহ্ন ওদের! কতকাল এ নামে ডাকবার অবসর মেলেনি!

হাত ধরে টেনে আনে রাস্তার দিকে।

'চলো আমার সঙ্গে লক্ষ্মীটি!'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মলয়?'

'চলো না।'

একরকম জোর করেই তোলে একটা ট্যাক্সীতে। রাস্তায় যারা ভীড় ক'রে মজা দেখছিল তারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়। তার ভেতরই কে একজন আর একজনকে বলে, ওদের শ্রুতিগোচরের ভেতরই, 'আরে ঐ ত মলয় ঘোষ, ফিল্ম ডিরেক্টার!'

গাড়িতে উঠে তপতী অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। নেশার ঘোরেই হয়ত ঝিমিয়েছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'ও মলয়, ইউ নটি বয়, কোথায় নিয়ে চলেছ! প্লিজ,—টু দি নিয়ারেস্ট বার, প্লিজ!'

'বাড়ি চলো বুলবুল।'

'বাড়ি? কোন্ বাড়ি?'

একদা-সুন্দর চোখ-ছুটি বিস্ফারিত ক'রে চায় তপতী।

'আমাদের বাড়ি।'

'মানে? তোমার বাড়ি? ও নো নো—প্লিজ নো। লেট্ মি গেট ডাউন হিয়ার!'

চলন্ত গাড়ি থেকেই নামতে যায় তপতী।

'ছি তপতী। ছেলেমানুষী ক'রো না। জানো ত বাড়িতেও ওসব আছে। সেখানে গিয়ে যা খুশী খেও। এখন চলো!'

'রিয়ালি? ··কিন্তু বাড়িতে গিয়ে যদি আমি থাকৃতে চাই? আর না বেরুই?'

'থাকবে বলেই ত নিয়ে যাচ্ছি, আর তোমাকে বেরোতে দেব না!'

খানিকটা গুম্ খেয়ে বসে থাকে তপতী, যেন ভাবতে চেষ্টা করে। বিস্মৃতির বহু দূর-পার থেকে কতকগুলো কি প্রাক্তন সংস্কার ভেসে আসে মনের মধ্যে। আত্মমর্য্যাদা, সম্ভ্রম এমনি কত কি! একসময় সে হঠাৎ বলে ওঠে—'কিন্তু চাকর-বাকর? না না—ছি! তারা কি মনে করবে? আমাকে এইখানেই নামিয়ে দাও। যদি পারো ত দশটা টাকা দাও, তা'হলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।···আমার, আমার অনেক টাকা এখনও বাজারে পাওনা আছে, জানো? আমি আদায় করতে পারি না তাই—!'

মলয় ওর ছুটো হাত চেপে ধরে, 'এই ত আমরা বাড়িতে এসে গেছি, লক্ষ্মীটি। তুমি আর আপত্তি করো না বুলবুল!'

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়ে তপতী, 'না। এটুকু মনুষ্যত্ব আমার এখনও আছে মলয়। এই অবস্থায় বাড়িতে আমি যাবো না—কিছুতেই। তার চেয়ে আমার পথই ভাল। অনেক ভাল। আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও।'

মলয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপে। বলে, 'বেশ চলো, তোমার হোটেলেই ফিরে যাই।'

'ওরে বাবা! সে চেষ্টা ক'রো না—প্লিজ। সেখানে ভয়াবহ রকমের দেনা হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা সে আমি বুঝব—চলো ত !'

হোটেলে পৌঁছে চেক্ লিখে দেয় মলয়—পাওনা সব টাকা ত বটেই, অনেকখানি অগ্রিমও। ওর সেবা বা স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি না হয়! ম্যানেজারের মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থাই ক'রে দেয়।

মলয়ও বাড়ি ফেরে না, ঐখানেই আর একটা শয্যার ব্যবস্থা ক'রে দিতে বলে। বাড়িতে খবর পাঠায়—কদিন সে এখানেই থাকবে।

তপতীর শরীর যে এত খারাপ হয়ে এসেছিল, তা সে নিজেও বুঝতে পারেনি এতকাল। একেবারে ভেঙ্গে পড়ার আগে পর্যন্ত সে যেন কোন রকম আভাস পায়নি। দীর্ঘদিনের উপবাস ও অবিরত মদ্যপানে লিভারটা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, অকস্মাৎ তা শুয়ে পড়ল। প্রাণশক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না আর তার।

মলয় কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওর চিকিৎসা আর শুশ্রূষা করতে লাগল। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ হ'ল রোগিনীকে নিয়েই। ডাক্তার ওষুধের মাপে একটুখানি ক'রে মদ খেতে বলেছেন, নইলে এতদিনের অভ্যাসে রোগিনী থাকতে পারবে না। কিন্তু তপতী সে ওষুধের মাপে খুশী নয়। ফাঁক পেলেই সে বেশী খায়। মলয় আলমারীতে রেখে চাবী দিতে সে একদিন এক ছোকরা চাকরকে দিয়ে বকশীষের লোভ দেখিয়ে আনিয়ে নিলে। রাত্রে ব্যথা উঠতে যন্ত্রনার ভয়াবহতা দেখে মলয় ব্যাপারটা অনুমান করলে। তখন জেরা করতেই ধরা পড়ল ব্যাপারটা। মলয় ম্যানেজারের কাছে নালিশ করতে সে ছোকরার চাকরী গেল। বাকী সব চাকরদের ডেকে ভয় দেখিয়ে দিলে মলয়—দৃষ্টান্ত চোখের সামনেই রয়েছে—সুতরাং এবার কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল মনে করলে সে। কিন্তু দু-চার দিন বেশ সুস্থ আছে দেখে মলয় যেমন বেরিয়েছে নিজের কাজে, তপতীও এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে মদ খেয়ে এল। আবার ব্যথা, আবার সেই ভয়াবহ যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি। ডাক্তারের সেই গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়া।

মলয় তিরস্কার করে না তপতীকে, নিজেও হাল ছাড়ে না।

শুধু বলে, 'তুমি আমাকে আরও বেশী খরচার দায়ে ফেলছ তপু, আমাকে দেখছি এবার দিনরাত নার্স রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কেন, কেন আমার জন্য এত কাণ্ড করছ মলয়! কী আর হবে আমার বেঁচে

বলতে পারো ? আমার মধ্যে যে নারী ছিল সে ত বহুকাল আগে মরে গিয়েছে। ঘর সংসার পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন নিয়ে যে বহু-বিস্তৃত সংসারের আশায় আমরা নিজেদের সাবধানে রাখি সে আশা ঘুচেছে কতদিন আগে—তা মনেও পড়েনা। ছিল এক শিল্পী—তাকে আমি হত্যা করেছি স্বহস্তে। আর কেন বাঁচব, কিসের জন্য বাঁচব বলতে পারো ? তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, তুমি অন্তত বাঁচো। এখনও তোমার নতুন ক'রে সংসার পাতবার সময় আছে মলয় !'

সে কথা কি মলয়ও ভাবে না ?

মাঝে মাঝে কি একটা হতাশা এসে ওর এই সমস্ত প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির মূলে নাড়া দেয় না ? সুষমার দেহ-লাবণ্য স্মৃতিপথে ভেসে উঠে কি নিজের নির্বুদ্ধিতাকে ধিক্কার দিয়ে যায় না ? কার জন্য সে নিজের ভবিষ্যতের একটি সুন্দর সম্ভাবনাকে এমন ভাবে খোয়াবে ? এই অর্ধমৃত একটি নারী আর সম্পূর্ণমৃত একটি শিল্পীর জন্য ? আজও হয়ত মনে হ'ল যে তপতীর কথাই ঠিক। ঐ যুক্তি গ্রহণ করাই তার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চকিতের মধ্যে মনের পর্দা দিয়ে সরে গেল ক-দিন দিনরাত-স্বপ্নে-দেখা সুন্দর নিভৃত একটি ঘরকন্নার ছবি, যেখানে এক তরুণী মেয়ে তার সেবা ক'রেই নিজেকে কৃতার্থ, ধন্য মনে করছে !

কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বহুদিন আগেকার আর একটা ছবিও ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর একটি তরুণী মেয়ে সেখানে হাতজোড় ক'রে বলছে, 'আমার ঠাকুর্দা তিনলাখ টাকা আয়ের জমিদারী উড়িয়ে দিয়েছিলেন মদ খেয়ে। আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন লিভারে ঘা হয়ে। সে ত মদ খাওয়ারই ফল। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—আমাকে মদ ধরিও না।'

এ ত খুব বেশী দিনের কথাও নয়। ক-টা বছরই বা।

সে মনকে কঠিন করে। সস্নেহ-হাতে ওর চোখদুটো চেপে ধরে বলে, 'কে বলেছে শিল্পী নিহত হয়েছে তপু। আমি মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র জানি, আমি আবার বাঁচিয়ে তুলব !'

ওষ্ঠ-প্রান্তে করুণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে তপতীর, 'সে আর সম্ভব নয় ! মিছিমিছি আমাকে স্তোক দিওনা—আমি ঠিক অত শিশু নই।'

মহাজনরা ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে ওঠেন ! তাগাদার ওপর তাগাদা আসে।

'কি হ'ল, নতুন ছবি কবে শুরু করবেন ?'

তপতীও তাগাদা দেয়, 'তুমি কাজে যাও—আর কতদিন মড়া-আগলে বসে থাকবে এমন ক'রে ?'

'তুমি তাহ'লে বাড়ী চলো এবার।'

'তাতেই কি তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারবে ?...বেশ, তাহ'লে চলো। কিন্তু আমি যদি তাড়াতাড়ি না মরি, শেষে বাড়ী থেকে তাড়াতেও পারবে না। তার চেয়ে তোমার জীবনের বাইরে ছিলুম—এই ত ভাল। সব রকমের স্বাধীনতাই ছিল তোমার ।'

'স্বাধীনতা হয়ত সবাই চায় না বুলবুল।...তাছাড়া—তোমার মরবার কথা হচ্ছে না। বাঁচবার কথাই হচ্ছে। নায়িকার অভাবেই যে আমি ছবিতে হাত দিতে পারছি না।'

'কেন আমার সঙ্গে এমন মর্মান্তিক ঠাট্টা করছ বলোত !'

'কে বললে ঠাট্টা করছি ? সত্যিই বলছি।'

'পাগল ? তুমি কি ভাবো আর কোনদিন আমি অভিনয় করতে পারব ?'

'নিশ্চয়ই পারবে। নইলে আমিও আর ছবি তুলবনা।'

অনেকদিন পরে আবার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে তপতীর—শান্ত মেয়ের মত নিজেকে যেন সঁপে দেয় মলয়ের হাতে, 'বেশ তবে নিয়ে চলো বাড়ীতে। যা খুশী তুমি করো আমাকে নিয়ে। আমি আর কিছু বলবনা।' মলয় তপতীকে বাড়ীতে এনে আবার টেলিফোনের চোঙ্গা তুলে নেয় হাতে। ডাক দেয় সহকারীদের।

তিনটি প্রযোজকের সঙ্গে চুক্তি করা ছিল ওর। তার ভেতর একজন দশ-হাজার টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এঁর সঙ্গেই তার সবচেয়ে বড় চুক্তি হয়েছিল—একলাখ টাকা পারিশ্রমিকে। সুতরাং তাঁরই তাগাদা সবচেয়ে বেশী।

মলয় তাঁকে জানালে যে এবার সে প্রস্তুত।

'আপনি কাস্টিং কিছু ঠিক করেছেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

মলয় ফর্দ বার ক'রে দিলে।

ফর্দ দেখে মহাজনের চক্ষু স্থির।

'তপতী দেবী ? তপতী দেবীকে নামাবেন নায়িকার ভূমিকায় ?'

'হ্যাঁ। তাই ঠিক ছ।'

'না মশায়। এ চলবে না। তাঁর চেহারা আমি দেখেছি মাস-দুয়েক আগে। আপনি অন্য কাউকে ঠিক করুন।'

'আমি এই ঠিক করেছি। করলে আমি এই কাস্ট-এই করব। ছবি যখন আমি পরিচালনা করব তখন সে দায়িত্ব আমার।'

'না মশাই, মাপ করবেন। টাকাটা আমার—সে কথাটাও আমাকে ভাবতে হবে। তিনচার লাখ টাকার ছবি আমি জেনে-শুনে ডোবাতে পারব না।'

'তাহ'লে আমি ছবি তুলব না।'

'সে আপনার ইচ্ছা।'

মলয় পোর্টফোলিও থেকে চেক্-বই বার ক'রে দশহাজার টাকার চেক্ লিখে দিলে। বললে, 'চুক্তির কড়ার মত এ টাকা আপনার ফেরৎ পাবার কথা নয়—কিন্তু আমিও বিনা পরিশ্রমে আপনার টাকা নিতে চাই না। এই নিন!'

তবু তিনি বললেন, 'ভাল ক'রে ভেবে দেখুন মলয় বাবু। এতগুলো টাকা! এতটাকা চট্ ক'রে কেউ দেবেনা আপনাকে। বোম্বেতেও পাবেন না সহজে!'

'তা আমি জানি। কিন্তু ছবির নিন্দা-প্রশংসার সব দায়িত্ব যখন আমার, তখন ছবির পরিচালনার মধ্যেও আমি আর কারুর কথা শুনতে রাজী নই।'...

একে একে সব প্রযোজকের সঙ্গেই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। মলয়ের এক কথা, তপতী নায়িকা না হ'লে সে ছবি তুলবে না। প্রযোজকরাও অতটাকা ঐ নায়িকার ওপর ভরসা ক'রে খরচ করতে রাজী হননা। নানা রকম ঠাট্টা-তামসা করতে লাগল লোকে। মলয় নতুন ক'রে তপতীর প্রেমে পড়েছে। মলয়ের এই বয়সেই বুঝি বাহাত্তুরে ধরেছে ইত্যাদি। একটি ফিল্ম্ মাসিকে এমন কথাও বেরিয়ে গেল যে তপতী কোন মাদুলী পরে বশ করেছে মলয়কে।

অবশেষে বাইরের সব ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে মলয় নিজের ছবি নিজেই তুলবে ঠিক করলে। বহু চিন্তার পর কাহিনী বেছে নিলে। এমন কাহিনী—যাতে তপতীকে নায়িকা সাজালেও বেমানান হয় না। বহু যত্ন ক'রে চিত্র-নাট্য রচনা করলে, ভেবেচিন্তে নির্বাচন করলে অপর নট-নটী!

যেদিন তপতীকে খবর দিলে, অমুক তারিখে নতুন ছবির মহরৎ—সেদিন সে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল বহুক্ষণ, মলয়ের মুখের দিকে। কথাটা তার বিশ্বাসই হ'ল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত—তারপর ব্যাকুল হয়ে বললে, 'ছিঃ ছিঃ তুমি কি পাগল হয়েছ মলয়, এসব পাগলামী ছাড়। এতগুলো টাকা অনর্থক ডুবিও না। আমাকে হিরোইন্ করলে ছবি তোমার একসপ্তাহও চলবে না!'

মলয় দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'সে আমি বুঝব। তুমি ত জানো আমার প্রতিজ্ঞা—তোমাকে ছাড়া ছবি তুলব না!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপতী বললে, 'চলো তবে। কিন্তু মড়াকে কি বাঁচাতে পারবে?'

সত্যিই অসাধ্য সাধন করলে মলয়। তপতীও প্রাণপাত পরিশ্রম করলে। প্রথম যখন নায়িকার অল্পবয়স তখন ক্যামেরাকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখলে মলয়—তারপর বেশী বয়সের বেলায় ক্লোজ-আপ নিলে। মেক্-আপেরও ত্রুটি ছিল না। তবু যেটুকু খুঁৎ থাকৃতে পারত—তপতীর অসাধারণ অভিনয়ে সেটাও ঢেকে গেল। ছবি শেষ্ করেই মলয় নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

ছবি দেখানো শুরু হ'তে বোঝা গেল সিদ্ধি ওর আশাকেও ছাপিয়ে গেছে। তেইশটি চিত্রগৃহের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ অসংখ্য দর্শকের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। এমন কি কাগজগুলিও প্রশংসা না ক'রে পারল না।

মলয় একদিন সন্ধ্যার পর তপতীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ছবি ভাঙ্‌বার মুখে গাড়ি অন্ধকার ক'রে বসে থাকে—ওকে শোনায় ওর বিজয়-ধ্বনি! তপতীর মুখে ফুটে ওঠে হাসি। মলয়ের হাত ধরে বলে, 'মলয়, ইউ আর ওআণ্ডারফুল।'

এরই ভেতর বোম্বে থেকে উড়ে আসেন এক কোটিপতি মহাজন।

ওদের দুজনকে চাই, মলয়কে দিয়ে তিনি ছবি তোলাবেন। যতটাকা লাগে!

মলয় সময় নিলে ভেবে দেখবার। রাত্রে দক্ষিণের বারান্দায় বহুকাল পরে স্ত্রীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে, 'তুমি কি বলো বুলবুল?'

'আমি? আমি কি বলব। আমি তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিয়েছি—আমার কোন পৃথক ইচ্ছা নেই!'

মলয় ওর কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'শিল্পীকে ত বাঁচালুম—নারীকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না এবার?'

শিউরে ওঠে তপতী—ওর হাতটা সজোরে চেপে ধরে বলে, 'পারবে, পারবে—হ্যাঁ গো?'

'পারবো। চলো তপু, আমরা কোথাও কিছুদিন অজ্ঞাতবাস ক'রে আসি। কোন সুদূর নিভৃত জায়গায়।'

'চলো—আজই চলো। চাকর বাকর কেউ যাবে না। আমি সেখানে
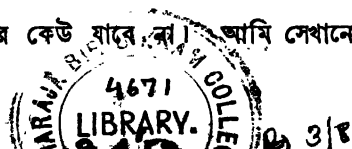
তোমাকে রেঁধে খাওয়াবো, তোমার সেবা করব—'

'আর আমি তোমাকে বাজার ক'রে এনে দেবো, রান্নাঘরে গিয়ে বসে থাকব তোমার পাশা-পাশি ! কেমন ত ?'

তপতীর দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, সে বলে, 'কেমন ক'রে তোমাকে বোঝাবো যে এর জন্যই এতকাল আমার অন্তর হাহাকার করেছে ! শিল্পী মিথ্যা, শিল্পী তুচ্ছ। নারী অনেক বড় ! সংসার বৃহত্তর।'

ছে
ড়ী ফেঁদে
মুখের কুঞ্চিত
একটু ক'রে ঠোঁট
খানা খানিক পরে—আর
অপরিসীম ধূর্ততা উঠেছে
নি উইল ক'রে সে উইল
া তাঁর এই বাড়ীতে বসবাস
মরবার পর অন্তত পনেরো
ন্মাবে। এতবড় সম্পত্তির

ায় সবটাই নিয়ে এত

হবে। দীর্ঘ
া ভেতরে !'

গৃহপ্রবেশ

লোকে ঠাট্টা ক'রে বলে ভণ্ডুল মামার বাড়ী। বিভূতি বাঁড়ুয্যের গল্পের সেই বাড়ী—যা শেষ হয়না কিছুতেই। নেহাৎ মিথ্যেও বলে না। কবে যে এ বাড়ী শুরু হয়েছে তা সবাই ভুলে যেতে বসেছে—কবে শেষ হবে তা ত কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না। কারণ এতদিন ধরে যত অনুমানই করা গেছে সব ব্যর্থ হয়েছে। দশ-বারো-কুড়ি বছর? অত আগে শুরু হয়েছে? তা জানি না। কতদিন লাগবে, দশ-বারো-কুড়ি বছর? তা হ'তে পারে। আরও বেশিদিন লাগাও বিচিত্র নয়। ভারা বাঁধাই আছে মনে হয় অনন্তকাল ধ'রে। অনন্তকালই হয়ত থাকবে। শুধু বাঁশগুলো যখন একেবারে পড়ে যায়—দড়িগুলো যায় গলে, তখনই আবার তা পাল্‌টানো হয় একবার ক'রে—এই মাত্র।

কত বড় বাড়ী?

বাড়ী অবশ্য বেশ বড়ই। তেতালা বাড়ী—এত গভীর এবং এত চওড়া এর ভিত যে আরও তিনতলা ওঠাও বিচিত্র নয়। তিন তলাতেও কুড়ি ইঞ্চি চওড়া দেওয়াল! পাগল ছাড়া, আজকালকার দিনের এই দামী ইঁট কেউ এমন ক'রে বাজে খরচ করে না। ভারি ভারি দেওয়াল, বড় বড় চওড়া আর উঁচু
রজা জানলা—সবই বড় বড় এবং দামী। সেখানে কার্পণ্য নেই এতটুকুও।
আছে কিন্তু কৃপণতা নেই। ভিতটা পিটে গাঁথতেই একবছর সময়
ওদের মানে লাগা উচিত ছিল ব'লে নয়—পয়সার অভাব ছিল ব'লে।
লাগে! অপেক্ষা করতে হয়েছে হয়ত দীর্ঘকাল, তবু যা-তা ক'রে গাঁথুনি
মলয় সময় নি-বই—এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে এর
স্ত্রীর পাশে ঘনিষ্ঠ হ-রে তিনতলা জড়িয়ে এই বারোখানা ঘর রূপ নিয়েছে একটু
'আমি? আ-তিনতলার ছাদ এখনও ঢালাই হয়নি, দরজা-জানলা বসেনি
—আমার কোন পৃথব গোটা বাড়ীটাতেই বাকি, মেঝেতে শুধু খোয়া বিছানো
মলয় ওর কানে-র ঘরগুলোতে এতদিনের ব্যবহারে খোয়া বসে প্রায় সমান
বাঁচাবার চেষ্টা করব
শিউরে ওঠে
হ্যাঁ গো?' ...। পাড়ার লোকে জানত সুবোধবাবুর বাড়ী। সুবোধবাবু
'পারবে-লোকান্তরে গেছেন। চার ছেলের মধ্যে তিনজন অন্যত্র বসবাস
কোন ...র ভেতরে দু'জন আবার বাড়ীঘরও ক'রে নিয়েছে। আছেন শুধু
...বুর স্ত্রী আর ছোট ছেলেটি। ঐ যে রোগা ঢ্যাঙ্গা নিঃশেষিত-জীবনী-

শক্তি একটি ছেলেকে আপনাদের পাড়ায় দেখেন মধ্যে মধ্যে, ধনুকের মত বেঁকে আস্তে আস্তে চলেছে রুমাল-বাঁধা সামান্য বাজার নিয়ে বা চার আউন্স ওষুধের শিশিতে শর্ষের তেল সংগ্রহ ক'রে—সেই হ'ল সুবোধবাবুর ছোট ছেলে শশাঙ্ক।

আর ওঁর স্ত্রী যমুনাকে দেখতে চান? একদিন গিয়ে কড়া নাড়বেন—ওদের ঐ ফটকের মত বড় সদর দরজাটায়—যেটার দামী পাল্লা দুটো একবারও রং পড়বার আগেই জলে ক্ষয় হ'তে শুরু করেছে (বার্নিশ হবে যে!)—অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়বার পর ক্ষীণস্বরে শব্দ আসবে ভেতর থেকে, 'কে?' তারপর সামান্য একটু খুটখাট্ শব্দ হবে ঐ প্রেতপুরীর মত নিঃশব্দ বাড়ীটার মধ্যে—আস্তে আস্তে ভদ্রমহিলা এসে ভেতর থেকে তালা খুলে কপাটটা একটু ফাঁক ক'রে দাঁড়াবেন। কঙ্কালসার শীর্ণ চেহারা, কোটরগত চক্ষু, লম্বা একহারা গড়নের দেহ ছিল বরাবরই —এখন শুধু আছে তার অস্থি আর চামড়া। পরণে একটি পুরোনো আধছেঁড়া গামছা আর বুকের কাছে একটু চিট্‌চিটে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া। অমনিই ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন হবে, 'কী চাই বাবা আপনার'? আপনি যদি প্রেতিনী মনে ক'রে ভয় পেয়ে পালিয়ে না আসেন ত অতঃপর কিছু আলাপ ক'রে দেখতে পারেন।

কী আলাপ করবেন?

জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, ছেলেরা ত ইতিমধ্যে তাঁকে ফেলে সরেই গেছে যে যার সুবিধামত, বাড়ী-ঘরও একরকম ক'রে বসেছে, তবে এত বড় বাড়ী ফেঁদে বসেছেন কেন? কার জন্যে? দেখবেন যে সেই শীর্ণ ভয়াবহ মুখের কুঞ্চিত চামড়ার রাশির মধ্যে একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে, একটু একটু ক'রে ঠোঁট সরে গিয়ে হাসির ভঙ্গীতে বিকৃতও হয়ে উঠেছে মুখখানা খানিক পরে—আর দেখবেন সেই কোটরগত স্তিমিত চোখ দু'টিতে কী অপরিসীম ধূর্ততা উঠেছে ফুটে! শুনবেন যে সে ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। তিনি উইল ক'রে সে উইল রেজেষ্ট্রী ক'রে রেখেছেন যে—যে-ছেলে বা ছেলেরা তাঁর এই বাড়ীতে বসবাস করবে, সে বা তারাই পাবে এতে অধিকার। তিনি মরবার পর অন্তত পনেরো বছর এ বাড়ীতে বসবাস করলে তবে সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মাবে। এতবড় সম্পত্তির লোভ ছাড়া সোজা কথা?

কিন্তু এ পাগলামীই বা কেন? এই দু'কাঠা জমির প্রায় সবটাই নিয়ে এত বড় প্রাসাদ ফাঁদবার তাঁর কী দরকারই বা ছিল?

যদি জিজ্ঞাসা করেন ত অনেক কথা আপনাকে শুনতে হবে। দীর্ঘ ইতিহাস। উনি হয়ত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবেন, 'আসুন না বাবা ভেতরে!'

বুকের পাটা থাকে ত যাবেন ভেতরে, নর্দমার ওপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ একটু পথ ধরে গিয়ে ওঁর সেই খোয়া-জাগানো ঘরে গিয়ে পৌঁছে দেখবেন, ভাঙা একটা তক্তা-পোষে শতচ্ছিন্ন মলিন বিছানা পাতা, এ ছাড়া আছে একটা ছেঁড়া মাদুর—কলাই আর এলুমিনিয়মের ফুটো-ফাটা বাসন দু'একটা, তারই ভেতর ভাঙা উনুন এবং কালিমাখা হাঁড়ি—আর বাড়ীর বাকী ঘরগুলোর সর্বত্র ঘিরে রাশি রাশি আবর্জনা স্তূপ। নানাধরণের আবর্জনা, নাতিদের কবেকার পরিত্যক্ত ভাঙা খেলনা থেকে শুরু ক'রে হাতল-ভাঙা চেয়ারের কাঠ—ছেঁড়া বিছানা, পেঁজা তুলো, ন্যাকড়ার পুঁটুলি, কাঠ, কয়লা—আর বাড়ী-গাঁথার হাজার সরঞ্জাম। কিছু চুন সুরকি কিংবা সিমেন্টও হয়ত খুঁজে পাবেন। সে সিমেন্ট হয়ত ঠাণ্ডা জলো বাতাসে,—কি জলই লেগে—ডেলা পাকিয়ে গেছে, তবু প্রাণ ধরে ফেলে দিতে পারেননি তা। অতবড় বাড়ী ঐটুকু জমিতে, ফলে সব ঘরই অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁত করছে, চুনকাম না হওয়ার জন্যে আরও অন্ধকার। আর ভ্যাপ্সা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে সবটা থেকে কিছুক্ষণ থাকলে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গা বমি-বমি করে।

অত সাহস যদি না হয়, যদি আগেই ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিয়ে আপনি রাস্তাতেই দাঁড়াতে চান তো বেশ দীর্ঘকালের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবেন। এতকালের অভ্যস্ত নীরবতা থেকে যখন টেনে বার করছেন ওঁকে—যখন সুযোগ দিয়েছেন দুটো কথা কইবার,—তখন উনি অল্পে ছাড়বেন না, এটা ঠিক।

কী শুনবেন?

সে দীর্ঘ ইতিহাস।

শুনবেন উনি কত বড় ধনীর কন্যা ছিলেন। ওঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই ধনী, সবাইকারই বড় বড় বাড়ী। তারা আজ ওঁকে একটু করুণার চোখে দেখে, এড়িয়ে চলে। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। তাঁর বাবা সেই সমস্ত আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন। ভাল ছেলে দেখে ভদ্রলোক সুবোধবাবুর হাতে মেয়ে দিয়েছিলেন, বিষয়-সম্পত্তি কিছু দেখেননি। কিন্তু লেখাপড়ায় যতটা দক্ষতা ছিল অর্থোপার্জনে ততটা ছিল না সুবোধবাবুর, তাই কিছুতেই কিছু সুবিধা ক'রে উঠতে পারেননি। চিরকাল বহু ভাড়াটের সঙ্গে নিচের তলায় কম-ভাড়ার ঘরে থেকে সহস্র কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য ক'রে—বাড়ীর কষ্টটাই সবচেয়ে বেশি বেজেছে ওঁর। গহণা ছিল ওঁর অনেক—বাবা কিছু কম দেননি। কিন্তু তা যেমন ছিল তাইতেই সংসার চলেছে। স্বামীর প্রায়ই চাকরী থাকত না, শরীর খারাপের অজুহাতে, আত্ম-সম্মান বজায় রাখার অজুহাতে একটার পর একটা চাকরী তিনি ছেড়েছেন।

মাষ্টারী, কেরাণীগিরি, দালালী কোনটাই তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনমাস চাকরী করেছেন হয়ত, সাতমাস বসে থেকেছেন। টিউশানী অবশ্য দু'একটা থাকতই কিন্তু তাতে আর কতটুকু হয় বলুন? সেই দীর্ঘ বেকারত্বের খেসারৎ কি তাঁকেই দিতে হয়নি গহনা বেচে? নইলে চারটে ছেলে মানুষ করলেন কি ক'রে?

বাবা অবশ্য সাহায্য করেছেন মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তাও তাঁকে করতে হয়েছে গোপনে। সুবোধবাবুর সদা-জাগ্রত আত্মসম্মানবোধ নইলে ক্ষুণ্ণ হ'ত। নেহাৎ যখন একেবারে অচল হয়ে পড়ত তখনই যমুনা গোপনে লোক পাঠাতেন। কখনও কখনও সন্দেশের বাক্স ক'রেও টাকা পাঠিয়েছেন তাঁর বাবা।

মেয়ের সবচেয়ে গোপন ব্যাথাটা তিনি জানতেন, তাই বোধকরি এ দু-কাঠা জমি এখানে কিনে রেখেছিলেন সকলের অজ্ঞাতে—মেয়ের নামে। এই পাড়ারই বিভিন্ন বাড়ীতে বহু দুঃখ পেয়েছেন যমুনা—এই পাড়াতে নিজের বাড়ী ক'রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে গৌরব আছে তা বাবা জানতেন। মেয়েও তাঁকে বহুবার বলেছে—'কখনও যদি ছেলেরা রোজগার করে, বাড়ী করতে পারি ত এই পাড়াতেই করব। চৌরঙ্গীতে থাকবার ক্ষমতাও যদি কখনও হয় ত আগে এখানে বাড়ী ক'রে লোককে দেখিয়ে তবে অন্য জায়গায় যাবো।'

হয়ত বাড়ীও তৈরী করে দেবেন, এ ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু তার আগেই ওপারের ডাক এসে পৌঁছল। বাবা মরবার পর কাগজপত্রের মধ্যে এই দলিল বেরোতে দাদারা ডেকে কাগজখানা বোনকে দিয়েছিলেন! সেইটুকুই মস্ত অনুগ্রহ ব'লে মনে করেন যমুনা—এর ওপর তাঁরা বাড়ী করার জন্যে কিছু নগদ টাকা দেবেন, এমন আশা করার মত পাগল তিনি নন্।

যখন কিছু ছিলনা তখন একরকম ক'রে দিন কেটেছে—এসব চিন্তাও তখন ছিল না। প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রাই যেখানে সমস্যা, সেখানে ঘর-বাড়ীর স্বপ্ন কে দেখে? জমিটা পাবার পরই সব গোলমাল হয়ে গেল। দিনে রাতে স্বপ্ন দেখেন যমুনা। যেমন ক'রেই হোক্ বাড়ী করতে হবে। আর যেমন-তেমন মাথা গোঁজবার মত বাড়ী নয়—সে টাকা এখন দুই ছেলে অফিস থেকেই ধার ক'রে এনে দিতে পারত—বাড়ী চাই বড় প্রাসাদতুল্য। মামারা, কাকারা, মেসোরা—বহুদিন অনুকম্পার চোখে দেখেছেন ওঁকে—তাঁদের দেখাতে হবে যে করুণার যোগ্য তিনি নন্, তিনি তাঁদেরই আত্মীয়া!

শুরু হ'ল কৃচ্ছ্র সাধনা। চারিদিক থেকে সমস্ত খরচ কমানো হ'ল। খাওয়া-দাওয়া, জামাকাপড় সব। ছেলেরা সব টাকাই এনে ওঁর হাতে দেয়—উনি সেই

টাকা বজ্রমুষ্টিতে ধরে রাখেন। ক্রমে ক্রমে কিছু টাকা হাতে জমল—প্ল্যান করিয়ে ভিত শুরু করলেন। মাসের প্রথমে বিশ-ত্রিশ টাকা খরচ ক'রে দুদিন কাজ করান হয়ত, আবার বন্ধ থাকে। এই সময় সুবোধবাবুর অসুখ করল। ছেলেরা ডাক্তার ডাকতে চাইল, যমুনা দিলেন না—দীর্ঘদিনের নানা জটিলতা, পুরোনো রোগ দৈবেই ভাল হয়।

কোথা থেকে মাদুলি এনে পরালেন, চরণামৃত খাইয়ে দিলেন। তিনমাস শয্যাগত হয়েছিলেন ভদ্রলোক, জলসাগু ছাড়া কিছু জোটেনি। ছেলেরা লুকিয়ে হয়ত কিছু ফল এনে দিত—কখনো-সখনো। যমুনা হাতে করে ফল আনাতে পারতেন না। ফলে শ্লেষ্মা বাড়ে। লেবুতে অম্বল হয়। তিনমাস ভুগে সুবোধবাবু যেদিন চোখ বুজলেন সেদিন যমুনার প্রথম যে অনুভূতি হ'ল তা হচ্ছে এই যে একটা পেটের খরচ বাঁচল। শ্রাদ্ধ করালেন কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গার ধারে।

ভিত শেষ হ'তে ছেলেরা টাকা ধার করলে অফিস থেকে। একতলা গাঁথা শুরু হ'ল। কিন্তু সব টাকা জড়িয়েও দেওয়ালগুলোর গাঁথুনি শেষ হ'ল না। তখন স্থির করলেন বড় দুই ছেলের বিয়ে দেবেন। শিক্ষিত ছেলে, সরকারী চাকরী করে—অতবড় বাড়ী ফাঁদা হয়েছে—শুনতে ভালই। কাজেই পাত্রীও ভাল জুটল। টাকাও মিলল হাজার কতক। বিয়ের খরচা অবশ্য কিছু করতে হ'ল, অত টাকা যাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন তাদের কাছে ভড়ং কিছু বজায় রাখতে হবে ত! কিন্তু সে খরচের পরেও যা বাঁচল তাতে একতলার এই চারখানা ঘর শেষ ক'রে স্বচ্ছন্দে বসবাস করা চলত। দুই ছেলের দু'খানা আর বাকী ওঁদের দু'খানা—প্রয়োজনেরও বেশি হ'ত কিন্তু যমুনা অত বোকা নন—তিনি আপনার দিকে চেয়ে আবারও হাসির ভঙ্গিতে মুখটা বিকৃত করবেন, দৃষ্টিতে ফুটে উঠ্‌বে ধূর্ততা—তিনি জানতেন যে ওভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলে আর কোনদিনই তাঁর প্রাসাদ তৈরীর স্বপ্ন সফল হবে না। ছেলেদের ছেলেপুলে হ'তে শুরু হবে, খরচা বাড়বে, প্রয়োজনের চাপও থাকবে না। তিনি কোনমতে একতলার ছাদ ঢালাই করেই শুরু করলেন দোতালার গাঁথুনি—কোনদিকে চাইলেন না, কারুর কোন কথা শুনলেন না।

এইবার আরম্ভ হ'ল বিরোধ।

দু'খানি ছোট ঘর ভাড়া করে ওঁরা থাকতেন। যমুনা ব্যবস্থা করলেন যে একখানি ঘরে উনি এবং বাকী তিনজন ছেলে থাকবেন, আর অন্য ঘরখানিতে

পালা ক'রে এক এক বৌ আসবে। দু'মাস বড় বৌ থেকে বাপে।
বৌ আসবে দু'মাসের জন্যে। এতে ছেলেদের মন ওঠে না, বৌয়েদেরও অন্ধকারেরও হয় বাপের বাড়ীতে। তা ছাড়া—বাড়ীঘরদোরে চরম দারিদ্র্যের ছাপ, আত্মীয়রা কেউ আসতে চায় না, বলে দুর্গন্ধ, নোংরা—তারা হাসাহাসি করে আর বৌয়ের বাপেরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন, মায়েরা কথা শোনান জামাইদের।

অবস্থা চরমে পৌঁছল যখন ওদের বিয়ের দরুন দানের বাসন মায় নতুন প্যাক্-'রা অব্যবহৃত খাট-বিছানা পর্যন্ত বিক্রী ক'রে যমুনা দোতালার ছাদ ঢালাই করলেন। মেজবৌ তিনদিন উপবাস ক'রে থেকে স্বামীকে শক্ত করলে। তারা আগে পৃথক হ'ল, বড়বৌ মাস-তিনেক পরে।

এবার চোখে অন্ধকার দেখলেন যমুনা! সেজ ছেলে সবে অফিসে ঢুকেছে—কি-ই বা রোজগার। এতে একটা বাড়ীর ভাড়া জুগিয়ে আর একটা বাড়ী তৈরী করা যায় না। অগত্যা ভাড়াটে ও বাড়ীর পাট উঠিয়ে খোয়া-বিছানো নতুন ঘরেই এসে উঠলেন।

খাওয়া-দাওয়া বহুদিনই মাত্র জীবনধারণের পর্যায়ে এসে উঠেছিল—এখন আবার বাস করারও এই কষ্ট সেজ ছেলে সহ্য করতে পারল না। বিছানাপত্র ভিখারীর অধম—মেঝেতে পা পাতা যায় না। চারিদিকে চুনবালির স্তূপ। অসহ্য অবস্থা। কিছুদিন পরে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তে এক টিউশানী নিয়ে সেও চলে গেছে। সম্প্রতি সেই বাড়ীরই একটি মেয়েকে বিয়ে ক'রে স্থায়ীভাবে শ্বশুরবাড়ী বসবাস করছে! সেইখানেই খরচপত্র দেয়।···যমুনা দেবী ছোট একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেকথা আপনাকে শুনিয়ে দেবেন। ঐটেই ওঁর বেশি মনোকষ্টের কারণ! তবু তিনি হাল ছাড়েননি।

ছোট ছেলেও চলে যাবে, তা তিনি জানেন। কেউই থাকবে না। এখনও ওর চাকরী হয়নি বলে পড়ে আছে। চাকরী হ'লেই সরে পড়বে। কিন্তু তা হোক। তাতে ওঁর দুঃখ নেই। বাড়ী যদি শেষ করতে পারেন, আর তা তিনি করবেনই, তাহ'লে ওরা কোথায় যাবে? ওঁর উইল, রেজেষ্ট্রী-করা উইল, বাধ্য করবে তাদের এসে এ-বাড়ীতে বসবাস করতে। বড় বৌয়ের সঙ্গে মেজ-বৌয়ের একতিল বনে না—দু'জনে ঝগড়া করবে দিনরাত—তবু এ বাড়ীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে তারা। আবারও হাসির চেষ্টা করবেন যমুনা, আবারও অপরিসীম ধূর্ততা ফুটে উঠবে ওঁর মুখে।

এই দীর্ঘ ইতিহাস শুনতে শুনতেই আপনার অসহ্য বোধ হবে। হয়ত আপনি

টাকা বজ্রমুষ্টিতে—তারপরেও যদি আপনার ধৈর্য থাকে তারপরেও যদি প্রশ্ন করিয়ে দি—করে আশা করেন যমুনা যে এখনও এই বাড়ী শেষ করতে পারবেন? কা—থায়? তা'হলে আরও কিছু শুনবেন। ওঁর আর ওঁর ছোটছেলের জন্য ও তিন ছেলে কিছু কিছু খরচ দেয়। বড়র সংসার বেশি, সে দিতে পারে না তেমন কিছু, মাত্র পনেরোটি টাকা দেয়—মেজ দেয় পঁচিশ, সেজ দেয় কুড়ি। এই ষাট টাকায় আজকালকার বাজারে দুটো লোকের খরচ চালিয়ে কি টাকা জমানো সহজ? এ প্রশ্ন করলে হয়ত জবাব পাবেন যে কুড়ি পঁচিশ টাকা আয়েও ত কত লোক সংসার চালাচ্ছে! আর কীই বা লাগে দুটো লোকের প্রাণরক্ষা করতে? উনি ত একবেলা দুটি খান, ছেলেটাকে দুবেলা খেতে দিতে হয় অবশ্য। তা একবেলা রেঁধে রাখলেই চলে যায়। না, জলখাবার খাওয়ার অভ্যাস তাঁর ছেলেদের নেই কোনদিনই। চা কেমন জিনিস তা জানেই না তারা। কষ্ট? কষ্ট একটু হ'লই বা। এত বড় সম্পত্তিটা যদি তৈরী হয়ে যায়—সেটা কি কম লাভ? ওঁর আর কি, উনি ত চোখ বুজবেনই—ওদেরই ত থাকবে।

'না, শেষ আমি করবই বাবা, যেমন ক'রে হোক্' বলবেন যমুনা, 'না হয় একবেলা খাওয়াও ছেড়ে দেব—একদিন অন্তর খাবো। তাতে মানুষ মরে না। মামা কাকারা অবিশ্যি কেউ নেই—তাদের ছেলেরা ত আছে—গৃহপ্রবেশের দিন তাদের নেমন্তন্ন করব—তাদের সঙ্গে বসে ভালো খাবার খাবো—এই আমার মনে আছে। আপনাদেরও বলব বাবা—আসবেন সব। আপনারা হাজার হোক্ এই পাড়ারই লোক, আপনারা না এলে গৃহপ্রবেশ করব কাদের নিয়ে?'

এইবার আপনি নিশ্চিত চলে আসবেন। আবার ঐ দোরে তালা পড়বে ভেতর থেকে! একটু কি খুট-খাট শব্দ হবে, তারপর আবার বিরাজ করবে মৃত্যুপুরীর মত নিস্তব্ধতা। বিরাট বড় বড় ঘরগুলোর অন্ধকার কোণে কোণে সূর্য অস্ত যাবার অনেক আগেই ঘনিয়ে আসবে প্রগাঢ় তমিস্রা—বাইরে থেকে সেদিকে চেয়ে আপনার গা শিউরে উঠবে, মনে হবে বুঝি কোন্ প্রেতপুরীর একেবারে সামনে এসে পড়েছেন।

রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে এলেও ঐ অত বড় বাড়ীর কোন প্রান্তে জ্বলবে না আলো। শশাঙ্ক বাইরে-বাইরেই কাটায়, রাত দশটা পর্যন্ত একা চুপ করে জন্তুর মত বসে থাকে বাঁড়ুয্যেদের রকে, তারপর এসে আস্তে আস্তে খুট্ খুট্ ক'রে কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে অতি ক্ষীণ শব্দ আসে 'কে'? আবার একটু

শব্দ হয়—তালা খোলার, শশাঙ্ক মিশিয়ে যায়, তলিয়ে যায় ঐ নিঃসীম অন্ধকারের অতল গহ্বরে—আবার কপাট হয় বন্ধ।

হয়ত সে অন্ধকারেই বসে খায় সকালের ডেলা পাকানো ঠাণ্ডা ভাত আর টকে-যাওয়া খানিকটা ডাল। কিম্বা ক্ষীণ কোন আলো জ্বলে—কেরোসিনের ডিবেও বোধহয় আছে একটা কিন্তু সে আলো বাইরে কোথাও থেকে দেখা যায় না। এমন কি পাশের বাড়ীর কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি। তবে তারাও ওদিকের জানলা খোলা ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের জন্য।

এমনি দাঁড়িয়ে আছে ঐ অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ী। আরও দীর্ঘদিন থাকবে। ও গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ রাখা হয়ত আপনার দ্বারা কোনদিনই সম্ভব হবে না। কিন্তু উনি থাকবেন, বাড়ীর মালেকান্‌। অর্ধাশনে অনশনেও বেঁচে থাকবেন। শশাঙ্কর চলে যাওয়াটার জন্যই হয়ত সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তখন আর খরচ থাকবে না কিছু কিন্তু আয় থাকবে, শশাঙ্কও হয়ত কিছু দেবে তখন। বাড়ী শেষ হ'তে পারবে।

শেষ যে করতেই হবে তাঁকে। দেহ যদি ক্রমশ এলিয়ে আসে, জীবনী শক্তির শেষ বিন্দুও নিঃশেষ হয়ে যায়, ঐ পাতলা চামড়ায় ঢাকা হাড় কখানা থেকে? ক্ষতি নেই। ইচ্ছাটা ত থাকবে।

তবুও যদি শেষ না হয়? একদিন ঐ অন্ধকারেই নিঃশব্দে যদি বিদায় নিতে হয় ওঁকে? তাহ'লে রইল এই বিপুল অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ী, হতভাগ্য ছেলেদের অকিঞ্চিৎকর আয়, আর তার মধ্যে বিচিত্র এবং ধূর্ত একটি উইল; আসতেও হবে তাদের, যেমন ক'রেই হোক্‌ শেষ করতে হবে এই বাড়ী এবং বসবাস করতে হবে নিরন্তর কলহ-বিবাদ ও অসুবিধার মধ্যে—অন্ততঃ পনেরো বছর।

হাত-দেখানো বাইটা নাকি ভুলালের বাবারও ছিল। সুতরাং ওটা ওর পৈত্রিক ব্যাধি বলা যেতে পারে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

তবু ওর বাবা কখনও এমন বাড়াবাড়ি করেন নি। কলকাতার রাস্তার ধারে যে সব হিন্দুস্থানী পণ্ডিতরা পাখী, পুঁথি আর খড়ি নিয়ে বসে থাকেন পেভমেণ্টের ওপর আঁকজোক্ কেটে,—তাদের থেকে শুরু ক'রে রাজজ্যোতিষী, সম্রাট-জ্যোতিষীর দল কাউকেই তিনি বাদ দেননি বটে, অর্থও পাঁচ আনা থেকে শুরু করে পঁচিশ পর্যন্ত নির্বিচারে খরচ করেছেন; আংটিতে আর মাতুলীতে দুই হাতের আঙুল ও বাহুমূল ভরে গিয়েছিল; কবচ করার জন্য ও গ্রহযজ্ঞ করার জন্য যে কত টাকা খরচ করেছিলেন তার হিসাব রাখা বা পাওয়া সম্ভব নয়; তবু, এতটা পাগলামি তাঁর ছিল না। ওধারে মাত্র একক পুরুষ এগিয়ে এলেও নেশাটা বেড়ে গিয়েছিল দশ পুরুষের মাপে।

ভুলালের এ রোগটা দেখা দিয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই।

যখন আমাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত তখনই দেখেছি টিফিনের পয়সা জমিয়ে রাখত, যে কলকাতায় যাবে সেদিন কোন পথের ধারের জ্যোতিষীকে হাত দেখাবে বলে। এ ছাড়া কত যে ছেঁড়া-খোঁড়া জ্যোতিষের বই সংগ্রহ করত তার ঠিক নেই—কোথা থেকে পেত এইটেই আশ্চর্য! বটতলায় ছাপা সব সস্তাদরের বই, তার মধ্যে কোন-কোনটা আবার পয়ার ছন্দে লেখা, ছড়ার বইয়ের মত। কোনদিন হঠাৎ অসময়ে ইস্কুলে ছুটি হয়ে গেলে আমরা যখন হৈ-হৈ করে বেরিয়ে পড়তুম কার বাগান থেকে ডাব আর কার বাগান থেকে আনারস চুরি করব এই চিন্তা নিয়ে, ভুলাল তখন ইস্কুলের পেছন দিকে মণ্ডলদের বাগানে ঢুকে বড় বকুল গাছটায় ঠেস্ দিয়ে বসে বসে ঐ সব পুঁথি পড়ত আর নিজের হাতের রেখার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখত। কখনও বা কী সব হিসেব করত মনে মনে আকাশের দিকে চেয়ে।

ওর বাবা নাকি তিনখানা কুষ্টি করিয়েছিলেন ওর—তিনজন জ্যোতিষীকে দিয়ে। সেইগুলো থেকে জন্ম-কুণ্ডলীর নকল করে নিয়েছিল ভুলাল। সে আবার ওর পকেটে-পকেটেই ঘুরত, ফাঁক পেলেই, মানে কোন বড় দরের বই হাতে এলে—সে মিলিয়ে দেখত আগে সেই সব রাশিচক্রের সঙ্গে।

আমরা ছেলেবেলায় বিস্তর ঠাট্টা-তামাসা করেছি, ইদানীং আর কিছু বলতাম না, মানে ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ভুলালও যদিচ্ছা ঐ সব ছাইভস্ম নিয়ে মাথা ঘামাত, কোথাও কোন বাধা ছিল না।

তারপর ইস্কুল ছেড়ে কলেজে উঠে সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লুম। দুলাল ওদের সদরের কলেজেই ভর্ত্তি হল, আমরা চলে এলুম কলকাতায়। আরও কিছুদিন পরে কেউ ওকালতি করতে চলে গেল, কেউ ইস্কুল মাষ্টারী নিলে—কেউ বা কেরানীগিরি অর্থাৎ যে যার জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। শুধু দুলালেরই এসব দরকার ছিল না। ওর ঠাকুর্দ্দা তেজারতি করে যা জমিয়ে গিয়েছেন, তা ওর বাবা হাত দেখিয়ে আর কত ওড়াবেন? বিশেষত দুলালরাও মাত্র দুটি ভাই। সুতরাং দুলাল দেশেই থেকে গেল, আমাদের সঙ্গেও যোগাযোগটা খুবই শিথিল হয়ে এল —কদাচিৎ কখনও দেশে গেলে দেখা হ'ত।

কাজেই সেদিন যখন হঠাৎ দুলাল আমার মেসে এসে উপস্থিত হ'ল—দুপুর রৌদ্রে হাঁফাতে হাঁফাতে, তখন বিস্মিত হয়েছিলুম বৈকি। বিশেষত দুলাল কলকাতায় আসে খুব কম, এলেও নিজের কাজে আসে, কাজ সেরে চলে যায়। আমার মেসে গরজ করে ত আসতে দেখিনা বড় একটা।

সেটা একটা ছুটির দিন, মানে কলেজের ছুটি—অফিসের নয়। নির্জন মেসে জমিয়ে দিবানিদ্রা দেব বলে সবে কাগজখানা নিয়ে শুয়েছি এমন সময় ওর ঐ আকস্মিক আবির্ভাব!

'কী হে, ব্যাপার কি? এস এস!'

ঝোড়ো কাকের মত চেহারা ওর, চুলগুলো উস্‌কো খুস্‌কো। স্নানাহার হয়নি, বুঝতেই পারলুম।

অগত্যা উঠে বসে আগেই বললুম, 'তুই বোস একটু, ঠাণ্ডা হ। আমি দেখি ঠাকুর পাততাড়ি গুটলো কিনা। আগে তোর খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে আসি।'—

দুলাল খপ্‌ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললে, 'উঁহু, উঁহু—তুই বোস। আমার খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। সকালে একটা হেভি ব্রেকফাষ্ট হয়ে গেছে, তাতেই আমার চলবে। তা ছাড়া, ঠিক এখন নাওয়া-খাওয়ার মুড নেই। মনটা বড্ড বিক্ষিপ্ত ভাই। ওসব এখন ভাল লাগবে না।'

আমি ওকে একটি ধমক দিয়ে শান্ত করলুম, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না। আমি এক মিনিটে সব ব্যবস্থা করে আসছি।'

তারপর ঠাকুরকে কথাটা বলে, চাকরকে এক পেয়ালা চা আনতে পাঠিয়ে ফিরে এসে বসে যখন বললুম, 'নাও, এবার বলো—কী ব্যাপার।' তখন কিন্তু আর ও কথা বলেনা, কেমন একটা উদাসীন অথচ বিমর্ষ ভাবে ও-পাশের জানলাটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। একটু অপেক্ষা ক'রে ওর হাতে একটা

সিগারেট গুঁজে দিয়ে একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বললুম, 'কী রে, চুপ ক'রে রইলি কেন, বল্ কি বলছিলি!'

একান্ত নির্লিপ্ত ভাবে সে বললে, 'না থাক গে, মিছিমিছি তোকে ব্যস্ত করা। যাক্ আমি আসি ভাই এখন—'

সে উঠতেই যাচ্ছিল, ওর জামাটা টেনে রেখে একটু কঠিন কণ্ঠে বললুম, 'ওসব ওস্তাদি রাখো দিকিনি শ্যাম, বসো। অমন ক'রে হঠাৎ এসে আমার কাঁচা ঘুমটি নষ্ট ক'রে কৌতূহল জাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে—সে হবে না। চা এল ব'লে, একটু পরে ভাতও তৈরি হবে। কথা বলো না বলো তোমার ইচ্ছে—মোদ্দা, খাওয়া দাওয়া না ক'রে যেতে পারবে না। দোরে তালা লাগিয়ে দিতে বলব এখনই—'

বলতে-বলতেই চা এসে পৌছে গেল। কিছু বিমর্ষ কিছু বা হতাশ ভাবে একবার আমার দিকে আর একবার চায়ের পেয়ালাটার দিকে তাকিয়ে শেষ অবধি বসেই পড়ল দুলাল। চায়ে আসক্তি ওর অসাধারণ, সেটা বাল্যকাল থেকেই জানি। চায়ে চুমুক দিলেই ওর মেজাজ প্রকৃতিস্থ হবে।

হলও তাই। নিঃশব্দে দু-তিন চুমুক পান করবার পরেই হঠাৎ ব'লে ফেল্লে 'বাবা ত' ভাই আমার ম্যারেজের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, ক্ষেপে উঠেছেন একেবারে। কী করি বল দেখি?'

'হুর্-রা···আরে এ যে অপ্রত্যাশিত শুভসংবাদ! সন্দেশ খাওয়া এখনই। ছোটলোক, তুমি আবার মুখ শুকিয়ে এসেছ। কবে? কখন? কার সঙ্গে?'

দুলাল বিরক্ত হলেও প্রকৃতিস্থ হয়েছিল। সে বললে, 'যা যা—সব তাইতে চ্যাংড়ামি করিস নি। সন্দেশ বাজারে ঢের আছে, কিনে খেগে যা!'

'আহা, তুই চটিস কেন। এ ঘটনা ত বহু-পূর্বেই ঘটা উচিত ছিল। বড়-লোকের বড় ছেলে, এই সাতাশ আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত যে অবিবাহিত আছ, এইটেই ত আশ্চর্য!'

'সে চেষ্টা কি আর চলেনি মনে করছ? খুবই চলেছে। প্রাণপণ চেষ্টায় এতদিন কোনমতে ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু আর বোধ হয় পারিনা—এতদিন তাড়িয়ে দেব, ত্যাজ্যপুত্র করব ব'লে ভয় দেখিয়ে আসছিলেন, তাতে তত সুবিধে করতে পারেন নি—কারণ আমি সব সময়ই বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত ছিলাম। এবার উল্‌টো চাল ধরেছেন—বলেছেন আত্মহত্যা করব। ইন্ ফ্যাক্ট—তিনদিন উপোস করে পড়েছিলেন, আজ ভোরে আমার কাছ থেকে ওয়ার্ড নিয়ে তবে জল খেয়েছেন!'

একটু বিদ্রূপের স্বরেই বললুম, 'তা তোমারই বা এত কোশিস্ কেন বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখার? তোমার কি বিয়ের বয়স হয়নি এখনো? বিয়ে করাটা কি তোমার মতে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার?'

আবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরে এল তাঁর চোখেমুখে। সে বললে, 'বিয়ে করাটা তোমাদের কারুর কাছেই ভয়ঙ্কর নয় জানি—কিন্তু আমার কাছে খানিকটা বটে। তোরা ত ওসব মানিস না, আমি জানি আমার ফেট্-এ কি আছে!'

এই বলে একটু থেমে বেশ নাটকীয়ভাবে ধীরে ধীরে অথচ মর্ম্মান্তিক চাপা কণ্ঠে সে ডান হাতখানা আমার চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'আমার বিধবা-বিবাহ যোগ আছে হাতে। হরস্কোপেও তাই বলে!'

কোনমতে হাসি খানিকটা কমিয়ে রেখে বললুম, 'ও এই! সিলি!'

তৎক্ষণাৎ হাতটা গুটিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে সে বললে, 'তোমাদের কাছে সিলি হ'তে পারে কিন্তু এটা আমার কাছে সারা জীবনের প্রশ্ন। যে যে আমার হাত দেখেছে, তিন-চার জন ছাড়া সবাই বলেছে ঐ এক কথা।'

'সর্বনাশ! তিনচার জনেরও বেশি লোককে দিয়ে তুই হাত দেখিয়েছিস?'

খুবই বিরক্ত মুখে চুপ ক'রে রইল দুলাল।

তখন খানিকটা সান্ত্বনা দেবার জন্য বললুম, 'তা বেশ ত,—বাবা ত তোকে আর বিধবা বিয়ে দেবার জন্য জোর করছেন না। বিধবাই বা বিয়ে করতে যাবি কেন? কুমারী মেয়ের কি অভাব আছে?'

'বড্ড বোকার মত কথা বলিস্ তুই শান্ত! বিধবা কি আর জেনে করব? যদি লুকিয়ে দেয়? বিধবা হবার কথা যদি চেপে যায়? সেটা জান্‌ছি কি ক'রে? ভাগ্য বলবান! তোরা জানিস না বটে, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ!'

একটু ভয়ে ভয়েই বললুম, 'তা বিধবা-বিবাহটা ত আর শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়। বিদ্যাসাগর মশাই—'

'হ্যাং ইয়োর শাস্ত্র!...শাস্ত্র আইনের কথা যেন কেউ বিয়ের ব্যাপারে না টানে। যেখানে মনের সঙ্গে মনের যোগ হবে—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের, সেখানে শাস্ত্র আসে কোথা থেকে। তোরা কি কেউ পাঁজি দেখে ভালবাসিস? বিধবা বিয়ের আইডিয়াটাই আমি হেট্ করি। আই হেট্ ইট্ ফ্রম দি ভেরি কোর অফ মাই হার্ট!'

উত্তেজিত যত হয় দুলাল ততই বেশী ইংরেজি বলে। এইটেই ওর চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে ব্যাকরণকে সংহার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ওর কথা সবটাই ইংরেজিতে দাঁড়াবে—এবং তা বেশির ভাগই ভুল।

ওকে শাস্ত করার উদ্দেশ্যে খুব নরমভাবে বললুম, 'কিন্তু এত ঘৃণাই বা কেন ? ধর, যদি একেবারে অল্পবয়সে বিধবা হয়ে থাকে ত তার আবার বিয়ে দেওয়া উচিত মনে করিস না কি ?'

'খুবই উচিত মনে করি—বাট নট ফর মি। আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। আমার ওয়াইফ আমার আগে আর একজনকে ম্যারি করেছিল ভাবতেই যেন কেমন লাগে। যতবার কিস্ করতে যাবো, যতবার ফণ্ড্‌ল্ করব ততবারই মনে হবে যে আমার আগেও আর একজন ঠিক এম্‌নি করেছে ওকে, এবং এ-ও তখন ঠিক এমনি ভাবেই সে সোহাগ আদর মেনে নিয়েছে, হয়ত খুশিও হয়েছে ; তাকেই হয়ত ভালবাসত ঠিক, আমার কাছে এটা করছে অভিনয়—ভাবতেও মাথা গরম হয়ে ওঠে। অ্যাবমিনেবল্ !'

দুলালের যে এত ভাবাকুলতা আছে তা জানতুম না। মনে করতুম ফলিত জ্যোতিষের মধ্যেই ওর জগৎটা বুঝি সীমাবদ্ধ। সুতরাং বেশ একটু বিস্মিতই হলুম। এবং এক্ষেত্রে কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে রইলুম।

একটু পরে দুলালই হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার হাত দুটো ধরে বললে, 'ভাই একটা কাজ করবি ? প্লিজ ?'

'কী বলনা বাপু, অত ভনিতা না ক'রে—'

'মেয়ে ঠিক করেছেন বাবা দক্ষিণের দিকে, গোবিন্দপুর গ্রাম, বারুইপুর থেকে যেতে হয়। ওঁর অবশ্য জানাশুনো মেয়ে। মানে ওঁর কে এক ক্লাস-ফ্রেণ্ডের, তবু আমি ঠিক নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।...তুই একদিন যাবি একবার কষ্ট ক'রে ? মানে ওখানে গিয়ে—ইন্‌কগ্‌নিটো অফকোর্স—আসে-পাশে একটু খোঁজ খবর করবি ? ঠিক কি ইতিহাস—জানবি ? লোকাল ইন্‌ফরমেশনস্ ?'

দুঃখ হ'ল বেচারার জন্য। ভাগ্যকে এত বিশ্বাস তবু তাকেই ঠেকাতে চায়। মনে হ'ল একবার বলি কথাটা, 'যদি জানো যে ভাগ্য বলবান ত সেখানেই আত্ম-সমর্পন করছনা কেন ?' কিন্তু পরেই ভেবে দেখলাম যে তাতে হিতে বিপরীত হবে। হয়ত আর বিয়েই করবে না।

মুখে বললাম, 'নিশ্চয়, সার্টেনলি ! আমি এই রবিবারেই যাবো। তুই নাম ঠিকানা দিয়ে যা।' একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে দুলাল বললে, 'দেখিস্ ভাই, ওরা কিন্তু না বুঝতে পারে যে তুই খবর নিতে গেছিস, তাহ'লে হয়ত মিছে কথা বলবে—খুব হুঁশিয়ার।'

'ঠিক আছে। সে তুই নিশ্চিন্ত থাক্। গোয়েন্দাগিরি করা আমার পুরানো অভ্যেস। কেউ টের পাবে না। নে, এখন ওঠ্, চান টান করবি চল—'

আরও কিছুক্ষণ বকবার ও বকাবার পর তবে দুলালকে কলতলায় পাঠানো গেল।

বলাবাহুল্য, গোবিন্দপুর না গিয়েই আমি প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দিলুম মেয়ে সম্বন্ধে। ওর এক মামাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলুম মেয়ে তাঁদের বিশেষ জানাশোনা, খুব ভাল মেয়ে। সুতরাং মিছিমিছি কষ্ট করতে যাবার দরকার কি? পাগলকে সান্ত্বনা দেওয়া বইত না?

যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। গরমের ছুটি পড়ে গিয়েছিল ততদিনে ব'লে আমি দেশে এসেছি, ফলে বিয়ের ঝঞ্ঝাট অনেকটা আমার ওপরও এসে পড়ল। ওর বাবার আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস, তিনি সোজাসুজি আমাকে আঁকড়ে ধরেছেন একেবারে। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন যে বিয়ের আটটা দিন অর্থাৎ শুভসূচনী পূজা পর্যন্ত আমি আর কোথাও নড়ব না।

বিয়ের দিনটা দুলাল একটু বিমর্ষ হয়ে ছিল বটে কিন্তু ঠিক বিবাহ করতে যাত্রা করার পর আর অতটা দেখিনি। দীর্ঘপথ, আগাগোড়া টানা বাস্-এর ব্যবস্থা হয়েছিল, হল্লা করতে করতে যাওয়া হ'ল। সে হৈ-হল্লার তাপেই বোধ হয় দুলালের মনের জমাট অবস্থাটা গলে এসেছিল; সেও খুব হাসিখুশীতে মেতে উঠল।

আমি বরাবরই তার দিকে একটু কড়া নজর রেখেছিলুম। নিজেরও উদ্বেগ ছিল, ওর বাবারও তাই অনুরোধ। দেখলুম দুলাল আবার গম্ভীর হ'ল শুভদৃষ্টির সময় থেকে। প্রথমটা একটু চমকে উঠেছিলুম, তবে কি দুলালের বৌ পছন্দ হয়নি? কিন্তু না পছন্দ হবারই বা কারণ কি? বৌটি সত্যিই ভাল দেখতে, এমন কি সুন্দরীও বলা চলে। তবে?

একটু ফাঁক্ পেতেই ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললুম, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্! মাইরি, খাসা বউ হয়েছে তোর!'

সে শুধু বললে, 'হুঁ!'

'হুঁ কি রে? পছন্দ হয়নি তোর? অমন দেবী-প্রতিমার মত মেয়ে—?'

'পছন্দ হয়েছে বলেই ত ভাবছি।' সংক্ষেপে উত্তর দিলে সে।

'কী ভাবছিস? পছন্দ হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে? মনের সুখে ঘর করবি। তোর ত আর আমাদের মত তেল-নুন-লকড়ীর চিন্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে না।'

উত্তরের জন্য চেপে ধরি ওকে।

দুলাল একটু চুপ ক'রে থেকে কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, 'মনের সুখে ঘর-করার কথাই ভাবছি। যদি অমন বৌকেও ভালবাসতে না পারি? যদি এরপর অন্য—মানে অন্য কোন কথা শুনি?'

কথাটা ব'লে একটু যেন শঙ্কিত, একটু জিজ্ঞাসু ভাবে চায় ও।

'পাগল না কিরে তুই!' ধমক দিয়ে উঠি 'কী আবার শুনবি, বলছিনা আমরা খবর নিয়ে এসেছি ভাল ক'রে। আচ্ছা পাগলামী! এখনও ঐ কথা ভাবছিস?'

অপ্রতিভ দুলাল আবার বাসরে গিয়ে বসল।

তারপর থেকে অবশ্য আবার ওকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। বর-কনে নিয়ে হৈ হৈ করতে করতে ফেরা গেল। হাসি ঠাট্টা গল্প-গুজবে পথটা মধুর হয়ে রইল।

পরের দিন বৌভাত, নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ রইল না। পাড়াগাঁয়ে এখনও ক্রিয়াকর্ম হ'লে দুপুরেই খাওয়া হয়। সে খাওয়া শুরু হ'ল বেলা একটায়, শেষ হল রাত দশটায়। দুলালও খাটলে খুব। তারপর বেশ যেন একটু সাগ্রহে ও আনন্দের সঙ্গেই ফুলশয্যার ক্রিয়া-কলাপগুলো সেরে নিলে। বুঝলাম বধূর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য ও অধীর হয়ে আছে। আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।...

তারপরের দিন বেলা দশটা নাগাৎ হঠাৎ দুলাল এসে আমাকে বললে, 'শান্ত গঙ্গা স্নান করতে যাবি? তুই আমি, আর—আর বৌ?'

বিস্ময়ের শেষ রইল না! হঠাৎ গঙ্গাস্নান, তা আবার নতুন বৌকে নিয়ে! কী ব্যাপার?

ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে দুলালই কারণটা খুলে বললে, 'না, মানে আমার একটা মানসিক ছিল।'

'তা বেশ ত! মাও ত বোধ হয় যাবেন বলছিলেন, একদিন বৌকে নিয়ে—'

'না না, মা নয়, সে বড় ঝামেলা। সে যান ত যাবেন আর একদিন তাঁর বোকে নিয়ে। আজ এম্নি তুই, আমি আর মায়া—এই তিনজন।'

গঙ্গা এখান থেকে মাইল-দেড়েক। আমরা হেঁটেই যাব অবশ্য কিন্তু নতুন বৌকে ও কি ক'রে নিয়ে যাবে? বললাম, 'পাল্‌কী ডাকতে হবে নাকি?'

সে প্রশ্নের উত্তরে বললে, 'না না—আমি যে একখানা বেবি অষ্টিন কিনেছি, পুরোনো · হাল্‌কা গাড়ী, বেশ চলে যাবে মাঠের ওপর দিয়ে—'

'বাবা-মাকে বলেছিস ?'

'সে ভাই আমি পারব না। মাকে নয়, তুই বরং বাবাকে ব'লে একটু মত করিয়ে নিয়ে—।'

সে একেবারে কাকুতি মিনতি।

অগত্যা আমাকে যেতে হ'ল বাবা-মার কাছে। বাবা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে চেয়ে রইলেন ওর মায়ের দিকে কিন্তু মা বললেন, 'তা যাক না। সত্যিই হয়ত মানসিক টানসিক আছে। আর কীই বা করবে, শান্ত ত সঙ্গে রইল।'

ছোট গাড়ী। দুলালই নিয়ে চলল আমাদের। মায়ার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ভাল ক'রে—তাতে দুঃখ বা অশান্তির চিহ্ন নেই—সলজ্জ হাসি মুখ। আরও নিশ্চিন্ত হলুম।

গাড়ী অনেকদূর গেলেও শেষ খানিকটা পথ হেঁটেই যেতে হল। সেইজন্য দুলাল নিয়ে গেল অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী একটা অঘাটায়। বললে, 'একটু নির্জনও হবে, অথচ বেশ পরিষ্কার। এখানে আমি অনেকদিন চান করেছি।'

কিন্তু জলে নামতে গিয়ে ওর মনে পড়ল যে গামছাগুলো কাগজে জড়ানো ছিল, সে প্যাকেটটা ফেলে এসেছে গাড়ীতেই। আমার দিকে চেয়ে একটু বিপন্ন মুখেই বললে, 'শান্ত একটু যাবি ভাই ? প্লিজ ? নয়ত—না হয় তুই থাক্—'

সেটা খুবই অনিচ্ছা। তা ছাড়া নতুন বৌয়ের সঙ্গে নির্জন ঘাটে একা থাকব কেন ? সুতরাং আমিই আবার ফিরে গেলাম গাড়ীতে। সমস্ত পাড়টা উঠে, আরও খানিকটা গিয়ে তবে গাড়ী—যেতে আসতে মিনিট পনেরো-কুড়ি ত বটেই।

ফিরে আসবার সময় কাছাকাছি আসতেই অকস্মাৎ একটা যেন চাপা আর্তনাদ কানে এল। খানিকটা গোঙানি, খানিকটা কান্না—কিম্বা ঠিক তাও নয়, অব্যক্ত একটা ভয় পাওয়ার আর্তনাদ।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি মায়াকে গঙ্গার জলে নামিয়ে চেপে ধরেছে দুলাল। সে ছটফট্ করছে ওর হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য। কিন্তু পাগলের বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়া পাওয়া তার কাজ নয়। কাছাকাছি কোথাও লোক নেই ব'লেই বোধ হয় মায়া চেঁচিয়ে ওঠেনি—কিংবা অত্যধিক ভয়েই তার গলা ধরে এসেছে কেমন একটা অস্ফুট অস্বাভাবিক কান্নার আওয়াজ বেরোচ্ছে তার, আর দুলাল চাপা তীক্ষ্ণকণ্ঠে ওকে বলে চলেছে, 'বলো, বলো, এই গলা-জলে দাঁড়িয়ে

বলো যে এর আগে তোমার আর একবার বিয়ে হয়নি। বলো বলো শিগ্‌গির!'

ক্রমশঃই কথাগুলো দ্রুত হয়ে আসছে, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, হিংস্র।

খাড়া পাড়, আগের দিনের বৃষ্টিতে পিছল, নাম্‌তে দেরি হ'ল, আমার ভয় হচ্ছিল মেয়েটা বুঝি মারাই যায়। যা নেতিয়ে পড়েছে! কোনমতে ছুটে এসে এক ঝট্‌কায় ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মায়াকে টেনে তুললুম ওপরে, তারপর রাগের চোটে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মারলুম দুলালের গালে এক চড়!

'হতভাগা বাঁদর কোথাকার। একেবারে পশু হয়ে গিয়েছ? আমরা সবাই—তোমার বাবা মা—সকলে পরামর্শ ক'রে তোমাকে ঠকিয়েছি, না?'

দুলাল মার খেয়ে রাগ করল না। এতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় কতকটা নির্জীব হয়েও পড়েছিল। ম্লান হেসে বললে, 'তোমরা ঠকাবে কেন—ঠকতেও ত পারো। এ যে আমার অদৃষ্টলিপি। ভাগ্য বলবান!'

'এত জানো, কবে মরবে জেনে রাখতে পারোনি? তাহ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হতুম!' তখনও রাগটা সামলাতে পারিনি, হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে গেল, যদিও পরক্ষণেই বুঝলুম মায়ার সামনে বলা উচিত হয়নি।

দুলাল কিন্তু অদ্ভুত একরকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠেই বললে, 'কেন জানব না, জানি ত! আজ থেকে ঠিক পাঁচ বছর পরে আত্মহত্যা ক'রে মরতে হবে আমাকে। তিনজন জ্যোতিষীকে দেখিয়েছি।'

'তবে বিয়ে করলে কেন?' আমার কণ্ঠে বোধ হয় বিদ্রূপই ফুটে ওঠে।

'সেও যে আমার অদৃষ্ট।' সহজ ভাবে দুলাল উত্তর দেয়।

বাড়ি ফিরতে ওর বাবা সব শুনে বিষম অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। নববধূর কাছে তাঁর লজ্জা ও সঙ্কোচের শেষ রইল না। তিনি মায়ার দুটি হাত ধরে বার বার বলতে লাগলেন, 'তুমি আমাদের ক্ষমা করো বৌমা, ও যে এমন পশু হয়ে গিয়েছে তা জানতুম না—তাহলে বিয়েই দিতুম না ওর, এটা ঠিক।'

মা নিঃশব্দে চোখের জল মুছতে লাগলেন। আমিই বরং আশ্বাস দিয়ে বললুম যে, 'কিছু ভাববেন না—মায়াই সব ঠিক ক'রে নেবে 'খন!'

•

এরপর ক্রমশঃ আবার ওর সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল হয়ে এল! তার প্রধান কারণ ওখানকার চাকরি ছেড়ে মীরাট চলে এসেছি অধ্যাপক হয়ে। গরমের ছুটিতেও

আর বিশেষ দেশে ফেরা হয় না, কেন না বিস্তর খরচ। স্ত্রী-পুত্রকেও এখানে এনে বাসা করেছি।

তবে খবর পাই বৈকি মধ্যে মধ্যে! দুঃসংবাদ যত।

দুলালের বাবা মারা গেছেন। মায়া বেচারী কিছুতেই ওর সঙ্গে ঘর করতে পারেনি। ঠিক কি হয়েছিল অতদূর থেকে তার সংবাদ না জানলেও দুলালের ঐ সংশয়ই যে তাদের মনের মিল হবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এটুকু শুনেছি। কিন্তু শুনে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর করবার কি আছে? আমরা কি করতে পারি! পাগলের হয়ত চিকিৎসা হয়—কিন্তু কেই-বা তা চাড় ক'রে করছে?...

বছর চারেক পরে ভাই-ঝির বিবাহ উপলক্ষে দেশে ফিরেছি; খবর পেয়ে দুলালই এল দেখা করতে। ওর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে আজকাল ঘৃণা বোধ হয়—কইলামও না ও কিন্তু খানিকটা বসে থাকার পর চলে যাবার সময় আমার দুটো হাত ধরে খুব বিমর্ষভাবে বললে, 'তুই কথা না কোস্ শান্ত—তোকে কিন্তু আমি ছাড়ব না। আমার ত গোনা দিন ফুরিয়ে আস্ছে, মা আর মায়ার ভার তোকেই নিতে হবে। বেচারী মায়া, ওর যদি একটা ছেলেও হ'ত তবু তাকে নিয়ে দিন কাটাতে পারত, কিন্তু পাছে আবার একটা পাগল জন্মায় সেই ভয়ে ও চেষ্টাই করিনি।'

ওহো! কথাটা ত ভুলেই গিয়েছিলুম। সেই পাঁচ বছর যে শেষ হয়ে এসেছে। কী সর্বনাশ!

অনেক বোঝালাম ওকে। খামোকা আত্মহত্যাই বা করবে কেন? কী এমন দুঃখ?

ও বললে, 'না না, দুঃখের ত কথা হচ্ছে না, বরাতে যা আছে তা ঠেকাবো কি করে?'

অর্থাৎ বদ্ধ পাগল। অনেক বুঝিয়েও কোন ফল হ'ল না। হিসেব করলাম আর মোটে তিন দিন আছে ওর সেই পাঁচ বছর পূর্ণ হবার। ছুটে গেলাম ওর মার কাছে; মা, ওদের সরকার মশাই, বুড়ো চাকর সকলকার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করলুম যে এই তিনটে দিন বিশেষ ক'রে শেষ দিনটা সবাই ওকে চোখে চোখে রাখবে, দিনরাতের এক মুহূর্তও নজর ছাড়া করবে না। ইতিমধ্যে আমি গিয়ে জোর ক'রে মায়াকে তার বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে এলাম—যদি পুনর্মিলন একটা হয়। দুলালকে বললাম যে আমার সঙ্গে এবার কাশী চলুক, ভৃগুসংহিতার মতে ভাল ক'রে সব গনিয়ে দেব।

মনে হ'ল যেন এই কথাটা শেষ পর্যন্ত ওর প্রাণে লাগল। বেশ হাসি-খুশি হয়ে উঠল, এমন কি এ প্রস্তাবও করলে যে মায়াকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে, ভৃগুসংহিতা যদি বলে তাহ'লে আর কি; নিশ্চিন্ত হ'তে পারে ও।

তবু আমরা পাহারা শিথিল করলুম না। শেষ দিনটা সমস্ত রাত জেগে রইলেন মা আর মায়া, বুড়ো চাকর ঘরের বাইরে বসে বসে তামাক খেলে। যাই হোক ভালয় ভালয় সে দিনটা কেটে গেল।

পরের দিন সকালে উঠে ওকে ডেকে বললুম, 'কি বন্ধু তোমার মরবার দিন ত পেরিয়ে গেল। এবার বুঝলে যে ওসব কিছু নয়? ভাগ্যকে অত সহজে জানা যায় না! সে সত্যিই অ-দৃষ্ট।'

দুলাল যেন একটু বিমর্ষ ভাবেই বললে, 'হুঁ' তারপর অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন বসে বসে ভাবলে। মিনিট কতক দেখে আমি ওকে একটা ঠেলা মেরে বললুম, 'কীরে, কি ভাবছিস্?'

'না এমনি। আশ্চর্য! এতগুলো পুঁথি মিলোলুম। এত হিসেব করলুম। সব ভুল।...যাক্ গে—তাহ'লে কাশীতেই যাওয়া যাক, কি বলিস? ভাল ক'রে সব দেখিয়ে শুনিয়ে আনব নতুন ক'রে আগাগোড়া। এ্যাঁ?'

'তাইত বলছি। সে বাবা ভৃগুসংহিতা, চালাকি ত নয়, সেখানে ভুল হবার উপায় নেই। বলিস ত লুধিয়ানায় খুব বড় করকোষ্ঠি বিচারক একজন আছেন, তাঁর কাছেও নিয়ে যেতে পারি!'

খুব জোর দিয়ে বলি কথাগুলো। যে রোগের যা মন্ত্র! কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা তোলা যায়, মন্দ কি?

দুলাল যেন আঁধারে কূল পেল। সাগ্রহে বললে, 'তবে ঐ কথাই পাকা রইল। কবে কলেজ খুলবে তোর? কবে যাবি এখান থেকে? আমি বলি কি ও দুটোই—'

'তাই হবে। দু'জায়গাতেই নিয়ে যাবো তোকে, ভাবছিস্ কেন!'

আশ্বাস দিয়ে বলি ওকে।

দুলাল যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। হাঁক ডাক ক'রে অনেকদিন পরে পর পর তিন পেয়ালা চা খেয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করে বলল, 'আজ এইখানে খেয়ে যাবি, একসঙ্গে বসে খাবো। না, না, কোন কথা শুনব না।'

দুপুরে স্নান করার আগে আমি বসে তেল মাখছি। ও বললে, 'দাঁড়া, দাড়িটা কামিয়ে নেই। এ তিনদিন ওরা ত ক্ষুর ছুঁতেই দেয়নি। অশৌচের মত দাড়ি হয়েছে।'

তা নিক। আমি ত এই দোরে বসেই তেল মাখছি। তা ছাড়া সেদিন যখন পার হয়ে গেছে, ওর মনেও নতুন আশা এসেছে, তখন আর ভয় কি!

ও চেয়ারে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল, আমার দিকে পাশ দিয়ে, জানলার দিকে মুখ করে। আমিও একটু তেল মাখতে মাখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। অকস্মাৎ অদ্ভুত একটা আওয়াজে, যেন হাসিরই একটা বিকৃত চেষ্টায় চমকে উঠে দেখি দুলাল ক্ষুরটা পুরো বসিয়ে দিয়েছে নিজের গলায়। তারপর হাসবার একটা চেষ্টা করতে করতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ছুটে যাবার আগেই টলে পড়ে গেল সে। মাথার কোণ্‌টা টেবিলের পায়ায় ঠেকে উঁচু হয়ে রইল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে দুলাল, 'কী, ভাগ্য নাকি কিছু নয়, ও নাকি অ-দৃষ্ট। আমি জানি যে—'

আরও কি বলবার চেষ্টা করলে কিন্তু কথা জড়িয়ে গিয়ে একটা ঘড় ঘড় আওয়াজ বেরোল খানিকটা। তারপরই সব থেমে গেল। মুখের ওপর সেই বিকৃত হাসিটা শুধু স্থির হয়ে লেগে রইল।

কৈলাস বাবা

কৈলাস-বাবার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় মানসসরোবরের পথে। মায়াবতী আশ্রম থেকে বাড়তি কম্বল প্রভৃতি নিয়ে গেছি, তবু শীত যেন ভাঙতে চায় না। মনে হয় অষ্টপ্রহর যদি গরম ফুটন্ত চা কি কফি খেয়ে যেতে পারি তবে হয়ত একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করব। এই অবস্থায় একটা লোককে প্রায় খালি গায়ে একটা পাথরের ওপর বসে গুনগুন ক'রে ভজন গাইতে দেখলে মনের ভাব কেমন হয় তা সহজেই অনুমেয়।

হ্যাঁ—অবশ্য সেটা প্রায় ভোরবেলা, তখনও হাড়-কাঁপানো বাতাস বইতে শুরু করেনি, আর একটু পরে অর্থাৎ রোদটা ভাল করে উঠলেই সেই বাতাস শুরু হবে, বেলা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত চলবে সেই ঝড়ের মত তীব্র আর বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস। তবু এখনই বা শীত কম কি ! যে পাথরটার ওপর লোকটা বসেছেঁ সেটায় হয়ত রাতভোর বরফ জমে ছিল, এখন সেগুলো সরিয়ে ফেলে দিয়েই বসেছে। ঐটেই এত ঠাণ্ডা যে খালি হাত একবার রাখলেই হিম-ফোস্কা পড়ে যাবে।

কৌতুহল হ'ল বিষম। মিলিটারী গ্রেট কোটটার ওপর কম্বল চাপিয়ে তাঁবুর বাইরে এলুম।

হ্যাঁ—একে তো ক'দিনই দেখছি বটে ! এক-মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গলায় একটা লালসুতোর মালা, চোখ দুটো কেমন এক রকম যেন—ঠিক লাল নয় অথচ ঘোলাটেও নয়—উদাস-দৃষ্টি। গায়ে একটি কম্বল জড়ানো ছিল, কিন্তু সেটা এখন আর ঠিক গায়ে নেই। এলিয়ে পড়ে কোমরের কাছে জড়ো হয়ে রয়েছে। চেয়ে আছে উদাস দুটি চোখ মেলে দিগন্তের দিকে। দিগন্ত অবশ্যই এখানে একটা নতুন জিনিস বটে—এ ক-দিন যে দিকে চেয়েছি, দৃষ্টি আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একেবারে উপরের দিকে না তাকালে আকাশ দেখার উপায় নেই। কাল তাই এই উপত্যকার মত বিস্তৃত জায়গাটা পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছে সকলকারই। মুটেদের কথা না শুনে এখানেই সকলে তাঁবু ফেলেছেন। তবু এত মনোযোগেরই বা কি আছে ?

কাছে গিয়ে আস্তে একবার প্রণাম জানালাম।

'নারায়ণ বাবা !'

কানে গেল না কথাটা। তেমনই উদাস ভাবে চেয়ে বসে গুনগুন করে ভজন গাইতে লাগলেন। এবার একটু হেঁকেই বললাম, 'মহারাজ বাবা, নারায়ণ !'

একটু যেন চমকে চোখ তুলে তাকালেদিও আছে, আর আছে টর্চের ব্যাটারি। কেমন এক রকমের স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। মবিদ্যুতগতিতেই ঘুরছে—পান চিরে নয়, সমস্ত চেহারাটাই গেল পালটে। অন্তরে এ.যেন যন্ত্রে চলছে। অন্তত থাকলে এ হাসি সম্ভব নয়। হঠাৎ লোকটির ওপর শ্রদ্ধা হ'লচ্ছে চোখের পলক সেই পাথরটার ওপরই আস্তে আস্তে বসে পড়লাম, ওঁর পাশে।

লোকটি বললেন, 'আমাকে মহারাজ বলে ডাকবেন না ভাই, ভ্রি। অপরাধ হয়।'

আরও বিস্ময়।

'আপনি কি তাহ'লে বাঙালী?'

'হ্যাঁ। আপনি কি ভেবেছিলেন?'

'আমি ভেবেছিলুম গোরখপুর কি বালিয়া জেলার লোক হবেন—'

'কিছু মিছে ভাবেন নি। আমার বাবা বহুদিন দেওরিয়া স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, সমস্ত বাল্য আর যৌবন ইউ.পি.তেই কেটেছে। তারপরও ধরুন এই সব হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে—।'

'তা আপনি 'মহারাজ' বলাতে আপত্তি করছেন কেন? সন্ন্যাসীকে তো মহারাজই বলে।'

'কি আমি তো এখনও সন্ন্যাসী হই নি ভাই।'

'সন্ন্যাসী হন নি?'

'না। গুরু মহারাজ এখনও সন্ন্যাস দিতে রাজী নন। বলেন, খাদ বার ক'রে খাটি সোনা করব, তবে গড়ব ইচ্ছামত।'

'সে কি? পরীক্ষা না কি?'

'হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। ঠিক পরীক্ষা নয়—উনি বলেন, সংসারটা ভাল ক'রে ত্থাখো তবে ত্যাগ ক'রো। তার আগে নয়। সংসার না চিনে সংসার ছাড়লে নাকি সেও ছেড়ে কথা কয় না!'

'কিন্তু এই ভাবে সন্ন্যাসীদের দলে মিশে ঘুরে বেড়ালে সংসার খুব ভাল ক'রে চেনা যাবে কি?'

'না না—এ তো আমার ছুটি। মাঝে মাঝে তীর্থ করতে যাবার ছুটি মেলে।'

'কি কাজ করেন?'

'কিছু ঠিক নেই ভাই, গুরু যখন যা বলেন।'

'চাকরী বাকরী—?'

,ত তাও করেছি বৈকি !'

কৈলাস-বাবার সঙ্গে আমার প্রথম্আর বেশি খুলে বলতে চান না। একটু
আশ্রম থেকে বাড়তি কম্বল। গায়ের দিকে।
মনে হয় অষ্টপ্রহরনিয়মিত যোগ করেন বুঝি, নইলে এই ঠাণ্ডায় খালি গায়ে—'
একটু স্বাচ্ছন্দ হাসলেন তিনি। বললেন, 'না না—এর জন্যে যোগ-তপস্যা লাগে
এ-সবই অভ্যাস। এও গুরুর আদেশ, তিনি বলেন দেহকে সব রকম
সইয়ে নেবে।'

ততক্ষণে আরও ভাল ক'রে ফরসা হয়েছে, বাতাস ছেড়েছে একটু একটু—কম্বল, 'গ্রেট কোট,' তার নিচে পশমী গেঞ্জি, সোয়েটার, তবু যেন হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি লাগছে। কাজেই কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত হ'ল।

'কিন্তু অভ্যাসে কি এ শীত যায় ?'

'যায় বৈকি ভাই। কত গরীব লোক তো খালি গায়ে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়ে দিন কাটায়—আপনাদের যখন কম্বল-লেপে শীত ভাঙে না।···তাছাড়া আগেকার মেয়েরা সর্বজয়া ব্রত করত শোনেন নি ?—এক এক বছর এক একটা ত্যাগ করতে হ'ত! সব রকম শীতবস্ত্র আর শয্যা ত্যাগ ক'রেও তারা বেঁচে থাকত !'

না, হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠ্ছে। সাধুবাবাও এবার কম্বলটা টেনে গায়ে দিলেন। আমি উঠে পড়লাম।

যাবার আগে আর একটি প্রশ্ন করলাম, 'আপনার তো সন্ন্যাস এখনও হয় নি—সংসারাশ্রমের নাম বলতে বাধা নেই।···আপনার নামটি কি জানতে পারি কি ?'

'বাধা কিছু নেই। তবে কিই-বা হবে নাম জেনে! সবাই আমাকে কৈলাস-বাবা ব'লে ডাকে—আপনিও তাই বলবেন।'

'আচ্ছা।' হাত তুলে নমস্কার ক'রে চলে এলাম।

এর পর কৈলাসবাবার সঙ্গে দেখা হ'ল অপ্রত্যাশিতভাবে হরিদ্বার-কুম্ভমেলায়। কিন্তু এ কি চেহারা তাঁর।

ঝাঁকড়া চুল আর গলায় সুতোর মালা তেমনি আছে বটে, কিন্তু এ কোন্ কাজে লেগেছেন ? সন্ন্যাস গেল তাহ'লে ?

রাস্তার ধারে ঠিক ঘাঁত বুঝে দিয়েছেন এক পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান—

তার সঙ্গে কিছু কিছু লজেঞ্চস্ ইত্যাদিও আছে, আর আছে টর্চের ব্যাটারি। অসম্ভব বিক্রী, কৈলাস বাবার হাত ঠিক যেন বিদ্যুতগতিতেই ঘুরছে—পান চিরে সাজিয়ে তাতে চুনের গোলা ও অন্য মশলা দেওয়া—এ যেন যন্ত্রে চলছে। অন্তত ত্রিশ খিলি পানের ওপর দিয়ে একবার ক'রে হাতটা ঘুরে আসছে চোখের পলক একবার পড়বার মধ্যেই।

বা রে কৈলাস-বাবা! এই সন্ন্যাস তোমার? গুরু ঐ জন্যেই দীক্ষা দেন নি।

একটু বিদ্রূপ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কাছে গিয়ে দু হাত তুলে নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে বললাম, 'এই যে কৈলাস-বাবা, কি রকম? ভাল আছেন? নারায়ণ!'

কিছুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না লোকটা। তেমনি মধুর হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, 'এই যে, ভাল আছেন ভাই? নারায়ণ, নারায়ণ! কবে আসা হ'ল?'

'এই দু তিন দিন হ'ল।'

ওধারের পথটা পুলিশ কি কারণে আটকেছে। ভীড় কমে এসেছে রাস্তায় —মিনিট দুই-তিনের অবসর। আমিও খদ্দের ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই বেচে সিকিটা ভাল ক'রে দেখে বাকী পয়সা ফেরৎ দিয়ে আবার হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে।

আমি একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরেই বললাম, 'সাধুগিরি গেল তাহলে? গুরু পরখ করতে করতে সত্যিই জালে জড়িয়ে দিলেন?'

দুটো হাত দুদিকে উল্‌টে বললেন, 'সবই তাঁর কৃপা।'

'দোকান করেছেন কত দিন?'

'এই তো—মেলার কদিন আগে। তা মাসখানেক হ'ল!'

'বেশ দু-পয়সা হচ্ছে তাহলে। তা বেছে বেছে আস্তানা গেড়েছেন ভাল —একেবারে মোড়ের মাথায়!'

'যা করব তা ভাল ক'রে করাই উচিত নয় কি? ব্যবসা করতে বসলে মন দিয়েই করা দরকার। ঠিক না?'

'তা তো ঠিকই।'

একবার ইচ্ছা হ'ল বলি যে, আর ও ঝাঁকড়া চুল খালি-গায়ের ভেকই বা কেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হ'ল না। রাস্তা ছেড়েছে পুলিশ, প্রবহমান জনস্রোতে কোথায় ভেসে চলে গেলাম।

সেদিন বহু রাত্রি পর্যন্ত ও-পারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। সাধু অসাধু দুই-ই প্রচুর দেখে যখন বাড়ি ফিরছি, তখন রাত প্রায় সাড়ে-এগারোটা হবে, কৈলাস-বাবার সঙ্গে দেখা।

কনখলের পথে পোলটা পেরিয়ে অনেকগুলো ফাঁকা জায়গা নিয়ে যাত্রীদের আস্তানা হয়েছে, তারই সামনে রাস্তার ধারে ধারে দুধ-দহি-খাবারের দোকান। আপন মনে পথ হাঁটছি, হঠাৎ কানে গেল পরিচিত মিষ্টি কণ্ঠস্বর—'জয় রামজীকি, ভিক্ষা মিলি কুছ ?'

'জয় রামজীকি, বৈঠিয়ে বাবা। থোড়া দুধ পিলাউ ?'

'যো তুমহারা মর্জি।'

ভাল করে তাকিয়ে দেখি, ঠিক—কৈলাস-বাবাই বটে! দোকানের সামনের সরু বেঞ্চিতে বসে পড়েছেন ততক্ষণে। তেমনই খালি গা, কোমরে একটা চাদর জড়ানো, চোখের দৃষ্টিতে তেমনি উদাস নির্লিপ্ততা।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি রীতিমত—তা বলাই বাহুল্য। সত্যিই কি লোকটা ভিক্ষা চাইছে, না ঠাট্টা ?

দোকানী খুব সম্ভ্রমের সঙ্গেই একটা আধসেরা ভাঁড় ক'রে গরম দুধ এগিয়ে দিলে—তার সঙ্গে একটা পাতার ঠোঙায় বোধ হয় গোটাচারেক লাড্ডু।

কৈলাস-বাবা দুধের ভাঁড়টি নিলেন, কিন্তু ঠোঙাটা কিছুতেই নিলেন না।

'ব্যাস্—এহি কাফি হ্যায় জী। বহুৎ কাফি হ্যায়!'

দোকানী ছাড়বে না উনিও নেবেন না—শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে একটা মাত্র লাড্ডু তুলে নিলেন।

দুধ খাওয়া শেষ ক'রে দোকানীর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে কোমরের চাদরটা খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে কৈলাস-বাবা খুব সম্ভব বাড়ীর পথ ধরলেন, কিন্তু সত্যি-সত্যিই—কোন দাম তো দিতে দেখলুম না।

কাছে এগিয়ে গিয়ে দোকানীকে প্রশ্ন করলুম, 'কই, তোমার ঐ খদ্দের তো দুধের দাম দিলে না ?'

দোকানী এতখানি জিভ্ কেটে বললেন, 'না না, ও তো বিক্রী করা নয়—এ ওঁর সেবার জন্য এমনি দিয়েছি।'

রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বালা ক'রে উঠল, বললুম, 'কিন্তু ওকে এমনি দেবার মানে কি ? জানো হরিদ্বারে ওর ভাল দোকান আছে—বহুৎ টাকা ওর রোজগার, *দিনে বোধ হয় একশ' টাকারও বেশি লাভ হচ্ছে এখন ?'*

'হাঁ বাবুজী, জানি বৈ কি। বাবা তো ঝুট্ বাত বলেন না। কাল জিজ্ঞাসা করেছিলুম বললেন—শও রূপেয়াসেভি বেশি নফা হয়েছে।'

'তবে ? ওকে এমনি দেবে কেন ?'

'কিন্তু বাবুজী, সে পয়সা তো একটাও উনি ছোঁন না। সারাদিনের সমস্ত লাভের টাকা এই রাত্রিতেই পাই পয়সা পর্যন্ত গরীবদের বিলিয়ে দিয়ে আসেন। নিজে খান ভিক্ষা করে। আর এক জায়গার বেশি দু'জায়গায় ভিক্ষা করবেন না—সারাদিনে কিছু খাবেনও না। এই যা হ'ল ব্যাস্—আবার কাল রাত্রে !'

'তা—তার মানে ?'

নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

'এই রকমই ওঁর তপস্যা। গুরুর হুকুম আছে ইচ্ছা ক'রলে খোরাকীর টাকা কারবার থেকে নিতে পারেন কিন্তু উনি নেন না—তাতে নাকি লোভ বেড়ে যাবে। যতটা কম নিলে চলে তার চেয়ে বেশি নিয়ে ফেলবেন !'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম চুপ ক'রে।

ক্রমশই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে লোকটা।

তারপর পাঁচ-ছ বছর কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলে একটা রাস্তার মোড়ে আবার দেখা পেলুম কৈলাস-বাবার।

একখানা লাল গামছা কাছাকোঁচা দিয়ে পরা, পানের দোকান থেকে গোটাতিনেক সোডার বোতল কিনে নিয়ে বোধ করি বাড়ি বা আস্তানার দিকেই ফিরছেন।

চোখোচোখি হ'তে চিনতে পারলেন। তেমনিই মধুর হাসিতে মুখ ভরে উঠল। কিছুই বদ্‌লায়নি মানুষটির—তেমনি ঝাঁকড়া চুল, তেমনি গলায় লাল সুতোর মালা—এমন কি বয়সটাও যেন বাড়ে নি। শুধু যা কাপড় কিছু পরনে নেই, ঐ গামছাটুকুই সম্বল।

'আপনি এখানে ?'

'হ্যাঁ—ভাই, বছরখানেক আছি।'

'কিন্তু এ পাড়ায়—কোথায় থাকেন ?'

'ঐ যে, ঐ বাড়িটায়।'

আঙুল দিয়ে যেটা দেখিয়ে দিলেন, সেটার আকৃতি প্রকৃতি দেখে আরও বিস্মিত হলুম।

'ঐ বাড়িতে—মানে, আপনি থাকেন ?'

'নোক্‌রি করি।'

'কি কাজ ?'

'ঘর মোছা, বাসন মাজা, ফাইফরমাস খাটা—সবই।'

'এই কাজ আপনি করেন ?'

'হ্যাঁ। গুরুর হুকুম।'

'কিন্তু ওটা তো— ?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, ওটা গোলাপী বিবির বাড়ি।'

'তাহ'লে ?'

'গুরুজীর এমনিই হুকুম।'

'এমনি হুকুম! ঐ রকমের কারোর কাছে চাকরী করতে হবে ?'

'হ্যাঁ—এক বছর।'

'এক বছর ? ঐ নরককুণ্ডে ?'

'হ্যাঁ, আমার যা কিছু পাপ হয়তো এই নরকেই শেষ হবে।'

'আরও কী পরীক্ষা বাকী থাকবে ?'

'আর কিছু নয়—এই শেষ।'

চুপ ক'রে থাকি।

একটু পরে কৈলাস-বাবাই আবার কথা বলেন, 'আসুন না—আসবেন ?'

চমকে উঠে বলি, 'ঐখানে ?'

'দোষ কি ? দেখে যান না।'

তারপর বলেন, হেসেই বলেন, 'আজই শেষ। আজ মধ্যরাত্রে বেরিয়ে চলে যাব কুমায়ুন, সেইখানে গুরুদেব অপেক্ষা ক'রে আছেন। সেই জন্যই বলছি চলুন না, ক-টা ঘণ্টা বই তো নয়! জীবন দেখবেন একটু।'

'কিন্তু ওখানে কি বলবেন ?'

'কিছুই বলতে হবে না। অন্য চাকর কেউ নেই, নিচের তলায় আমারই রাজত্ব। ঝি আছে একজন, কিন্তু সে কি জানি কেন আমাকে গুরুর মত ভক্তি করে, আমার লোক দেখলে কিছুই বলবে না।'

কৌতূহল হ'ল—প্রবল কৌতূহল। হাতেও তেমন কোন জরুরী কাজ নেই। পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে, ফোন্ ক'রে বলে দিলুম বাড়িতে খবর দিতে—ফিরতে রাত হবে।

কৈলাস-বাবার পিছু পিছু গেলুম। নিচের একটা কোণে অন্ধকূপ এক ফালি ঘর, সেইখানেই কৈলাস-বাবা থাকেন। একটা সরু চৌকি, তাতে একটা কম্বল পাতা—বিছানা বলতে ঐ—না বালিশ না কিছু। একটা দড়ির আলনায় গোটা দুই কৌপীন ও আর একখানা গামছা। জলখাবার একটা ঘটি। আর কিছুই নেই।

আমাকে বসিয়ে রেখে কৈলাস-বাবা ওপরে চলে গেলেন। একটু পরেই নেমে এলেন, হাতে একটা টিফিন-কেরিয়ার। আর এক হাতে ছিল একখানা বাংলা মাসিক। সেটা দিয়ে বলে গেলেন, 'বসে বসে পড়ুন, আমি ঘুরে আসি।'

'কোথায় চললেন ?'

'হোটেলে। খাবার আসবে—কাটলেট, চপ, মাংস।'

'হোটেল থেকেই রোজ আসে নাকি ?'

'না। বিবির এক বোন আছে বড়, সকালে সেই রাঁধে। রাত্রে দরকার হয় না—এই সবই চলে তো!'

'বাড়িতে আর কে আছে ?'

'কেউ না। এই দুই বোন দোতালায়। তেতালায় এক অভিনেত্রী থাকেন, তিনি খুব ভদ্র। তাঁর এক বাবু আসেন গভীর রাত্রে, ভোর বেলা চলে যান। তাঁর একটি ঝি আছে, সেই রাঁধে, বাজার করে—সব কাজ করে। বাড়িটা বিবিরই—বেশি ভাড়াটে ওর পছন্দ নয়। নিচের তলায় এক ভাড়াটে একবার খুন হয়েছিল, তার পর থেকে আর ভাড়া দেন নি।'

'এতবড় বাড়িতে একাই থাকেন ?'

'আর আছে এক গুর্খা দারোয়ান। তার অসুখ করেছে, দিন কতক হ'ল হাসপাতালে গেছে—নইলে নিচের তলা এত নির্জন থাকে না।'

কৈলাস-বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমি বসে বসে কাগজখানার পাতা ওলটাতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে অর্থাৎ সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এলে তিনি ফিরলেন। স্নান করেছেন ইতিমধ্যে। কৌপীন ও গামছা পালটে বললেন, 'বসুন, পাশের ঘর থেকে একটু আসছি।'

বুঝলাম পূজা-আহ্নিক কিছু করতে গেলেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন, 'এইবার কিছুক্ষণ আমার ছুটি, বসি আপনার কাছে।'

চুপ করে বসলেন। স্মিত-প্রসন্ন মুখ। উদ্বেগ নেই, লজ্জা নেই, বিরক্তি নেই। প্রশ্ন করলাম, 'এখান থেকে কি আজই চলে যাবেন ?'

'যাব বলেই মনে করেছি।'

'এঁকে বলেছেন ?'

'চাকরীতে ভর্তি হবার সময়ই বলেছিলুম যে ঠিক এক বৎসর থাকব আমি।'

'সে কথা কি ওঁর মনে আছে ?'

'না থাকে তো কি করব বলুন। মনে পড়বে—পরে।'

'কিন্তু—একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন।'

'মনে করব কেন ? বলুন না।'

'আমি আরও দু-চার জনের সন্ন্যাসী হওয়ার কথা জানি। তাঁদেরও পর পর কতকগুলি স্টেজ আছে—আট বছর পরে, কেউবা চার বছর পরে পূর্ণ অভিষেক ক'রে সন্ন্যাস দেন, কিন্তু এরকম পরীক্ষার কথা শুনিনি কখনও—'

'জানি আপনার মনে বিষম কৌতূহল। অনেক দিন থেকে প্রশ্ন জমে আছে। সেই জন্যই ডেকে এনেছি। আজই বলব—আর তো সময় পাব না।'

বাইরে মোটর থামবার শব্দ হ'ল। বহু লোকের গলার স্বর, হাসির শব্দ। সবাই ওপরে উঠে গেলেন।

'এই বুঝি বাবু এলেন ?'

'হ্যাঁ। বাবু আর তাঁর তিন-চার বন্ধু। কোনদিন অপর স্ত্রীলোকও থাকে।'

'আপনাকে যেতে হবে না ?'

'না। সব জোগাড় তৈরী আছে।'

একটু থেমে কৈলাস-বাবা আবার আগের কথার খেই ধরলেন—

'ছেলেবেলা থেকেই আমার মন ছিল এদিকে, বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গও করেছি; লেখাপড়া যা করেছি তার ফাঁকে ফাঁকে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়বার চেষ্টা করেছি কিন্তু মন খুশী হয় নি—না পুঁথি পড়ে, না সন্ন্যাসী দেখে। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত। তবু ঘরের দিকেও মন আর ফেরাতে পারলুম না। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এঁর দেখা পেলুম হরিদ্বার কুম্ভমেলায়। ছদ্মবেশের ত্রুটি করেন নি—কি বস্ত্রে কি আচরণে। কিন্তু সূর্য কি আর মেঘে ঢাকা থাকে! পা জড়িয়ে ধরলুম। এড়াবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিছুতেই যখন পারলেন না, যখন সত্যিই আমার আন্তরিক আকুতির পরিচয় পেলেন,—তখন প্রসন্ন হলেন। তবে বললেন যে, সন্ন্যাস আমি অত সহজে দিতে পারব না, পাত্র বা আধার উপযুক্ত না হ'লে ও জিনিস দেওয়া ঠিক নয়, তাতে বিপরীত ফল হয়। আজ যে চারিদিক ভণ্ড ও মুখোশধারীতে ভরে গেছে তার কারণই হ'ল এই। তোমাকে

আমি দীক্ষা দিতে পারি, কিন্তু যে সাধারণ গৃহীর দীক্ষা—সন্ন্যাসের পথে তা তোমাকে নিয়ে যাবে না। আর সন্ন্যাস যদি চাও তো তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।...'

এই পর্যন্ত বলে কৈলাস-বাবা একটু থামলেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলুম, 'তারপর ?'

কৈলাস-বাবা কেমন একরকমভাবে দেওয়ালটার দিকে চেয়েছিলেন, বললেন, 'জানতে চাইলুম কি পরীক্ষা ? তিনি দু রকম পরীক্ষার প্রস্তাব দিলেন—হয় বিবাহ করে বারো বৎসর সংসারাশ্রম করতে হবে, নয়তো আঠারো বৎসর বিভিন্ন রকমের জীবন যাপন করতে হবে। এক এক বছর এক এক রকম। কখনও ব্যবসায়ী, কখনও চাকর, কখনও বা ভিখারী। মধ্যে মধ্যে এক মাস দুমাস ছুটি, সে ওঁর আদেশমত।...সংসারাশ্রম করা সম্ভব নয়, জড়িয়ে পড়তে পারি সে ভয় আমার নেই, কিন্তু আজীবন প্রতিপালনের ভার নিয়ে ত্যাগ করাটা আমি অধর্ম ব'লে মনে করি—বুদ্ধ চৈতন্যের সে পাপ স্পর্শ করে নি কারণ বিয়ে করবার সময় তাঁরা তাঁদের মন জানতেন না। আমি জেনেশুনে কেমন করে সে মিথ্যাচার করব ? তার চেয়ে এইটেই ঢের সোজা।·· গুরুর কৃপায় এই ক-বছর তাঁর ধ্যান করে কাটিয়ে দিয়েছি—দীর্ঘ আঠারো বৎসরও শেষ হয়েছে এতদিনে। আর একটা রাত। তারপরই শান্তি, তারপরই নূতন জীবন।'

'কিন্তু বিশ্রাম পাবেন কি ?'

'নিশ্চয়ই পাবনা। সাধনার তো সবে শুরু হবে। কিন্তু বিশ্রাম তো চাইও না। আমি তো কাজই চাই, তবে মনের মত কাজ। ভগবানের জন্য সাধনা তার চেয়ে মনের মত কাজ আর কি আছে ভাই ?'

রাত্রি গভীর হয়ে এল। ওপরের উন্মত্ত কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। কোথা দিয়ে রাত বারোটা বেজে গেছে টেরও পাই নি হঠাৎ চমক ভাঙ্গল কৈলাস বাবা যখন উঠে দাঁড়ালেন তখনই। ঘড়িটা দেখলুম বারোটা বেজে পনেরো মিনিট।

স্বপ্নাবিষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন দুহাত তুলে নমস্কার করলেন কৈলাস বাবা। তারপর বললেন, 'একটু কাজ বাকী আছে এখনও, দেখবেন ভাই কি কাজ করতে হয় আমাকে ? চলুন না।'

ওঁর পিছু পিছু উপরে উঠলুম, হয়তো এ কৌতূহল অশোভন জেনেও। সিঁড়ির পাশেই বড় হলঘর, আয়না, ছবি ও দামী আসবাবে সাজানো। তারই

মেঝেতে পুরু গদীর ওপর বিস্তৃত বিছানা। তাতেই সার সার পড়ে আছে মদমত্তের দল। তুটি স্ত্রীলোক তার মধ্যে—তাদেরও বেশবাস অসম্বৃত, মদ খেয়ে বমি ক'রে তারই মধ্যে ঘুমোচ্ছে অজ্ঞানের মত।

সেদিকে চোখ পড়ে লজ্জিত হয়ে বেরিয়ে আসছি, কৈলাস-বাবা বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? ওরা কি আর মানুষের স্তরে আছে? ওদের দেখে লজ্জা পাবার কারণ নেই।'

সযত্নে ও সস্নেহে, মা যেমন শিশুকে করে, তেমনি ভাবেই—কৈলাস-বাবা ওদের ধুইয়ে মুছিয়ে ওপরের বিছানায় শুইয়ে দিলেন। ওদের তুললেন, নাড়লেন অনায়াসেই, বয়স্ক লোকের হাতে পুতুলের মতই মনে হ'তে লাগল। পুরুষ-গুলোকেও যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ক'রে একপাশে শুইয়ে দিলেন। এইবার ঘর দোরের পালা। সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত ভাবে প্রসন্ন মুখে সেই বমিগুলে তুললেন হাতে ক'রে ক'রে—উচ্ছিষ্ট পাত্র, ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যগুলো জড়ো ক'রে নিচে নামিয়ে রেখে এলেন। তারপর ঘর মুছে, আলো নিবিয়ে, দোর ভেজিয়ে নীচে নেমে এসে স্নান করতে গেলেন।

এবার আমি বিদায় চাইলুম।

উনি বললেন, 'না না। একসঙ্গেই বেরোব। আর তু মিনিট।'

কোনমতে স্নান সেরে এসে আর একটি শুষ্ক কৌপীন ও গামছা পরলেন। একটি চাদরও ছিল এক কোণে জড়ো করা, সেটা কাঁধে ফেলে কুলুঙ্গি থেকে একমুঠো টাকা বার করলেন। গুনে গুনে কুড়িটি টাকা গুঁজলেন ট্যাঁকে, আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'ট্রেন ভাড়াটা সঙ্গে রাখলুম, এত পথ হেঁটে যাবার ধৈর্য আর নেই।' তারপর বাকী টাকাগুলো মুঠো ক'রে পাশের ঘরে গিয়ে বিন্দুর ঘুম ভাঙালেন, 'এই বিন্দু ওঠ্ ওঠ্।'

সে বেচারী ধড়মড় করে উঠে ব'সে বলে, 'কেন গো বাবাঠাকুর, কি হয়েছে?'

'এই টাকাগুলো রাখ্। আমি চললাম। এ মাসের মাইনে যদি দেয় তো তুই-ই নিস।'

'চললে—সে কি কথা?'

'হ্যাঁ। এক বছরের কড়ার ছিল, মনে ক'রে দেখ্। আজ বছর পুরল। বিবিকে আমার নমস্কার দিস্। সদর দোরটা বন্ধ কর্।'

বিন্দু তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে। হয়তো কিছু বলত—

কিন্তু চোখের জলে ভাষা গেল বন্ধ হয়ে। কৈলাস-বাবা দু হাত তুলে প্রতি-নমস্কার ক'রে ওর দিকে আর না চেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

হয়তো সবত্যাগীরও মমতা থাকে ভক্তের প্রতি।

তখন নিশুতি রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কৈলাস-বাবা শুধু বললেন, 'চলুন ভাই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই বাড়ীতে। এত রাতে একা যাওয়া ঠিক নয়!'

'কিন্তু তারপর? আপনিই বা একা যাবেন কেন? বাকি রাতটা আমার ওখানে কাটিয়ে যাবেন চলুন।'

'একা? কে বললে? আমি তো একা নই। গুরু যে আছেন সঙ্গেই।'

এই বলে গুনগুন ক'রে একটা ভজন গাইতে গাইতে দ্রুত পথ চলতে লাগলেন। বেশ বুঝলুম, খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

নরেন ঠাকুর

বড়বাজারে আপনার যাতায়াত আছে? তা হ'লে নরেন ঠাকুরকে নিশ্চয়ই দেখেছেন।

ছোট ছোট খ্যাংরা-ছাঁটা চুল, তার মধ্যে ফাঁসবাঁধা টিকিটি যেন উদ্যত কামানের মতই খাড়া হয়ে থাকে। গোঁফ দাড়ি কামানো কিন্তু সে অভাব পূরণ ক'রে নিয়েছে ওঁর দুই ভুরু এবং কান। কানের পাশে এত চুল থাকতে ঠাকুর আমাদের গোঁফ কামাতে গেলেন কেন—অনেকেই ভেবে পায় না। অবশ্য, গোঁফ-দাড়িও কামানো হয় সপ্তাহে দুবার কি একবার। বাবুদের বাড়ী ওঁদের মাইনে করা নাপিত যখন কামাতে আসে তখন যদি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে তবেই—ফলে সপ্তাহে অন্তত তিনটে দিন ক'রে কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে মুখখানা সজারুর মতই কন্টকিত থাকে।

নরেন ঠাকুর যে এঁদের ফার্মে কি করেন ঠিক, অর্থাৎ উনি এ ফার্মের কে, তা বোধ হয় আজ আর কারুরই ভাল-মত জানা নেই। বি. এন. মল্লিক য়্যাণ্ড মাইতি—ফার্মটি বহুকালের। এঁদের রামকৃষ্ণপুরে চালের গুদাম আছে, বড়বাজারে কাপড়ের আড়ৎ এবং দয়েহাটায় বিরাট লোহালক্করের দোকান। তিন ভাই এঁরা—মানে মল্লিকরাই তিন ভাই, মাইতি বলে এখন আর কেউ নেই, কোন-এককালে ছিল, সে অংশও এখন এঁদের—তিনজনে তিনটি কারবার দেখেন। বড়বাবু বসেন রামকৃষ্ণপুরে, মেজভাই বড়বাজারে, সেজভাই দয়েহাটায়। ছোট ভাই সম্প্রতি মারা গেছেন—তাঁর বিধবা স্ত্রী শিশু-পুত্র নিয়ে কতকটা এঁদের দয়া ও সুবিবেচনারই মুখ চেয়ে আছেন।

যত দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, ব্রহ্মার মত নরেন ঠাকুরও ছিলেন চতুরানন। এখন ওঁর তিনটি মুখ তিন মনিবের দিকে ফেরানো থাকে। মিছে কথা ব'লে এবং অনবরত ধরা পড়ে পড়ে একটা অদ্ভুত আধো-অপ্রতিভ আধো-চতুর হাসি ওঁর মুখে লেগেই থাকে। বরং বলা চলে মুখ-খানা ঐ ভঙ্গিতেই বেঁকে গেছে। কণ্ঠস্বরও কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি তোষামোদের সুরে বাজে সর্বদা—সে রকম কথা যদি আপনারা কারুর মুখে শুনে থাকেন ত ঠিক বুঝবেন—শুনলেই বুদ্ধিমান লোকে বুঝতে পারে যে মিছে কথা বলছে, অথচ যার তোষামোদ করা হয় সে মিছে জেনেও খুশী হয়। মুখে ঐ হাসি এবং ঘন কুঞ্চিত ভ্রূর মধ্যে দিয়ে কোটরাগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ চাহনি—সে অপূর্ব সমন্বয় দেখলে মানুষটিকে ভোলা কঠিন।

নরেন ঠাকুর এ ফার্মে ঢোকেন উনিশ বছর বয়সে কর্তার আমলে। বিল

আদায়কারী গোমস্তা, এই ছিল ওঁর সেদিন পদবী। তখন কারবার ছিল একটিই—চালের আড়ৎ। টালিগঞ্জের কলটাও কেনা হয় নি তখন পর্যন্ত। সুতরাং একটি গোমস্তাই যথেষ্ট। নরেন ঠাকুরের আসল নাম হ'ল নরেন চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ ব'লে ঠাকুর উপাধিতেই তিনি পরিচিত।* ছোটরা ডাকত ঠাকুর মশাই, ঝি-চাকররা ঠাকুর-দা—আর বড়রা শুধু ঠাকুর। সেকালে অব্রাহ্মণ বাড়ীতে ব্রাহ্মণ কর্মচারীদের এই ভাবেই সম্মান দেখানো হ'ত।

সে আজ ছত্রিশ বছর আগের কথা।

তখন বয়স ছিল উনিশ, এখন পঞ্চান্ন। এখন তর্জনীতে অষ্টধাতুর আংটি উঠেছে—অনামিকায় পলা ও তামার। পূজার্চনাও করেন কিছু কিছু শোনা যায়—দীক্ষাও নাকি হয়েছে। কিন্তু সে সব কখন করেন তা কেউ জানে না। কারণ ভোর বেলা উঠেই পথে গঙ্গাস্নান সেরে এঁদের পোস্তার বাড়ীতে এসে ওঠেন—তিন কর্তার কাছে হাজরে দিয়ে, বাড়ির হিসাব-পত্রের কাজ সেরে ভাত খেতেই এগারোটা বেজে যায়, তারপর 'অফিসে' বেরোন। কখনও রামকৃষ্ণপুর, কখনও বড়বাজার, কখনও দয়েহাটা। তপিল ধরে হিসেব চুকিয়ে ছুটি মেলে কোনদিন রাত সাড়ে নটা, কোনদিন দশটা। বাড়ির লোকে কেউ মুখ দেখতে পায় না—রবিবার ছাড়া। রবিবারেও কর্তাদের বাড়ি হাজরে দিতে হয়—সব কাজ সেরে ছুটি মেলে হয়ত কোনদিন বিকেলে, কোনদিন সন্ধ্যায়। তবু এই সন্ধ্যাগুলোই তাঁর পরিবারের জন্য তোলা থাকে। বাজার হাট করেন—ঘরের অন্য কাজ, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, বিবাহ অন্নপ্রাশন যা কিছু, এই সময়ই তাঁর চিন্তা করারও সময়। অর্থাৎ মনটা সপ্তাহে এই বিশেষ একটি দিনের কয়েক ঘণ্টা মাত্র ফেরে নিজের সংসার ও ব্যক্তির দিকে।

কী কাজ করেন এঁদের ?

কি না করেন! কর্তাদের কিছু কিছু তেজারতি আছে, আছে কিছু কিছু গোপন লেন-দেন, নিজস্ব ব্যবসায়। তার একটা হিসাব আছে। সে হিসাব নরেন ঠাকুর ছাড়া কাউকে বিশ্বাস ক'রে দেওয়া যায় না। তিনি তিন কর্তার কাছেই সময়-মত বাকি দু-জনের নামে প্রচুর নিন্দা করেন এবং অনেক 'গোপন সংবাদ' দেন—কিন্তু টাকাকড়ির কথাটা বলেন না। কারণ জানেন এটা ওঁদের আঁতের জিনিস। আঁতে ঘা দিতে নেই। সেই গুণেই এখানে এই দীর্ঘকাল টিকে আছেন নরেন ঠাকুর।

এ ছাড়া আছে ইন্‌কাম ট্যাক্স্ ফাঁকি দেবার জন্য নানা রকম হিসেবের মার-

প্যাঁচ্। তার জন্য অবশ্য ফার্মের আও জন-দুই প্রাচীন কর্মচারী আছেন, যাঁরা বাড়ির একটি বিশেষ দোতলার ঘরে সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত খাতার ওপর ঘাড় গুঁজে বসে থাকেন—কিন্তু নরেন ঠাকুর ছাড়া তাঁরাও অচল। নরেনই তাঁদের নির্দেশ দেন, কাজ বুঝিয়ে দেন এবং বুঝে নেন্। সরকারী দলিলপত্র নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন। বিশ্বাস এঁরা কাউকেই করেন না—নরেন ঠাকুর ছাড়া। নরেন ঠাকুরকে করেন এই জন্য যে, তাঁরা বোকা নন্। কর্তারা জানেন যে এ বাড়িটি নরেন ঠাকুরের কামধেনু, এখান থেকে বিবিধ এবং নিয়মিত উপার্জন তাঁর। সে উপার্জনের পথ নরেন ঠাকুর স্বেচ্ছায় নষ্ট করবেন না। একজনকে দোহন করবার সুযোগ দিয়ে চতুর ব্যবসায়ীরা অপরের দোহন করবার পথ বন্ধ করেন।

এ ছাড়া আছে বাজার-সরকারী। বিভিন্ন পূজা, ক্রিয়াকলাপের বাজার—এসব ত আছেই। তাছাড়া তিন সংসারের মাসকাবারী, কাপড় জামা জুতো খোকাবাবুদের, বৌমাদের গোপন ফরমাস এবং গৃহিনীদের অলঙ্কার—নরেনবাবু ছাড়া অচল। মেয়েদেরও কিছু কিছু টাকা খাটে—সুদে ও ব্যবসায়ে; সে সবেরও বাহন নরেনবাবু। খোকাবাবুদের ফরমাসী জিনিস কিন্তে হবে, সে টাকা কী অছিলায় কর্তাদের না জানিয়ে হিসেবের গোঁজামিলে বার করতে হবে তা নরেন ঠাকুর ছাড়া কেউ জানে না। এমন কি দু-একজন ইতিমধ্যে কিছু কিছু উড়তে শুরু করেছেন—সে খরচ ও সুযোগ সুবিধা, তাও জুগিয়ে যাচ্ছেন নরেন ঠাকুর। তা ছাড়া বিয়ে থেকে শ্রাদ্ধ—এসব ব্যাপারের মূলাধার উনি। রেশনকে ফাঁকি দিয়ে কেমন করে আটা চিনি সংগ্রহ করতে হবে, কোথা থেকে বেসন আসবে, কোথা থেকে ঘি ও ক্ষীর, কোন্ হালুইকর কোন্টা ভাল করে, খাওয়ানোর পর পাতা গ্লাস কোন্ কোন্ ডাষ্টবিনে ভাগ ক'রে ফেলে আস্তে হবে,—যাতে এনফোর্সমেণ্টের লোকরা না ধরতে পারে এসব নরেন ঠাকুরের নখদর্পণে। সে সময় কদিন রাত্রের নিদ্রাও ত্যাগ করেন উনি। প্রথমে ভিয়ান, পরে ভাঁড়ার আগ্লে বসে থাকেন যক্ষের মত। সব কাজ সেরে অবশিষ্ট মিষ্টি গুছিয়ে নিয়ে পথে ময়রার দোকানে কিছু কিছু বিক্রী ক'রে তিনদিন কি চারদিন পরে বাড়ি ফেরেন।

বলা বাহুল্য—এ সব-ব্যাপারেই ওঁর কিছু কিছু 'থাকে'। কীভাবে কতটা আসে—ঠিক কোন্ পথে—তা বলতে পারব না। তবে ইতিমধ্যে উনি গোপনে কল্‌কাতাতে একটি বাড়ি কিনেছেন পুত্রবধূর নামে, দেশে স্ত্রীর নামে প্রায় তিন শ' বিঘে জমি। এছাড়া সেখানেও দালান কোঠা উঠেছে। গহনা ও কোম্পানীর

কাগজ স্ত্রীকে কিছু কিছু ক'রে দিয়েছেন। শুধু স্ত্রী যখন মধ্যে মধ্যে অনুযোগ করেন যে, 'ভূতের মত ত খেটেই যাচ্ছ চিরকাল। এত যে করছ, ভোগ করবে কবে? বয়স কি কমছে?' মৃদু হেসে বলেন, 'করব, করব—দাঁড়াও। আর একটু গুছিয়ে নিই, তারপর সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে এসে বসব।'

কিন্তু ছাড়া আর হয় না। সহস্রমুখী আয়ের এ পথ তিনি ভরসা ক'রে ছাড়তে পারেন না।

অথচ বেশভূষা চিরকাল সমান। গরমের দিনে একটি ছেঁড়া আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবী, তার ওপর আরও ময়লা একটা উড়ুনি। আর শীতের দিনে ময়লা (কোনকালে সাদাই ছিল) জিনের কোট, ভেতরে একটি সোয়েটার এবং বাইরে খান-তিনেক গায়ের কাপড় আর পায়ে চটি জুতা—এই বেশ দেখে আসছি আমরা চিরকাল। প্রতি বৎসরই তিন কর্তার কাছ থেকে তিনখানা করে গায়ের কাপড় আদায় করেন উনি, দু একদিন পরে গোপনে বিক্রী ক'রে দেন। তারপর শুরু হয় পুরোনো গায়ের কাপড় একখানা গায়ে দিয়ে বেড়ানো কিন্তু ঘটনাটা বার বার ধরা পড়ে যাওয়ায় এখন আর সদ্য সদ্য বেচতে পারেন না এবং তিনখানাই একসঙ্গে গায়ে দিয়ে বেড়াতে হয়। নইলে পাওনাটা বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ'ছাড়া গৃহিনীদের ও বধূমাতাদের কাছ থেকে ত আছেই। একবছর সাতখানা গায়ের কাপড়, তিনটে গরম জামা ও এগারটি ছাতি আদায় হয়েছিল এই বাড়ি থেকেই। তাছাড়া বার-ব্রতে ব্রাহ্মণ বিদায় ত লেগেই আছে। সেখানেও উনি প্রথম ও প্রধান ব্রাহ্মণ। জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির পরের দিন অন্তত তিন জায়গায় পারণ করতে হবে—তাতে অসুখই হোক্ আর যাই হোক্।

অফিসেও ওঁর হাজার রকমের কাজ থাকে। কোথায় কাকে তাগাদায় পাঠাতে হবে, কোন্ কোন্ খদ্দেরকে বিশেষ তাগাদা দেওয়া দরকার, কাদের ওপর নজর রাখা উচিত—সেল্‌স্ ট্যাক্সের দিন কবে; ইন্‌কাম ট্যাক্সের খাতা তৈরী হ'ল কি না—মাল কোন্ কোন্ গুদামে ভাগ ক'রে রাখলে ধরা পড়বার ভয় নেই, এসব নরেন ঠাকুরই ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করেন। ফলে কোন এক জায়গাতেই তাঁর বসা হয় না। বিশেষ ক'রে যে সব মাল 'ব্ল্যাক্' করা হয় তার হিসাব এবং টাকাকড়ি জমা-খরচ—নরেন ঠাকুর ছাড়া আর কেউ জানেন না, করেনও না। সে জন্য চরকীর মত তাঁকে ঘুরতে হয়—এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিচিত্র হিসাবে তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূর দু'পাশের চামড়া আরও কুঁচকে যেতে থাকে দিন দিন।

যাই হোক্ এতদিন তিনমুখে তোষামোদ ও ছয় হাতে উপার্জন ক'রে একরকম বেশ চলছিল কিন্তু আর বুঝি চলে না। কর্তাদের খুশী করার অমোঘ মন্ত্রটি নরেন ঠাকুর আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিলেন—সেটা হ'ল একজন ভাইয়ের কাছে বাকী দুজন ভাই যে কিছুই কচ্ছেন না, অথচ লাভের ভাগটা সমান নিচ্ছেন এইটে প্রতিপন্ন করা। এতে যেমন আত্মতৃপ্তি এবং আত্মসান্ত্বনা লাভ করতেন এঁরা—এমন কিছুতে নয়।

ধরুন সকালে বেলা সাতটার সময় নরেন ঠাকুর হয়ত বড়বাবুর ঘরে তাঁর ঈষৎ টানা টানা এবং নাকি সুরে বলে এসেছেন, 'আমি ত তাই বল্‌ছিলুম মেজ বাবুকে যে, কর্তাবাবু যখন মারা গেলেন তখন আপনাদের আর কত বয়স—আপনার তেরো, সেজবাবুর দশ আর ছোটবাবুর নয়—বড়বাবুইত ধরুন কারবারটাকে এমনভাবে দাঁড় করালেন। দেহের একপিট রুইকে আর এক পিট ভুঁইকে দিয়ে দিনরাত খেটেছেন—কোনদিন নিজের আরামের দিকে ত চান্‌নি—এখন উনি যদি একটু আপনাদের বকাবকি করেনই—'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে যান নরেন ঠাকুর।

বড়বাবু ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই বলেন হয়ত, 'তারপর? কী বল্লেন মেজবাবু? কথাটা পছন্দ হ'ল না বুঝি?'

নরেনবাবু আরও অপ্রতিভ হাসি হেসে বলেন, 'সে কথা আর শুনে কাজ নেই, হাজার হোক্ আমি ত ওঁদেরও কর্মচারী!'

আরও পেড়াপীড়িতে বলেন, 'ওঁরা বলেন যে সে সময় উনি যদি একটু বেশি খেটে থাকেন ত সে তাঁর কর্তব্যই করেছেন, তাই বলে কি এখনও উনি কর্তা হয়ে থাকবেন? আর আমি ত পনেরো বছর বয়স থেকেই লেগেছি, সেজ ভাই ত আরও কম বয়সে। লেখাপড়া ছেড়ে ত এই নিয়েই পড়েছিলুম, বড়বাবু একা আর কি করতে পারতেন '

'হুঁ!' রেগে আগুন হয়ে উঠে বড়বাবু তখন ফর্দ দিতে থাকেন যে কী কী উপায়ে তিনি ইচ্ছে করলে অন্য ভাইদের ফাঁকি দিয়ে পথে বসাতে পারতেন অথচ তা করেন নি—ভাইদের জন্য স্বার্থত্যাগই করেছেন।

এরপরই, নরেন ঠাকুর মেজবাবুর ঘরে পৌঁছে, সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে, মেজবাবুর কোন একটা মন্তব্যে সায় দিয়ে হয়ত বললেন, 'তাইত, আমিও তাই বলি—খাটুনি ত আপনারা কেউ কম খাটেন নি—ছেলেবেলা থেকেই সমানে খেটে আসছেন। তবু ত আপনাদের ভাল বলতে হবে আপনারা বড়বাবুকে

বাপের মতই মান্য করে চলেন! ওঁরও ত সেটা বিবেচনা করা উচিত।···আমি এ সব বলতে গেলে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন—'

'তাই নাকি? তাই নাকি? কি বল্লেন কি? আজ কোন কথা হ'ল নাকি?'

'না, না—সে কথা এখন থাক্ মেজবাবু, ওসব কথায় আর না—'

এই ভাবেই চলছিল। জলের ছলছলানিতে পাথরের সিঁড়িরও ক্ষয় হয়—এঁদের মনে যে ক্ষয় ধরবে তার আর আশ্চর্য কি? এই দূরদৃষ্টিটাই নরেন ঠাকুরের ছিল না। ক্রমশ এমন বেধে উঠল যে আর পৃথক না হয়ে উপায় রইল না। বিশেষত এম্নি বিষক্রিয়া অন্দর মহলেও সমানে চলছিল পাল্লা দিয়ে—সেখানের হলাহল আরও উগ্র।

তাছাড়া শুধু কর্তৃত্বই নয়—স্বার্থের প্রশ্নও উঠল বৈ কি! যতদিন কালো-বাজারের সুবিধা ছিলনা তখন সংশয় ছিল দু'চার হাজারের হিসাব নিয়ে। এখন কালোবাজারের লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের হিসাব নিয়ে তিন ভাইয়ের মনেই অবিশ্বাস এবং সংশয় মাথা তুলে দাঁড়াল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না।···শেষে পর পর কয়েকটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনার পর স্থির হ'ল তিন ভাই তাঁদের বিষয় এবং ব্যবসায় পৃথক্ ক'রে নেবেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীরও যা কিছু প্রাপ্য (অবশ্য যতটা সম্ভব ফাঁকি দেবার পর যা প্রাপ্য ব'লে স্থির হয়) তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তবে সেটা নগদে—কারবারের ঝঞ্ঝাট আর থাকবে না।

এইবার নরেন ঠাকুর চোখে অন্ধকার দেখলেন। এতটার জন্য ঠিক তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ এবার যাকে হোক একজনকে বেছে নিতে হবে। অন্তত মনিবরা তাই চান। তাঁরা সকলেই চান নরেন ঠাকুরকে, আর তা চান ব'লেই শত্রুর সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে রাজী নন। এবার নরেন ঠাকুরকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিতে হবে—তিনজনের মধ্যে কার ওপর তাঁর টান বেশি।

আকাশ পাতাল ভাবেন ঠাকুর। ভেবে কুলকিনারা পান না। ক্ষীণ চেষ্টা করেন ব্যাপারটা মিটিয়ে দেবার জন্য কিন্তু সেটা আর সহজ হয় না। বহুদিনের মৃদু বিষ দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, এখন সামান্য ঝাড়-ফুঁকে সে বিষ নামানো সম্ভব নয়। প্রবল বন্যায় বালির বাঁধ দেবার মতই তাঁর সে চেষ্টা নিজের কাছেই হাস্যাস্পদ বলে ঠেকে।

না, আর সম্ভব নয়। শুধু ভাইয়ে ভাইয়ে নয়—তাঁদের স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যা-জামাতার মধ্যেও এই বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে; মুহূর্তে মুহূর্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে উঠছে—দাবানল জ্বলল ব'লে।

অতএব তিনটি কপিলা গাইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।

কাকে নেবেন? বড়বাবুকে?

বড়বাবুর হাত দরাজ কিন্তু মেজাজ কড়া। তা তিনি নিজেও স্বীকার করেন, বলেন, 'এক অক্ষরও বিদ্যে নেই পেটে—ভদ্রভাষা বেরোবে কোথা দিয়ে? ছেলেবেলা থেকে সমানে খেটেছি কুলীদের সঙ্গে। দু-মনি চালের বস্তা মাথায় করতে হয়েছে কতবার, করগেটের বাণ্ডিল মাথায় ক'রে গুদোমে তুলেছি। তৈরী আসনে ত পাছা দিতে আসিনি বাবুদের মত—মিষ্টিকথা মিছরির ছুরি ওসব আমার কাছে পাবেনা। সাফ্ বলে দিচ্ছি বাবা!'

তাছাড়া বড়বাবুর ছেলেগুলি ভাল না। বড্ড বেশি দেমাকে। বড় ছেলে আবার সম্প্রতি নতুন কোন ব্যবসায়ে নামা যায় কিনা তাই দেখতে বিলেত আমেরিকা গিয়েছিল (দেখা ত ছাই—বাপের পয়সায় নবাবী করে এল! ঠাকুর বলেন মনে মনে)—তার দেমাকে রতনবাবুর ত পা পড়েই না মাটিতে, অন্য ছেলেগুলোরও মিলিটারী মেজাজ। উহুঁ! চলবে না। নরেন ঠাকুর আপন মনেই ঘাড় নাড়েন।

রাত্রিবেলা পথ চলতে চলতে ছাড়া এসব কথা ভাববার তাঁর ফুরসুত কৈ?

সেজবাবু রাম কিপ্পন। হাত দিয়ে ছুঁচ গলে না। বড়বাবু যে সব (কল্পিত) দায়ে একশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন সে সব দায়ে সেজবাবুর হাত দিয়ে কুড়ি টাকার বেশি বেরোয়নি। বড়বাবু যদি চল্লিশ টাকার গায়ের কাপড় দেন ত সেজবাবু দেবেন চোদ্দ টাকার। অবিশ্যি কথাগুলো মিষ্টি বটে সেজবাবুর—ছেলেগুলোও ভাল, ভদ্র, অমায়িক—কিন্তু আখের দেখতে হবে ত!

বাকী থাকে মেজবাবু। মেজবাবুও একটু কৃপণ এবং বড়বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত! যত প্রতিশ্রুতি দেন তার সিকিও বেরোয় না শেষ পর্যন্ত হাত দিয়ে। তাছাড়া মেজবাবুর ছেলেগুলিও বড্ড হুঁশিয়ার, এখনই সব শিখে নিতে চায় ব্যাবসা। খোদার ওপর খোদ্‌কারী করার ইচ্ছা। একটু বোধহয় অহঙ্কারীও বেশি এরা—

কিন্তু তাহলে কি হয়—মেজ-মা মাটির মানুষ। যত গাঁজাখুরী আষাঢ়ে গল্পই নরেন ঠাকুর করুন না কেন মেজমা ঠিক বিশ্বাস করেন এবং গোপনে ওঁকে টাকা বার ক'রে দেন। কতবার এমন হয়েছে বন্ধকী-এলেদেওয়া খুচ-খাচ সোনার জিনিসও বার করে দিয়েছেন—ঠাকুর মশাই এই জিনিসটা বেচে নিও যা হয়। সে-বার বড় মেয়ের বিয়ের সময় নরেন ঠাকুর যখন কেঁদে পড়লেন (কোন দরকার

ছিল না—বলা বাহুল্য) মেজবাবু দিলেন একশ টাকা, বড়বাবু বরাভরণ সব গড়িয়ে দিলেন, সেজবাবু অতিকষ্টে চল্লিশটি টাকা বার করলেন—অথচ মেজমা গোপনে তিনভরি সোনা বার করে দিলেন, তাতেই মেয়ের গলার হার হয়ে গেল। অন্য অন্য মেয়েরাও কিছু কিছু দিয়েছিল কিন্তু মেজমার মত কেউ না। তারপর নমস্কারীর সব কখানা কাপড় নিজের আলমারী থেকেই বার ক'রে দিলেন। কতকাল থেকে এই সব নতুন শাড়ী জমেছিল তা কেউ জানেনা—আটখানা কাপড়ই মেজমা একা দিলেন।

সব ছেড়ে যদি কোন একটা গাছে নৌকো বাঁধতেই হয় ত সবচেয়ে বড় গাছ বেছে নিতে হবে।

মেজমাই নিঃসন্দেহে সেই বড় গাছ। ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখুন, আর চিরকাল এমনি নির্বোধ রাখুন—এমন কামধেনু আর হবে না।

নরেন ঠাকুর নির্জন হৃষিকেশ পার্কে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়েন। মন তিনি স্থির করেছেন। কিন্তু, তবুও—

এই কিন্তুটাই থেকে যায় মনের মধ্যে। অর্থাৎ একজনকে বেছে নিলেও বাকী দুজনকে কিছুতেই ছাড়তে ইচ্ছা করে না।

যতক্ষণ না পুলিশে উঠিয়ে দিলে ততক্ষণ পার্কে বসে রইলেন নরেন ঠাকুর, তারপর বাড়ীতে এসে আহার সেরে হুঁকোটি হাতে করে সদরের চলনে এসে বসলেন—এবং বসেই রইলেন। কলকাতা শহরের ভাড়াটে বাড়ী, নিচের তলাটা তিনি সম্পূর্ণ নিয়ে থাকেন বটে কিন্তু সেটা ত দুখানা ঘরেই শেষ। ভেতরের দিকে উঠানের পাশে সরু সরু ফালি বারান্দা আছে বটে, তবে দোতলা ও তেতালার ভাড়াটেদের সমস্ত আবর্জনা নিচে এই উঠানটাতেই এসে পড়ে; ও বারান্দায় বসা অসম্ভব—দুর্গন্ধে মাথা ধরে ওঠে।

অতএব নরেন ঠাকুরের বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার প্রয়োজন হ'লে এই সঙ্কীর্ণ চলনের সঙ্কীর্ণতর (দশইঞ্চি) ইঁট বাঁধানো বেঞ্চিতে এসে আশ্রয় নিতে হয়। আজও এইখানেই এসে বসলেন নরেন ঠাকুর। কল্‌কে নিভে গেল শিগ্‌গিরই কিন্তু নরেন ঠাকুর উঠলেন না, হুঁকোটা নামিয়ে রাখার কথাও মনে রইল না। সেই ভাবেই বসে কাটিয়ে দিলেন সমস্ত রাত। একেবারে চমক ভাঙ্গল যখন গিরি ঝি এসে ওঁকে দেখে চম্‌কে উঠে বললে, 'ওমা ঠাকুর মশাই, আমি বলি কে। ভয় পেয়ে গিছ্‌নু।'

নরেন ঠাকুর উঠে কোন কথা না বলেই গামছা নিয়ে গঙ্গার দিকে হাঁটা দিলেন।

গৌতম ততক্ষণে বুদ্ধ হয়ে গেছেন। সারারাত্রি সেই চন্দন-রূপ বোধিদ্রুমের নিচে বসে তপস্যা তাঁর ব্যর্থ হয়নি।

বড়বাবু সবে পূজো সেরে দুধের কাপ মুখে তুলেছেন, নরেন ঠাকুর এসে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন।

'এসো ঠাকুর, কী ঠিক করলে?'

'মেজবাবুর লোহার দোকানই ভরসা করলুম।'

ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গিয়েছিল যে বড়বাবু কাপড়, মেজবাবু লোহা এবং সেজবাবু রামকৃষ্ণপুরের ডাল-মশলার আড়ৎ নেবেন। রেশনের ফলে চালের কারবার মন্দা পড়ায়, ওখানেই ওঁরা ডাল মশলার গুদাম করেছিলেন। বড়বাবু ইতিমধ্যেই কাপড়ের কল এবং সেজবাবু চালের কল কিনে ফেলেছেন—একথাও শোনা যাচ্ছে শুধু বাকী এঁদের কলকাতার আটাত্তর থানা ভাড়াটে বাড়ি ভাগ করা—সেজন্য য়্যাটর্নীরা এরই মধ্যে পয়সা খেতে শুরু করেছেন।

নরেন ঠাকুরের কথাটা শুনেই বড়বাবুর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠ্ল। কিন্তু নরেন ঠাকুর আজ নির্ভয়—তিনি প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

'ঐত বড়বাবু—এখনও নরেন ঠাকুরকে চিন্‌লেন না। আপনিই আগে চোর বলে বসে রইলেন, তবে চুরি করতে যাচ্ছি কার জন্যে?'

'কী রকম, কী রকম? খুলে বলো বাপু—'

'আপনার যা কাজ তা আমি ক'রে দিয়ে যাবো রাত দশটা হোক্ এগারটা হোক্—যখন হোক্ এসে। সে কাকে-বকেও টের পাবে না...তার জন্য আমার কিছু চাইনা। আপনার নিমক বিস্তর খেয়েছি বড়বাবু—আপনার পয়সাতেই দেহটা টিকে আছে। আপনার অনিষ্ট কেউ না করে সেটা ত দেখতে হবে!'

'সে আবার কি? সেই জন্যে মেজবাবুর চাক্‌রী নিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক সেই জন্যেই। ওধারে যে কি হচ্ছে তা ত খবর রাখেন না। আমি যদি না থাকি ত কে চোখ রাখবে মেজবাবুর ওপর? আমিই ত আপনার চোখ বাবু, সব পরিষ্কার দেখ্‌তে পাবেন।'

'কি হচ্ছে, কি হচ্ছে, শুনি?'

'আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। যখন হাতে কলমে মিলিয়ে দেব তখন এর উত্তর পাবেন। এখন আপনার কাজ বজায় ক'রে গেলেই ত হ'ল।

আপনার প্রাইভেট হিসেব আর কাউকে দিয়ে হবেনা, সে আমি জানি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।'

"সেথা হ'তে ফিরি চলে গেল ধিরি''—বধূ অমিতার ঘরে নয়—সেজবাবুর ঘরে।

সেজবাবু ভ্রূকুটি করেই বসেছিলেন, 'কী খবর ঠাকুর? সময় হ'ল আসবার? বড়বাবু ছুটি দিলে?'

নরেন ঠাকুর স্বভাবোচিত হাসি হেসে বললেন, 'ইরি মধ্যে কি? দাঁড়ান আপনাকে আগে পথে বসাই! তবে ত! আমি ত মেজবাবুর চাকরি নিয়েছি।'

'তাই নাকি! বেশ, বেশ! ভালই ত।' সেজবাবুর মুখও থমথমে হয়ে উঠল।

'ঐ ত! দেখুন সেজবাবু, পয়সা আপনার কাছ থেকে বেশি খাইনি, এটা ঠিক—তার চেয়ে ঢের বেশি পয়সা বড়বাবুর মেজবাবুর খেয়েছি। কিন্তু মিষ্টি ব্যবহার ত আর কারুর কাছে পাইনি। মানুষ সব ভোলে—ভোলেনা মিষ্ট আহার আর মিষ্ট বাক্য। কথাই থেকে যায় সেজবাবু, আর কিছু থাকেনা। আপনি নিরীহ লোক—ওধারে বড়বাবু মেজবাবুর ত মুখে ঝগড়া কিন্তু আপনার সর্বনাশ করার সময় ত দুজনে এককাঠ্ঠা, তা জানেন কি?'

'সে আবার কি?'

'তবে আর বলছি কি? সেই জন্যেই ত মেজবাবুর চাকরী নিলুম। সব খবর নিতে পারব, ওদিকে চোখটা খোলা থাক্‌বে। অথচ আপনার যা কাজ, প্রাইভেট খাতা সে আবার আমি ছাড়া কে করবে। যারই চাক্‌রী করিনা কেন—সে কাজ ঠিক তুলে দিয়ে যাব।'

'ব্যস! ওরা জানতে পারলে গুড় মাখিয়ে গা চাটবে তোমায়!'

'সেকি কেউ টের পাবে ভেবেছেন? জনমানব কেউ জানতে পারবেনা। সে আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন।'

মেজবাবুর ঘরে সর্বশেষ পৌঁছলেন ঠাকুর। টিকি থেকে প্রসাদী ফুল নিয়ে মেজমার হাতে দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'মাগো, তোমারই ভরসা!'

'কি ঠিক করলে ঠাকুর?' চশমার মধ্য দিয়ে বাঁকা চেয়ে প্রশ্ন করেন মেজবাবু।

'মেজমাকে ছেড়ে কোথা যাবো বলুন। সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী মা আমার! মা আমার অন্নপূর্ণা।'

'আমি বললুম!' মেজমা বলেন, 'নরেন আমায় আন্ত্রিক (আন্তরিক?) ভালবাসে!'

গুরুমা

পরাশর বাবুরা আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া এসেছেন মাত্র ছ'মাস। কিন্তু এরই মধ্যে 'মা' বা 'মাঠাক্‌রুণে'র মহিমা শুন্‌তে শুন্‌তে প্রায় কান ঝালাপালা হয়ে গেল। যদি ভাড়াটে বাড়ী পাওয়া ঈশ্বর দর্শনের মতই অবিশ্বাস্য ঘটনা না হ'ত, তাহলে হয়ত এত দিনে আর একটা বাড়ী দেখে উঠে যেতুম।

অবশ্য ঠিক গুরুমা বলতে যা বোঝায়, ইনি না কি তা নন্। অর্থাৎ গুরুর স্ত্রী নন্—ইনি নিজেই গুরু! নেহাৎ সাদা-সিদে ধরণেরও নন্—রীতিমত গেরুয়াধারিণী সন্ন্যাসিনী।

বিরক্তবোধও যেমন করতুম, কৌতূহলও একটু হ'ত বৈ কি! কথায় কথায় মা।

ফুটফুটে মেয়েটি পরাশর বাবুর, বছর ষোল-সতেরো বয়স, এদিকে খুব ঠাণ্ডা, ঘর-কন্নায় মন আছে, ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ছে! মানে ক্লাস টেন্ আজকালকার। বিনা মাষ্টারেই পড়ে গত বছর ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়েছে। এক কথায় বেশ মেয়েটি। শালার জন্য অম্‌নিই একটি মেয়ে খুঁজছিলুম, কিছুদিন দেখে দেখে একদিন প্রস্তাব করেই বসলুম্। শালাও এম-এ পাস, সরকারী চাকরী করছে, পাত্র হিসাবে খুবই লোভনীয়, যে কোন পাত্রীর পিতারই শুনলে চম্‌কে উঠবার কথা।

কিন্তু পরাশরবাবু বিনীত অথচ উদাসীন ভাবে বললেন, 'এ ত আমার সৌভাগ্য রমেনবাবু, কিন্তু মা না এলে ত কিছু হবার জো নেই!'

'কথাবার্ত্তা না হয় তিনি এলে হবে। আগে আপনারা ছেলে দেখুন, বিয়ে দেবেন কি না সেটা ভাবুন—দেনা-পাওনা।'

'কিছুই হ'তে পারবে না। যা করবেন তিনিই করবেন। ছেলে দেখতে হয় তিনি দেখবেন, বিয়ে দেবেন কি না তাও তিনি জানেন। আমি কিছুই বলতে পারব না।' সহাস্যে উজ্জ্বল চোখ দু'টি মেলে চাইলেন পরাশরবাবু, পরিপূর্ণ প্রসন্নতা মুখে-চোখে।

হঠাৎ মুখে এসে গেল, 'দৈনিক খাওয়া-দাওয়াটা কি তাঁর নির্দ্দেশে করেন পরাশরবাবু? আর ছেলে-মেয়ের অসুখ হলে কি হয়? অনুমতি নিয়ে ডাক্তার দেখান?'

পরাশরবাবু কিন্তু একটুও ক্ষুণ্ণ হলেন না। হেসে বললেন, 'প্রায় তাই। তবে মোটামুটি এসব ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ নেওয়াই আছে। আর ভারি অসুখ করলে ত তাকে জানাতেও হয় না—তিনি নিজেই এসে পড়েন। তার পর যা করবার তিনিই—'

'নিজেই এসে পড়েন? যোগবলে না কি?' কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের সুরটা চাপতে পারলুম না।

'তা জানি নে। কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। তবে এসেও পড়েন ঠিক। সেবার বকুলের টাইফয়েডের সময় তিন দিনের দিনই এসে পড়লেন। তখন আমরা জানি সামান্য জ্বর। উনি এসেই বললেন, করছ কি, এ যে টাইফয়েড—দুধ বন্ধ করো। আট দিনের দিন রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারও বললে, তাই। টাইফয়েড।…তারপর পুতুলের যেবার রক্ত-আমাশা হ'ল—আমরা জানিও না মা কোথা—উনি নিজেই এলেন, কী সব ওষুধ দিলেন, মেয়ে দিব্যি সেরে উঠল।… কাজেই অসুখ-বিসুখ নিয়েও আর মাথা ঘামাই না আমরা।'

কথাটা যে ঠিক বিশ্বাস হ'ল না তা বলাই বাহুল্য। তবুও মুখে ভক্তি ও বিস্ময়ের ভাব টেনে আন্‌তে হ'ল। তাঁর বলা শেষ হ'লে যখন বেশ গর্বিত-স্মিত মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তখন বললুম, 'তাহ'লে অবিশ্যি কথাই নেই। কিন্তু মাঠাকরুণ যদি না থাকতেন কি তিনিই আপনার ওপর বিচারের ভার দিতেন তা'হলে এ পাত্র পছন্দ হ'ত ত?'

'ও রকম ভাবে কখনই ভাবিনি রমেন বাবু। মা না এলে আমি কিছু বোধ হয় ভাবতেও পারব না। এই দেখুন না, আর একটি সম্বন্ধ এসেছে বর্ধমান থেকে, তাঁদের খুব ইচ্ছা, পাত্রের বাবা আমার অফিসেই কাজ করেন, সে ছেলেও এম-এ পাস, কী একটা খুব বড় চাকরী করে, এখনই বুঝি ছ'শ' টাকা মাইনে—না কি অমনি বললেন, শুনিওনি ভাল ক'রে—মা না এলে ত শুনে লাভ নেই। বুঝলেন না?'

খুবই বুঝলুম। বুঝলুম যে এ পাত্রী আমার শালার অদৃষ্টে জুটবে না। যাক্—তবু মা'র সম্বন্ধে কৌতূহলটা যেন বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশঃ। বললুম, 'তা মা কবে আসবেন কিছু জানেন? কিছু লিখেছেন তাঁকে?'

নিশ্চিন্ত পরাশর বাবু বললেন, 'কী করে লিখব। কোথায় আছেন তিনি তা ত জানি না। কোথাও ত বাঁধা ঠিকানা নেই। আজ এখানে কাল ওখানে

ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শেষ শুনেছিলুম ভাগলপুরে গিছলেন—সে-ও ত মাস-খানেকের কথা।'

'তবে? তিনি আসবেন কি না কি ক'রে জানবেন?'

'দরকার মনে করলেই তিনি আসবেন। যদি না আসেন ত বুঝব—এখন দরকার নেই।'

এমন মানুষকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। সুতরাং সে চেষ্টা করলুমও না। তবে 'মা'কে দেখবার বাসনা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা চেপে রইল।

কিন্তু তিনি ইচ্ছে না করলে ত হবার যো নেই।

দিন সাতেক পরে সকালে বসে চা খাচ্ছি, গৃহিণী এলেন প্রায় লাফাতে লাফাতে। এমন গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন যে, খানিকটা চা চলকে আমার লুঙ্গিতে পড়ে গেল। কিন্তু এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কোন দিনই তাঁর লক্ষ্য নেই, এইটুকু আসবার উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'ওগো শুনেছ, ওদের সেই মা-ঠাকরুণ এসেছেন!'.

কড়া রকম একটা ধমক দেব বলে মুখ তুলেছিলুম কিন্তু সে কথা আর মনে রইল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'কবে? কখন? কে বললে তোমাকে? কী ক'রে জানলে?'

'এইমাত্র দেখে এলুম—দেখবে এসো না—।'

চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রেই দৌড়লুম। আমাদের শোবার ঘর থেকে ওদের বাড়ীর ভেতরের উঠানটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখি মা-ঠাকরুণ বাইরের রকেই বসে আছেন একটা আসনের ওপর—আর পরাশর বাবুরা সপরিবারে ঘিরে ছেঁকে ধরেছেন। যে রকম ভাবভঙ্গী এঁদের, ইনিই যে সেই অদ্বিতীয়া মা সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় রইল না।

ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলুম। এদের মাথা বাঁচিয়ে দেখা শক্ত তবু একটু অপেক্ষা করতে সবটাই দেখা গেল। নিতান্ত বেঁটে খাটো একরত্তি মানুষটি, গায়ের বর্ণ শ্যাম, চেহারার মধ্যে কোন অসাধারণত্বই নেই। শুধু চোখ দু'টি আয়ত এবং তার দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর। মর্মের মধ্যে পর্যন্ত সে চাহনি পৌঁছয়। কেমন যেন ভয়-ভয় করে সেদিকে চাইলে।

স্বামী-স্ত্রী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মা নিজেই একবার মুখ তুলে চাইলেন,

সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে পরাশর বাবুও আমাকে দেখে হৈ-চৈ ক'রে উঠলেন, 'এই যে রমেন বাবু···আসুন, আসুন, মা এসে গেছেন।'

অগত্যা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে তখনি যেতে হ'ল। অফিসের তখনও ঢের দেরী—সে অজুহাত চলবে না। তাছাড়া এম্‌নিতে ওরা এত ভদ্র—আঘাত দিতেও কষ্ট হয়।

গিয়ে প্রণামও করতে হ'ল। লাল কাপড় পরনে—ঠিক লাল নয়, হয়ত, রক্তাভ-গেরুয়া বলা চলে। কারণ ওরই মধ্যে আরও গাঢ় লাল পাড়টা নজরে পড়ল। হাতে রুদ্রাক্ষের বালা এবং তাগা। সীঁথিতে সিঁদুর নেই, কপালে অহল্যাবাঈ-ধরণে চওড়া রক্তচন্দনের টিকা, তারই ওপর একটু ভস্ম বা বিভূতির চিহ্ন। কোন্ সম্প্রদায়, কেমন সন্ন্যাস, তান্ত্রিক না অন্য কিছু—কিছুই বোঝবার উপায় নেই। সধবা কি বিধবা—কিংবা কুমারী তাই বা কে জানে! পরাশর বাবুকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি, করলেও সদুত্তর পেতুম কি না সন্দেহ, হয়ত শুনতুম, 'তা ত জানি না। জিজ্ঞাসা ত করিনি—'

এসে সদ্য চা-পান শেষ করেছেন। সামনে খালি পাথরের কাপ। তার পাশে রেকাবিতে গোলাপ-জলে-ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা পান।

আমি প্রণাম করতে কোন আশীর্বাদও করলেন না—অন্তত ঠোঁট নড়ল না,- সাধুদের ধরণে চোখ বুজে প্রতি-নমস্কারও করলেন না। বরং সেই মর্মভেদী দৃষ্টি তুলে একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে রেকাবি থেকে একটা পান তুলে মুখে দিলেন।

পরাশর বাবুর একেবারে আহ্লাদে গদগদ অবস্থা। বললেন, 'মা, ইনিই সেই রমেন বাবু, এঁর কথাই আপনাকে বলছিলুম। বলুন না, সেই যা বলছিলেন—'

মা এবার কথা বললেন। মৃদু ধমক্ দিয়ে বললেন, 'ছি পরাশর। ওঁরা হলেন পাত্রপক্ষ। ওঁরা বার বার কথা পাড়বেন কি! একবার দয়া করে বলেছেন—এই ঢের। আমি দুপুর বেলা ওঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে কথা পাড়ব এখন।'

ওঁর এই বিবেচনায় খুশি না হয়ে পারলুম না। এতক্ষণ যে একটা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করছিলুম, সেটা খানিকটা কাটল। বললুম, 'না না—তাতে কি হয়েছে। এ ত আপনা-আপনির মধ্যেই। বকুল মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে। তাই বলেছিলুম আমার শালা প্রদোষের কথা। তা সে ত শুনলুম উনি ঢের ভাল সম্বন্ধ পেয়েছেন অন্য জায়গা থেকে।'

'উহুঁ, উহুঁ—মা সে নাকচ ক'রে দিয়েছেন যে!' সহজ ভাবেই বলেন পরাশর বাবু।

'কেন!' বিস্মিত না হয়ে পারি না, 'সে ত যা শুনেছিলুম খুব ভাল পাত্র! তবে কি সে সব মিছে কথা?'

'না বাবা।' মা-ঠাকরুণ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'মিছে কেন হবে। তাদের আমি জানি। ভাল পাত্র ঠিকই—তবে কি জান বাবা—বড্ড ভাল পাত্র। বৈবাহিক সম্পর্কটা অসমান অবস্থায় করতে নেই। তাতে কোন পক্ষই সুখী হয় না। সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে পরাশরের প্রাণান্ত হবে, অথচ ওর তত্ত্ব-তাবাস তাদের পছন্দ হবে না। তারা নাক তুলবে। আমার ইচ্ছা সমান-সমান ঘরেই করি। অবিশ্যি আমি জানি না আপনার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা কেমন—'

'আমাকে আর আপনি কেন বলছেন মা!'···বিনয় করেই বলি, 'আমার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা চলন-সই। এখানে কালিঘাটে একটু মাথা গোঁজার জায়গা আছে—ছোট দোতালা বাড়ি—তাছাড়া দেশেও কিছু বিষয়-আশয় আছে, গিয়ে বসলে একটা ছোট সংসার চলে যায়। এম-এ পাস, সরকারী অফিসে ঢুকেছে, শ' আড়াই টাকা মাইনে পায়। ওর ছোট ভাইটি নেভিতে ঢুকেছে—তারও প্রসপেক্ট ভাল—'

'এ ত বেশ ভাল সম্বন্ধ বাবা! তোমাদের পক্ষ থেকে মেয়ে পছন্দ করবেন কে?'

'ধরুন, আমি আর আমার স্ত্রী। তা দু'জনেরই আমাদের পছন্দ, কাজেই সে কথা আর উঠবে না। এখন আপনি পছন্দ করলেই কথা এগোতে পারে।'

'তাহ'লে চলো না পরাশর, এক দিন ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওঁর শ্বশুরবাড়ী যাই—'

'বেশ ত, যে দিন বলবেন সেদিনই নিয়ে যাবো। আপনি তাহ'লে মন ঠিক করুন—। আমি আবার আসব এখন। আজ তাহ'লে আসি—আবার অফিস আছে ত?'

'যাও বাবা।···নিশ্চয়—ভাতভিক্ষে আগে।' এবার প্রণাম করতে সস্নেহে তিনি দাড়িতে হাত দিয়ে গুরুজনের মতই স্নেহ হাত মুখে তুলে চুমু খেলেন।

পাত্র মা পছন্দ করলেন। পরাশর বাবু ত নির্বিকার, না কি হ্যাঁ—তাঁর পছন্দ হয়েছে কি না—কিছুই বোঝা গেল না। আমি বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করলুম, তাঁর সেই এক জবাব, 'ও আমি ভেবেও দেখিনি রমেন বাবু, আমি ত পছন্দ করতে যাইনি—সঙ্গে গিয়েছিলুম মাত্র। ভাল-মন্দ আমি বুঝি না, সব ওঁকে ছেড়ে দিয়েছি, উনি যদি ভাল বুঝে থাকেন ত নিশ্চয়ই ভাল।'

'তবু আপনার মেয়ে ত?'

'কিছু না। সব ওঁর। আমি আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সবাই ওঁর সন্তান। আমার কাছে মা আর জগন্মাতা এক হয়ে গেছে রমেন বাবু, সে বিশ্বাস না থাকলে দীক্ষা নিয়ে লাভ নেই।'

যাক্—মা'র যখন পছন্দ হয়েছেই, তখন ওঁকে আর উত্যক্ত ক'রে লাভ কি! প্রশ্ন করলুম, 'তাহ'লে দেনা-পাওনা?'

'সে-ও উনি। কী চান ওঁকেই বলুন।'

'কিন্তু আপনি কি দিতে পারবেন সে-ও কি উনি জানেন?'

'নিশ্চয়ই। এটুকুও জানবেন না?'

তা বটে।

তবে মা'কে কিছু বলতে হ'ল না, মা নিজেই কথা পাড়লেন, 'বাবা, বকুলকে যখন তোমরা দয়া করেছই, তখন আর দেরী ক'রে লাভ কি? তোমাদের ঘরে যাতে ও চলে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই তাড়াতাড়ি ক'রে ফ্যালো—'

অর্থাৎ দেনা-পাওনার কথাটা। যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা পাড়তে হ'ল। কিন্তু এইবার দেখলাম, মা সংসার-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী বটে তবে উদাসিনী নন। দর-দস্তুর বেশ ভালই করতে পারেন—প্রতিটি ব্যাপারে এমন কষাকষি করলেন যে, আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে ক্রমেই তালিকা সঙ্কুচন করতে হ'ল। এমন লোকের ওপর সত্যিই সব ছেড়ে দিয়ে লাভ আছে—এত সাংসারিক বুদ্ধি পরাশর বাবুর নেই, তিনি হ'লে অনেক বেশি দিতে রাজী হয়ে যেতেন। মা-ঠাকরুণের দৃষ্টি শুধু অন্তর্ভেদী নয়—বহুদূরপ্রসারীও বটে।

এক দিন আর থাকতে পারলুম না, ব'লেই ফেললুম। বিয়ের তখন দিন স্থির হয়ে গেছে, দেনা-পাওনা মোটামুটি সব মিটে গেছে, তবে মাঠাকরুণ প্যাঁচ কষছেন দেখে একটু রাগও হয়েছিল বোধ হয়; ঘর থেকে সবাই চলে যেতে বললুম, 'মা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি ত আপনার কারুর চেয়ে কম নয়?'

'কম হবে কেন বাবা—সংসার চিনে দেখে তবে ত ছেড়েছি।'

'কিন্তু এখন ত ছেড়েছেন তবে এ সব কচ্‌কচিতে থাকেন কেন?'

'এদের ত ছাড়তে পারিনি বাবা, এদের কল্যাণের জন্যই এই সবে থাকতে হয়। এরা যে সম্পূর্ণ আমার ওপরই নির্ভর করেছে।'

'তবু—কি রকম লাগে না!'

'কেন লাগবে বাবা! আমি যদি এদের ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে থাকতুম তাহ'লে কি রকম লাগতে পারত।...তুমি ত লেখাপড়া-জানা ছেলে বাবা, পুরাণ নিশ্চয় পড়েছ—সেকালে রাজা-রাজড়ারা যেখানে থাকতেন সঙ্গে পুরোহিত থাকত। পাণ্ডবরা বনে গিয়েছিলেন তাও পুরোহিত সঙ্গে ছিল। তাঁরা অনেকেই গৃহী ছিলেন না বাবা—কিন্তু গৃহীদের চেয়ে ভাল বুঝতেন বলেই গৃহীরা তাঁদের ওপর নির্ভর করত, তাঁরাও গৃহীদের ছাড়তে পারতেন না।'

কথাটার ভাল রকম সদুত্তর দিতে পারি না, তবু কৌতূহল বেড়েই যায়। খোঁচা দেবার লোভটাও থামে না।

প্রশ্ন করলুম, 'এমন ত আপনার অনেক শিষ্য আছে। তাদের সকলকেই ত দেখতে হয়, তবে সাধন-ভজন করেন কখন?'

'সবাই ত পরাশরের মত নির্ভর করে না বাবা। দেখতে হবে কেন? আর সাধন-ভজন?'

এই বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তখন আমরা ঐ দু'টি মাত্র প্রাণী ঘরের মধ্যে। আমার স্ত্রী অন্যত্র ব্যস্ত ছেলে-মেয়েরা খেলতে গেছে। মা আমাদের বাড়িতেই বসে আছেন। সুতরাং খুবই নির্জন চারিদিক। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন করি, 'থামলেন কেন মা?'

'সাধন-ভজন কিছু নেই বাবা। এটা শুধু ভেক্।'

'কী যে বলেন!' আমিও পাল্‌টা বিনয় করি। যদিচ মনে মনে ঐ বিশ্বাসটিই বদ্ধমূল।

'না বাবা। অকারণ মিছে বলব না। এটা ভেকই। এ ভেক না নিয়ে কী-ই বা উপায় ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি, নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই—যার বাড়ি যেতুম গলগ্রহ হয়ে থাক্‌তে হ'ত। ঝিয়ের মত খাটতে হ'ত অথচ ঝিয়ের মাইনেটা পেতুম না। পাছে ঝি ছেড়ে যায় বলে ঝিকেও সমীহ ক'রে চলে আজকাল—সে ভয়ও থাকৃত না আমার সম্বন্ধে। সেই অবস্থায়

দিশাহারা হয়েই গিয়েছিলাম গুরুর কাছে। তিনি এই কাপড় হাতে দিয়ে বললেন, এই তোর রক্ষা-কবচ দিলাম মা, নিরাপদে এবং সুখে থাকতে পারবি। শিউরে উঠে বললুম তাঁকে—কিন্তু বাবা, এ যে লোক-ঠকানো। তিনি বললেন লোক-ঠকানো কেন হবে মা, তুমি রীতিমত দীক্ষা দিও, আমি তোমায় সব শিখিয়ে দিচ্ছি। আর যাদের অন্ন খাবে প্রাণপণে তাদের উপকারের চেষ্টা ক'রো, তাহ'লেই আর কোন ঋণ থাকবে না।···তবু সঙ্কোচের সঙ্গেই বললুম—কিন্তু বাবা, এ ত ছদ্মবেশ? তিনি বললেন—সে ত অল্প-বিস্তর সকলেরই বটে। ভগবানের থিয়েটারে সবাই আমরা এক-একটা মুখোশ পরে নেমেছি। এক-একটা পার্টে সেজেছি বই ত নয়।—এই আমার সত্য পরিচয় বাবা।'

মা থামলেন। আমি ত অভিভূত। বললাম, 'এ সব কথা কি শিষ্যদের বলেছেন?'

'সবাই ত শুনতে চায় না। শুনলেও বিশ্বাস করে না। পরাশরকে বলেছি কিন্তু ও বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে এই সত্যটাই আমার মিথ্যা-মুখোশ।'

আশ্চর্য! যত দিন এঁকে সন্ন্যাসিনী ব'লে জানতুম ততদিন এঁর আচার আচরণ ভেক্, ছদ্মবেশ, লোক-ঠকানো ব্যবসা, এই কথাই ভেবেছি, বা আকারে-ইঙ্গিতে সেই খোঁচা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন ইনি সেইটে স্বীকার করাতে আর বিশ্বাস হ'ল না। এখন মনে হ'ল এটাই ওঁর বিনয়, ওঁর যথার্থ সন্ন্যাসিনী রূপটিকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখতে চান—আমাদের এড়িয়ে পা পিছলে বেরিয়ে যেতে চান।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলি, 'আপনি আমাকে হয়ত পরীক্ষা করছেন। কিন্তু আমি অত বোকা নই।···পরাশর বাবু যে বলেন বিপদের সময় বা প্রয়োজনের সময় ঠিক আপনি এসে হাজির হন, সেটা ত মিছে নয়!'

মা হাসলেন। মধুর হাসি। বললেন, 'ওটা নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ বাবা। এসে পড়েছি দু'বার এই মাত্র। অনেক দেখেছি, তাই দু'চারটে রোগের চেহারা দেখলেই চিনতে পারি। দু'একটা টোট্‌কা ওষুধ জানি—'

'কিন্তু এই যে বকুলের বিয়ের ব্যাপার? পরাশর বাবু বলেছিলেন, সময় হলেই আসবেন। তাই ত এলেন।'

'দূর বোকা ছেলে!···ওর আবার সময় কি? বকুলের কী-ই বা বয়স। দু'বছর পরে বিয়ে দিলেও তোমরা বলতে ঠিক সময়!'

'যখন দু'টো জায়গা থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে তখনই বা আপনি এলেন কী ক'রে?'

'বকুল যা মেয়ে—বহু জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আসত।'

এই বলে আর একটু হেসে তিনি উঠে পড়লেন।

অর্থাৎ মা'র সম্বন্ধে রীতিমত দ্বিধায় পড়লুম। কোন্‌টা মিছে আর কোন্‌টা সত্যি—কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। সেদিন থেকে শ্রদ্ধার ভাবটাই বেড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু যখন দেখলুম পরাশর বাবুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিয়ের বাজার করলেন, বিয়ের দিন সমানে হালুইকরদের পিছনে লেগে রইলেন, শেষ পর্যন্ত নিপুণা গৃহিণীর মত ফুলশয্যার তত্ত্ব গুছিয়ে পাঠিয়ে নিজেও পরাশর বাবুদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন, তখনও সে ভাবটা রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ল। হিসাব-নিকাশ, টাকা-কড়ি সব তাঁর হাতে। মায় বিয়ে চুকলে ম্যারাপওয়ালা ডেকরেটার সকলকার বিল কেটে দাম ঠিক ক'রে দিয়ে তবে তিনি গেলেন। ঘোর বিষয়ী এবং সংসারী। একটু কৃপণও।

আমাদের জানলা থেকে ও-বাড়ীর ঘর দেখা যেত, দেখে দেখে গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'রক্ষে করো, সন্নিসীতে অরুচি! ওর চেয়ে আমরা ঢের বেশি বৈরাগী।'

কথাটায় আমার মনেও তখন সায় জাগত।

হয়ত উনি নিজের সম্বন্ধে সত্যি কথাই বলেছেন। সেইটেই একটা কৌশল। জানেন যে নিজের দোষ আগে থাকতে নিজে স্বীকার করলে লোকে বিনয় ভাবে।

বকুলের বিয়ের মাস-কতক পরে হঠাৎ একটা প্যাঁচে পড়ে গেলাম। ফেল্‌-মারা ব্যাঙ্কের ব্যাপার—আমারই টাকা, অথচ আমি নানা চক্রান্তে চোরের পর্যায়ে পড়ে গিয়েছি। মান সম্ভ্রম সব বুঝি যায়, সেই সঙ্গে গৃহিণীর সবগুলি গহনাও। তাতেও পার পাব কি না সন্দেহ।

কোথাও যখন কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না, গৃহিণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আমারও প্রায় সেই অবস্থা—হঠাৎ শুনলুম ও-বাড়িতে মা এসেছেন।

পরাশর বাবু আমার এই বিপদের খবরটা জানতেন কিন্তু গরীব কেরাণী,

মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত, কোন সাহায্য করবার উপায় ছিল না। মা আসাতে তিনি যেন অকস্মাৎ বল পেলেন, বাড়ী থেকে চেঁচামেচি ক'রে ডাকলেন, 'রমেন বাবু, রমেন বাবু—শীগ্‌গির আসুন—মা এসে গেছেন, আর ভয় নেই।'

মা এসেছেন, ওঁদের মা—আমার কী-ই বা করবেন? তবু যেতে হ'ল—বিরক্তি সহকারেই গেলাম। আমি মরছি নিজের জ্বালায় এমন সময় এই সব পাগলামি কি ভাল লাগে!

যেতেই পরাশর বাবু বললেন, 'কেমন বলিনি মা ঠিক সময় আসেন। বলুন ত কী আপনার ব্যাপারটা? খুলে বলুন—কিছু সঙ্কোচ করবেন না।'

আচ্ছা মুস্কিল ত! এ সব ব্যাপার মেয়েছেলেকে বোঝাই কী ক'রে? আর বুঝেই বা উনি করবেন কি? তবু বলতেই হ'ল। এ রকম কোণঠাসা করলে না বলে উপায় নেই।

যথাসাধ্য সংক্ষেপেই সব বললাম। মা স্থিরভাবে বসে শুনলেন। সামনে সেই প্রথম দিনকার মত খালি পাথরের কাপ আর পানের রেকাবি।

সব শুনে বললেন, 'ভৈরব ব্যাঙ্ক? আচ্ছা, থিয়েটার রোডের সতীশ সেনকে ধরলে কিছু হয়?'

সে কি! চমকে উঠলাম। পুতুল আমাকেও এক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল—সেটা ধাক্কা লেগে পড়ে গেল।

'সতীশ সেনই ত সব মা। ও ইচ্ছে করলে এখনই মিটে যায় ব্যাপারটা।'

'চলো দিকি এখনই একবার যাই। কিছু হয়ত একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে।'

এ স্ত্রীলোকটি বলে কি! সতীশ সেন মহা কড়া লোক। কড়া এবং বদমাইস। সে না কি নিজের বাপকে খাতির করে না। এ সেই হাটে যাবে ছুঁচ বেচতে?

তবু তখন আর আমার অত বিচারের সময় নেই। এক পা জেলে। তখনই একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলুম। মা সেই ধূলো-পায়েই চললেন। বকুলের মা স্নান ক'রে যেতে বলাতে উত্তর দিলেন, 'না, সতীশবাবু শুনেছি সকাল ক'রে বেরিয়ে যায়। ঘুরে আসি আগে—'

আমার মনে তখনও কোন আশা নেই, বরং মনে হচ্ছে যে, এই দুর্দিনে ট্যাক্সী ভাড়াটাই বাজে খরচা। কিন্তু যখন দেখলুম মা বাইরে থেকে কোন

...। না দিয়েই আমাকে সঙ্গে ক'রে দোতলায় উঠে গেলেন তখন একটু বিস্মিতই হলুম। বোধহয় সামান্য একটু ভরসাও হ'ল।

সতীশবাবু তাঁর দোতলায় অফিস-ঘরে বসে কাজ করছিলেন। মাকে দেখে যেন লাফিয়ে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার, মা কতক্ষণ!' উঠে এসেই একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।

মা জাঁকিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন, আমাকেও ইঙ্গিত করলেন পাশে বসতে কিন্তু সতীশবাবু আর চেয়ারে বসলেন না, কার্পেটের ওপর মা'র পায়ের কাছটিতে ঘেঁষে বসলেন।

'এবার কতদিন পরে তোমার দয়া হ'ল বল ত মা।' সতীশ বাবুর কণ্ঠে অভিমানের স্বর।

'বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বাবা। যাক্—সে কথা, তোমার অফিসের সময় আর আট্‌কাব না বেশিক্ষণ। এই ভদ্রলোকের একটা কাজ উদ্ধার করতে পারো কি না দ্যাখো দিকি একবার। বিনা দোষে বড় ঠেকে পড়েছেন।'

'বিনা দোষে না ঠেকলে তুমি সুপারিশ করতে না মা, তা আমি জানি। আর তা না হ'লে তুমি আসতে না। আপনার কী ব্যাপার বলুন ত?'

সংক্ষেপে সব কথা বলতে সতীশবাবু বললেন, 'এই ব্যাপার? আচ্ছা সে হয়ে যাবে।'

কী উপায়ে আমি উদ্ধার পেতে পারি তাও বলে দিলেন এবং একটা দরখাস্ত লিখে আজই অফিসে নিয়ে গেলে তিনি তখনই আমাকে দায়-মুক্ত ক'রে দেবেন এমনও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াতেই মা-ও উঠলেন। সতীশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ভেতরে যাবে না মা? তোমার বৌ যে কান্নাকাটি করবে।'

'সে পাগলীকে তুই বুঝিয়ে বলিস্ বাবা। বর্ধমানের রসময় চাটুজ্জের মেয়ের খুব অসুখ, আজই একবার যেতে হবে। খবর পেলুম আমার ভরসায় একটা ডাক্তার পর্যন্ত দেখায়নি। কী পাগলের পাল্লায় যে পড়েছি সব।...এই এগারটার গাড়ীতেই আমাকে যেতে হবে।'

সতীশবাবু একটু ঈর্ষিত ভাবেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি ত ভাগ্যবান্, আপনার জন্যে মা এত কাজের মধ্যেও কলকাতাতে ছুটে এসেছেন—'

'আবার ঐ সব পাগলামী সতীশ!' মা সস্নেহে তর্জন করলেন।

গাড়ীতে যেতে যেতে আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। হেঁট হয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'মা, কেন যে অত ছলনা করেন। কত কী ভেবেছি আপনার সম্বন্ধে—ছি ছি, সে কথা মনে হ'লে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।...কিন্তু আপনি কি দেখে আমায় এত অনুগ্রহ করলেন?'

'আবার তুমি ঐ সব পাগলামী শুরু করলে বাবা? জ্ঞানবান ছেলে দেখে তোমাকে সত্যি কথাই বলেছি! বাঁকুড়া থেকে আসছি, বর্ধমান যাবো, নেহাৎ স্নানাহারের জন্যই পরাশরের বাড়ি এসেছিলুম, তুমি বিশ্বাস করো, এর ভেতর আমার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটি সত্যের আভাস ছিল যে, আবার সংশয়ে পড়লুম। তবু বললুম, 'কিন্তু এই ত সতীশবাবুও ঐ কথা বললেন, এঁরা সবই বিশ্বাস করেন যে, প্রয়োজন হলেই আপনি আসেন। সবাই কি বোকা?'

'স্রেফ যোগাযোগ বাবা। আমারই ভাগ্য হয়ত এখনও বলবান, নইলে এমনি যোগাযোগ আমার অদৃষ্টে বার বার ঘটবে কেন? কিন্তু এ মিথ্যা সম্মানের বোঝা আমি যে আর বইতে পারছি না! ক্রমশঃই মিথ্যার বোঝা ভারি হয়ে উঠছে।'

মা একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। মনে হ'ল যেন সে চোখে জল ভরে এসেছে—

কিন্তু আর কথার সময় ছিল না। গাড়ী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। মা তখনই স্নান ক'রে নিলেন। হয়ত তখনও কৌতূহল প্রবল, তাই দাঁড়িয়েই রইলুম। কী খান সেটা দেখে তবে যাবো—মনের অগোচরে এই চিন্তাই ছিল খুব সম্ভব। বিশেষ করে যখন শুনেছিলাম যে, উনি ব্রাহ্মণের মেয়ে তবু পরাশর বাবুদের হাতে ভাত পর্যন্ত খান্—তখন ভাল-মন্দ খাবার লোভেই এই সহজ ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন এই ছিল অনুমান।

কিন্তু খেলেন দেখলাম পাখীর মত একগাল ভাত আর একটি কাঁচকলা সিদ্ধ। একটু ঘি ও একটু দুধ। তার সঙ্গে কোন রকম মিষ্টি পর্যন্ত নয়।

'এ কি, হয়ে গেল?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

স্মিত প্রসন্ন মুখে পরাশর বাবু বললেন, 'বারো মাসই উনি এই খান্। আর এই একবার।'

মা হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তপস্যার জন্য নয় বাবা, শরীর ভাল থাকে বলে এম্‌নি কম খাই। বেশি খেয়েই যত অসুখ।'

মা তখনই চলে গেলেন। কিন্তু আমার দ্বিধা আজও কাটল না। কোন্‌টা বিশ্বাস করব—মার কথা, না মার কাজ? অথচ গাড়ীতে সেদিন নিঃসংশয় সত্যের সুরটিই তাঁর কণ্ঠে বেজেছিল। সেই সঙ্গে একটা চাপা বেদনা; পারিপার্শ্বিকের বাঁধা মার খেয়ে নিরুপায়ের কণ্ঠে যে বেদনা বাজে।

আমার স্ত্রী কিন্তু এবার তাঁর পায়ে আছড়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কবে যে তিনি আসবেন তা জানি না—তিন বছর গেছে সেই দিনটির পর। জানবার উপায়ও ত নেই! কাউকে কোন দিনই তিনি ঠিকানা দেন না, কোথায় কখন থাকেন তাও কেউ জানে না।

বাঁদীর মেয়ে

নাসের মিঞা সেদিন মাঠ থেকে সকাল করেই ফিরেছিলেন। ফি শুক্রবারেই তিনি এই সময় ফেরেন—জুম্মার নামাজ পড়তে হয়, মাঠে বড় অসুবিধা। তাছাড়া এই সময়টা পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি নামাজ পড়েন। মাঠে তা সম্ভব নয়। হ'তে পারে আজ তাঁর অবস্থা খারাপ—তা ব'লে তাঁর ঘরের মেয়েছেলেরা মাঠে যাবে নামাজ পড়তে, এ আজও তিনি ভাবতে পারেন না।

নাসের উঠানে এসে ডাকলেন, 'রাবেয়া!'

কোথায় রাবেয়া?

একটু বিস্মিতই হলেন নাসের মিঞা। রাবেয়ার তো কোন দিন সময়ের হিসাব ভুল হয় না। নিয়মের ব্যতিক্রম তার স্বভাবের বাইরে। অন্যদিন সে তাঁর ভাত মাঠে নিয়ে যায়—দ্বিপ্রহর বেলায়। সূর্য মধ্যগগনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই দূর আলের পথে রাবেয়ার সাদা শাড়ীপরা মূর্তিটি দেখা যায় ভাতের পুঁটুলিটি নিয়ে আলের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে। অবশ্য জুম্মাবারে ভাত নিয়ে যেতে হয় না—কারণ নাসের ঐ দিন সকাল ক'রে বাড়ি ফেরেন—নামাজ শেষ ক'রে ভাত খান। তা'হলেও এই শুক্রবারগুলোতেও রাবেয়ার আচরণ একেবারে সূর্যের আহ্নিকগতির মতোই বাঁধা থাকে। গাড়ুতে ক'রে ওজুর জল, গামছা নিয়ে সে এই দাওয়ায় সিঁড়িতে অপেক্ষা করে। এলেই হাতে পায়ে জল ঢেলে দেয়, গামছা দিয়ে পা মুছিয়ে দেয়। তারপর দাওয়াতে পাটি বিছিয়ে দেয় নামাজ করার জন্য। ততক্ষণে বিবিরা এবং বাড়ির অন্য পরিজন সবাই এসে যায় প্রস্তুত হয়ে।

কিন্তু আজ কি হ'ল?

অসুখ করল নাকি রাবেয়ার?

আরও একটু গলাটা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রাবেয়া—এই রাবেয়া?'

স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন বড়বিবি—দৌলত।

'ওকি? রাবেয়া তোমার ওজুর জল দেয়নি? কোথায় গেল সে? দাঁড়াও আমিই আনছি।'

দৌলত ছুটে গিয়ে জল, গামছা নিয়ে এলেন।

ছোট বিবি আমিনা এলেন পাটি নিয়ে। বাকী সবাইও যথারীতি দেখা দিতে শুরু করল।

'কিন্তু রাবেয়ার হ'ল কি? তার কি অসুখ-বিসুক করল নাকি?'

'কী জানি। ওরে কে আছিস ছাখ্ না রাবেয়া কোথায়?'

নাসের মিঞা একবার উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রোদ সরে গেছে বহুদূর। নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি আর কথা না ক'য়ে নামাজে বসলেন। বাকী সকলে তাঁর দেখাদেখি সুরু করল নামাজ।

রাবেয়া কিন্তু তখনও এলনা।

নাসের মিঞা বোধ হয় মন দিয়ে সেদিন ঈশ্বরকেও ডাকতে পারেন নি। রাবেয়ার জন্য সত্যই চিন্তিত হয়েছিলেন তিনি—উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

সাধারণত নামাজ শেষ ক'রেই তিনি ভাত খেতে বসেন—কিন্তু সেদিন সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেল। উঠেই সোজা বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। দৌলত ও আমিনা তাঁর দুই বিবিই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমিনা বললেন 'আপনি খেতে বসুন, আমি দেখছি।'

দৌলত বললেন, 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন, অসুখ ক'রে থাকে আমি দেখছি। তুমি অত উতলা হও কেন। সামান্য একটা বাঁদীর জন্য—'

ললাটে তাঁর বিরক্তির ভ্রূকুটি।

কিন্তু নাসের কোন কথায় কান দিলেন না। অন্তঃপুর গিয়ে সোজা দাসীদের মহলে চলে গেলেন।

মহল অবশ্য নয়—মহলের পরিহাস। কিন্তু সবাই অভ্যাসবশতঃ তাই বলে। বিরাট দুটো আটচালায় কয়েকখানা ক'রে ঘর। একটা তাঁর কাছারী বাড়ি—দৌলত বিবি ঠাট্টা ক'রে বলেন দরবারী মহল। আর একটা অন্দর বা হারেম। হারেমের দুপাশে ছোট ছোট চারটি খোপের মত ঘরে থাকে ঝি-রাঁধুনি ইত্যাদি। তাকেই বলা হয় বাঁদী-মহল।

এককালে এই সবেই অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা। পঙ্খের কাজ করা দেওয়াল ও পাথরের মেঝে; তাতে পাতা থাকত বুখারার গালিচা। কিন্তু সেসব আজ স্মৃতি। স্মৃতি বলাও ভুল, কারণ কোনটাই নাসেরের মনে পড়ে না। সবটাই শুধু লোকমুখে শোনা—শ্রুতি বলাই ঠিক।

আজ মসনদ নেই, রাজত্বও নেই। এমন কি জমিদারীও নেই। সাধারণ সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ, এই তাঁর পরিচয়। ছিটে-বাঁশের দেওয়ালে মাটি লেপা, খড়ের চালা—এইখানে আজ তাঁকে জীবন কাটাতে হচ্ছে। মাটির মেঝেতে পা দিতে পারেন না ব'লে পেটা চুনের মেঝে ক'রে নিয়েছেন। বর্ষাকালে চুন লেগে পায়ে

ঘা হয়ে যায়। নাসেরকে তাঁর বিবিরা আজও শাহ্‌জাদা বলে কিন্তু বাইরে সকলকার কাছেই তিনি আজ শুধু বড়মিঞা। মুনিষ-চাকর সকলকার কাছেই।

তা হোক—নাসের তাতে বিচলিত নন। মসনদ সুদূর, সে পথও দুর্গম এবং কণ্টকাকীর্ণ, সে পথে যাবার জন্য তিনি ব্যস্ত নন মোটেই। তাঁর ভাগ্যেই তিনি সন্তুষ্ট। কী হবে অশান্তির মাঝে গিয়ে—নিজের এবং নিজের আত্মজনের জীবন বিপন্ন ক'রে? তার চেয়ে এই শান্তির মাঝে, প্রকৃতির এই অবারিত মুক্ত প্রমোদ-কাননে—পাখীর ডাকে, ফুলের গন্ধে দু-বেলা দুমুঠো মাছভাত খেয়ে দিন কেটে যায় ত এই—তাঁর ভালো। শাহী রক্ত তাঁর ধমনীতে বুঝি একেবারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এর চেয়ে বেশী কোন আশা তাঁর নেই—এর চেয়ে বেশী আরাম তিনি চাননা· এমন কি উচ্চাশার মোহে ভুলে সিংহাসনের ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে না পড়ে যে এখানে এসে এই সামান্য জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন ওঁর মা—সেজন্য তিনি মার কাছে কৃতজ্ঞ।

নাসের বাঁদীদের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলেন, 'রাবেয়া! এই রাবেয়া।'

ও মহলের বারান্দা থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দৌলত দাঁতে দাঁতে বাধিয়ে বললেন, 'আদিখ্যেতা!' তিনি আর দাঁড়ালেন না, পাশের একটা ঘরে ঢুকে পড়লেন

নাসের সাড়া না পেয়ে রাবেয়ার ঘরের সামনে এসে চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে যেতে এখনও তাঁর বাধে। বাঁদীদের ঘরে যাওয়ার আইন নেই তাঁদের।

'রাবেয়া!'

ধড়মড় ক'রে সামনে এসে দাঁড়াল রাবেয়া।

'জনাবালি—জনাব এখানে!' অতি কষ্টে অস্ফুট-কণ্ঠে উচ্চারণ করে রাবেয়া।

পনেরো ষোল বছরের ছিপছিপে মেয়ে রাবেয়া। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—তবে দৌলত কি আমিনা—এমন কি নাসের মিঞার পাশে দাঁড়ালেও কালো বলে মনে হয়। মুখশ্রীও এমন কিছু অসাধারণ নয়। কিন্তু সে মুখের গঠনে কোথায় একটা করুণ মাধুর্য আছে, শান্ত আত্মনিবেদনের ভাব আছে—যা দেখলে পুরুষের চিত্ত স্নেহার্দ্র হয়ে আসে। আর তার চোখ দুটি বড় সুন্দর। টানা টানা আয়ত চোখে যেন সুদূরের স্বপ্নাঞ্জন মাখা। হাসিতে তা শত দীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—কান্নায় তা নীল সরোবরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে রাবেয়া এখন এসে দাঁড়াল তার চোখে অবশ্য নীল সরোবরের আভাস

নেই—এখন তা দুটি রক্তোৎপল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ অবিশ্রাম কান্নায় চোখ লাল হয়ে উঠেছে, চোখের কোণগুলো পর্যন্ত ফুলো ফুলো।

'ও কি রে রাবেয়া? কাঁদছিলি? কী হয়েছে? অসুখ করেছে? বড়বিবি বকেছে? তাই পড়ে পড়ে কাঁদছিস? আমার আসার কথাও মনে ছিল না তোর—এমন কি দুঃখ পেয়েছিস রে?'

আরও কাছে এসে ওর মাথায় হাত রাখলেন নাসের মিঞা।

রাবেয়া তখনও কান্নার বেগ সামলাতে পারেনি। তখনও সে ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে।

কোন মতে, কষ্টে সে বললে, 'অপরাধ হয়ে গেছে জনাব, মাফ করুন।'

'তা ত করব। কিন্তু কী হ'ল বল দিকি।'

রাবেয়া নিরুত্তর। প্রাণপণে সে কান্নার বেগ সম্বরণ করছে। এ কী লজ্জা, ছি ছি। কোন রকমে সহজ হ'তে পারলে যেন বাঁচে সে।

'কি হ'ল বল না রে। দ্যাখ আমি এখনও খাই নি।'

চমকে ওঠে রাবেয়া। ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'এখনও আপনার খানা দেয় নি। চলুন, আমি যাচ্ছি—'

সে ছুটেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে পথ আটকে দাঁড়ালেন নাসের, 'উঁহু, বল্ আগে কী হয়েছে—'

'সে ছেলে-মানুষী, সে শুনলে আপনি হাসবেন, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আমাকে যেতে দিন। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। এ যে বিকেল হয়ে গেল। কখন খাবেন আপনি? সেই কখন নাস্তা ক'রে বেরিয়েছেন—নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে আপনার।'

'তা হোক্। তুই বল আগে। নইলে ছাড়ব না। যত ক্ষিদেই পাক আমার!'

অসহায় ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চায় রাবেয়া। ওধারের দাওয়ায়, উঠানে—বহু কৌতূহলী চোখ। সে চোখে কৌতুক ও ঈর্ষা।

রাবেয়া সামান্য বাঁদী—তার প্রতি মালিকের এ মনোযোগ—অস্বাভাবিক না হ'লেও কৌতুকপ্রদ বৈকি।

রাবেয়া মাথা নিচু ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'ভোরবেলা বড় বিশ্রী স্বপন দেখেছি।'

'খোয়াব দেখেই মাথা খারাপ হয়ে গেল—সে আবার কী খোয়াব রে?'

হেসে ওঠেন নাসের মিঞা।

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে রাবেয়া। মাথাটা আরও হেঁট হয়ে যায়। কোন মতে বলে, 'স্বপন দেখেছি যেন বিস্তর ফৌজ এসেছে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। কারা কারা সব এসেছে যেন, তাদের জমকালো পোশাক, ঘোড়া হাতী—কত কি! তারা যেন আপনাকে ধরে নিয়ে চলে গেল—এই বাড়ী খালি পড়ে, আর আমি—আমিও পড়ে রইলাম।'

নতুন কান্নার বেগে শেষের কথাগুলো অস্পষ্ট গোলমেলে হয়ে পড়ে।

এবার হা-হা ক'রে হাসেন নাসের মিঞা।

'তা ঘুম ভেঙ্গে উঠে কি দেখলি? লোকে লোকারণ্য? সেনা-সামন্তে মাঠ ভরে গেছে একেবারে? দূর পাগলি—স্বপ্ন ত আর সত্যি নয়—স্বপ্ন স্বপ্নই। তা নিয়ে এত মন খারাপ করার কি আছে?'

'তবে যে—তবে যে বড়বিবি বলেন, ভোরের খোয়াব সত্যি হয়।'

'দূর পাগ্‌লী। তাই কখনও হয়। আমি যে আজ ভোরে খোয়াব দেখেছি যে আমি রাজা হয়েছি!··· চল্ চল্—যত সব বাজে ঝামেলা!'

নাসের মিঞা উঠানে নেমে এলেন।

চোখ মুছতে মুছতে রাবেয়াও এল তার পিছু পিছু।

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও নাসের মিঞা কিন্তু অন্যমনস্ক হয়েই রইলেন। এমন কি খাওয়ার সময় দৌলতবিবি মুখ অন্ধকার ক'রে সামনে বসে থাকা সত্ত্বেও তিনি তা লক্ষ্যই করলেন না। অথচ দৌলতবিবিকে তিনি একটু সমীহ ক'রে চলেন, তা সবাই জানে। আর তার কারণও আছে। নাসের মিঞার বাবা যখন মারা যান তখন নাসেরের বয়স মাত্র তিন বছর। সে দুর্দিনে বান্ধব বলতে ওদের কেউ ছিল না গোটা প্রাসাদে। বরং দুশমনই ছিল চারিধারে। রাজাদের জ্ঞাতিই হ'ল শত্রু, রাজত্বের বিঘ্ন—উন্নতির পথে কণ্টক। সেদিন তাঁকে নিয়ে সেখানে বাস করলে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো কঠিন হ'ত। তাই অনেক ভেবে ওঁর মা সেই শিশুপুত্রকে কোলে ক'রে এক অন্ধকার রাত্রে পিছনের পথ দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন—এবং রাতারাতি ছিপ নৌকায় বহুদূর পালিয়ে আসেন। সেদিন সঙ্গে ক'রে ধনরত্ন আনতে পারেন নি বেশি—লোকজন তো নয়ই। মাত্র জনাদশেক বিশ্বস্ত সেবক ছিল সঙ্গে, আর পুরোণো এক দাসী। সেই ছিল নাসেরের

ধাত্রী। সুতরাং সেদিন রাজধানী থেকে বহুদূরে না পৌছনো পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি নাসেরের মা।

যে দুর্দিনে এখানে ওঁদের আশ্রয় দেন দৌলতের বাবা। শুধু আশ্রয় দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—সদাচরণই করেছিলেন। সাধারণ আশ্রিতের মতো করুণার সঙ্গে ব্যবহার করেন নি—মহামান্য অতিথির মতোই সম্মান দেখিয়েছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতাতে নাসেরের মা তাঁর চার বৎসরের পুত্রের সঙ্গে দৌলতের বিবাহ দিয়ে খানিকটা ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

তারপর থেকে দৌলতেব বাবাই হন ওঁর অভিভাবক। এই ঘর বাড়ি—জমি জমা সবই তাঁর দেওয়া। যদিও আমরণ তিনি ওকে 'শাহজাদা' ব'লেই সম্বোধন ক'রে গেলেন—এবং কখনও ওঁর সামনে বসতে পারলেন না, হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়েই কথা ব'লে গেলেন—কিন্তু দৌলত তাঁকে ভয় করতেন না কোন দিনই খেলার সাঁথীকে স্বামী ব'লেও খাতির করতে পারেন নি। বরং কথায় কথায় তাঁকে ধমকই দিতেন। তাঁর মুখ অন্ধকার দেখলে তাই ব্যস্ত হয়ে পড়াই নাসেরের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ তিনি এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন যে দৌলতের অন্ধকার মুখও তাঁর চোখে পড়ল না—তেমনি চোখে পড়ল না সপত্নীর উষ্মায় আমিনার চোখে কৌতুকের হাসি! তিনি খেয়েই চললেন—নিঃশব্দে, কতকটা অভ্যাস-বশেই।

কথাটা রাবেয়াকে বলেছেন হাসতে হাসতে—কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সেটা তাঁর কানে বেজেছে।

তাঁর স্বপ্ন আর রাবেয়ার স্বপ্নে কোথায় একটা মিল আছে বুঝি ; রাজা হ'লেও তাঁকে নিয়ে যেতে লোকলস্কর আসতে পারে—রাজরোষে পড়লেও তাই। সৈন্য-সামন্ত এসে তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে পারে—চরম সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্য দুই কারণেই। তাহ'লে, তাহ'লে কি—

পরক্ষণেই মনে মনে নিজেকে বিদ্রূপ ক'রে ওঠেন নাসের মিঞা। আজও ঐ মোহ গেল না, আশ্চর্য! উচ্চাশা থাকা ভালো তা তিনিও জানেন, যদি সে উচ্চাশার পেছনে উদ্যম থাকে। এ শুধুই মোহ।...যদি দৈব কোন অনুগ্রহ করে, এই বৃথা আশা। কিন্তু তা হবার নয়। ইলিয়াস শাহী বংশের সূর্য অস্ত গেছে —নতুন বংশ, নতুন রক্ত এসে দখল করেছে সে গদি।...আর যদি ইলিয়াস শাহী বংশই থাকৃত, তাতেই বা কি? তাঁর জন্মের পরে ঐ বংশের বহু সুলতান গদীতে

বসেছে, আরও বসতে পারত বাধা না পেলে—ওঁর কথা কোনদিনই উঠত না। ওঁর কিসেরই বা দাবি ?

অকস্মাৎ দৌলতের তীক্ষ্কণ্ঠে তাঁর চিন্তার সুতো যেন একটানে ছিঁড়ে যায়।

দৌলতবিবি বলছেন, 'তোমার এখন বয়স হয়েছে। ঐ ছুঁড়িটা তোমার মেয়ের বয়সী। তার ওপর বাঁদী। ওর সঙ্গে অত বাড়াবাড়ি করা কি উচিত ? চাকর-বাকর কিষেণ মজুররা পর্যন্ত হাসাহাসি করে। তোমার লজ্জা সরম না থাকে, আমার ত আছে। আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা যায় !'

ভাত খেতে খেতে বিহ্বলের মতো মুখ তুলে তাকান নাসের মিঞা, 'কী হয়েছে, তুমি কার কথা বলছ ?'

'কার কথা আবার বলব ! ঐ বাঁদীটার কথা ! ওর আস্পদ্দা তুমি দিন দিন বাড়িয়েই তুল্‌ছ। ওর সঙ্গে অত কথা কিসের তোমার ? ওকে অত প্রশ্রয় দেবারই বা কি দরকার ?'

নাসের মিঞার পাঠান রক্ত নিমেষে মাথায় চড়ে যায় আজ। কঠিন কণ্ঠে বলেন, 'বাঁদীদের বিয়ে করা তো আমাদের বংশে নতুন নয় দৌলতবিবি !'

দৌলতের মুখ অরুণ-বর্ণ হয়ে উঠল। তিনিও সমান দম্ভের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ— তা অবশ্য ঠিক। বাঁদী-বান্দা না হোক্ রাস্তার লোক ধরে তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আমাদের বংশেও হয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে কেনা বাঁদী— বাঁদীর মেয়ে, ছি !'

নাসের মিঞার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। তিনি হেসে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন, 'বাঃ, এই যে অস্ত্রটি ছেড়েছ দেখছি। তোমার বাবার ভাতের খোঁটা দেওয়াই ত তোমার চরম অস্ত্র। কায়খসরুর তীর।···কিন্তু ওগো বেগমসাহেবা—আমার মা তোমার বাবার ভিক্ষার অন্ন খাননি। নেই নেই ক'রেও তাঁর সঙ্গে যা জহরৎ ছিল তাতে তোমার বাবার মত শ্রোত-জমা তিনবার কেনা যেত।'

সঙ্গে সঙ্গে দৌলত উত্তর দেন, 'কিন্তু আমার বাবা না থাকলে সে ধনদৌলত আর তোমাকে ভোগ ক'রতে হ'ত না—পথেই মেরে দিত চোর-ডাকাতে। আমার বাবাই তো কেড়ে নিতে পারতেন।'

নাসের বললেন, 'কিন্তু তুমি কি ঐ মেয়েটাকে হিংসে করো দৌলত ?'

'ছি ! তার আগে যেন আমার গলায় দেবার মত এক গাছা দড়ী জোটে।·· কিন্তু লোকে কি বলে।'

নাসের বললেন, 'লোকের কথা শুনতে খুব অভ্যস্ত নই, দৌলত। তুমি না

হয়ে অপর কেউ হ'লে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতুম যে শাহী বংশে আমার বয়সে দু-দশটা মেয়ে মানুষ রাখা আশ্চর্যও নয়, নতুনও নয়। সে ইচ্ছা থাকলে ওকে আমি এমনিই গ্রহণ করতে পারতুম, ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ সে অধিকার আমার আছে, নিকা এমন কি সাদী করলেও কেউ ঠেকাতে পারত না! কিন্তু সেকথা এখন উঠছে না,—মেয়েটা আমাকে সত্যিই ভালবাসে! তাতেই যদি আমি ওকে একটু পক্ষপাত দেখাই—সেটা কি খুব অন্যায়!'

ঠোঁট বেঁকিয়ে দৌলত বললেন, 'ভালবাসা না ছাই! মনিবের সোহাগ নেবার জন্য অভিনয়!'

'সব ভালবাসাই হয় তো অভিনয়। সে কথা ভাবতে গেলে পৃথিবীতে বাঁচা যায় না বিবি, সে ভাবতে বসলে মরদরা পাগল হয়ে যেত। তাছাড়া—আমার পঞ্চাশের উপর বয়স হ'ল—অভিনয় চেনবার মত অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে বৈকি!'

দৌলত আবারও কি বলতে গেলেন—গামছায় হাত মুছতে-মুছতেই হাত তুলে নাসের বললেন, 'থাক। যথেষ্ট হয়েছে! ও কথা খতম করো।'

দৌলত গুম্ খেয়ে বসে রইলেন। নাসের উঠে গিয়ে দাওয়ায় বসলেন।

অপরাহ্নে দাওয়ায় চেটাই বিছিয়ে তার ওপর ফরাস পাতা হ'ত। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকতেন নাসের মিঞা, গ্রামের দু'চারজন সমবয়সী ভদ্রলোক সেই সময় এসে জুটতেন একে একে। খোসগল্পও চলত—কারোর ঝগড়া বিবাদ থাকলে সেই সময় সালিশীও চলত।

আজও অভ্যাস-বশত এসে শুয়েছেন, চাকর এসেছে একজন পা টিপতে—এমন সময় প্রায় ঝড়ের মত ছুটতে ছুটতে এলেন তাঁর গোমস্তা ফরিদ মিঞা।

'হুজুর শুনেছেন?'

'কী ব্যাপার! ব'সো ব'সো—অত হাঁপাচ্ছ কেন?'

'গৌড়ের খবর শুনে এলুম হুজুর। এই মাত্র দয়াশঙ্কর বাগচির নৌকো এসে লেগেছে ঘাটে। তিনি সোজা আসছেন গৌড় থেকে।'

'তা ত বুঝলুম কিন্তু খবরটা কি? অত দৌড়বার মতো কি হ'ল?'

বললেন কতকটা নির্লিপ্ত উদাসীনের মতোই কিন্তু তাঁর বুকের ভেতরটা যেন কি এক আশা, আগ্রহ এবং উদ্বেগে ধড়ফড় করতে লাগল। এ ধরনের অনুভূতি ইতিপূর্বে তাঁর কোন দিন হয়নি।

ফরিদ মিঞা কিন্তু তখনও দম নিতে পারেনি। অনেক কষ্টে হাঁফাতে

হাঁফাতেই বললে, 'সেই কাফেরটা নির্ব্বংশ হয়েছে হুজুর, একেবারে শেষ! সুলতান সামসুদ্দিন আহ্‌মেদ আর নেই!'

'সুলতান মারা গেছেন?'

'খতম। ওরই দুই বান্দা—শাদী খাঁ আর নাসির খাঁ—বড্ড নাই দিয়েছিল ওদের বোকার মতো, ইদানীং ওরা বড় বড় ওমরাহ্‌দের মাথার ওপর দিয়ে হাঁটত একেবারে—তাদের হাতেই জান দিয়েছে উজবুকটা! দুজনে মিলে খোড়কুঁচি ক'রে কেটেছে!'

'খুন হয়েছেন? সুলতান খুন হয়েছেন!'

'খুন বলে খুন! একদম যাকে বলে বেঘোরে খুন হওয়া। আরে যদি সত্যিকারের সুলতানের বংশে জন্ম হ'ত তাহ'লে বুদ্ধি-সুদ্ধিও থাকত কিছু। যারা তিনবার ক'রে ইমান পাল্টায় তাদের কি কোন আক্কেল থাকে? ও ভেবেছিল যে এরা আমার খুব পেয়ারের লোক, এরাই আমাকে রক্ষা করবে। এই ভেবে দেখিয়ে দেখিয়ে আমীর-ওমরাহ্‌দের সামনে ওদের মাথায় তুলত। তার ফল ফলল এবার। যে রক্ষক সেই ভক্ষক!'

'এমন তো চিরদিনই হয়ে এসেছে ফরিদ! আমাদের বংশেই কি তা হয়নি? জোর যার মাটি তার! আওরাৎ আর জমিন—যে যত দিন পারে ভোগ করতে ততদিনই তার। যাক্ তাহ'লে নতুন সুলতান কে হবেন? শাদী খাঁ না নাসির খাঁ?

'ওরা মতলব করেছে হুজুর দুজনে মিলে চালাবে। ওদের আবার বুদ্ধি দেখুন!'

'যাক্‌গে—।' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেন নাসের, 'যে যা খুশী করুক। ওদেরই আবার হয়তো একজন আর একজনকে মারবে। না মারে তাতেই বা কি—আমরা বহুদূরে আছি ফরিদ। গৌড়ের মসনদ আর এই গাঁ—দুয়ের মধ্যে অনেক ফারাক। গৌড় বহুদূর!'

'তা কি বলা যায় জনাব। পুরুষের নসীব কে বলতে পারে! ইলিয়াস শাহী বংশে এখন আপনিই জ্যেষ্ঠ!'

'ও হো হো!' কেমন একটা জোর দিয়ে হেসে ওঠেন নাসের, 'তুমি বুঝি তাই ভাবছ! আরে ওরা না থাকে নতুন বংশ গজাবে। বড় বড় ওমরাহ্‌রা রয়েছেন, বড় বড় সিপাহ-সালাররা—তাদের হাতে টাকা, তাদের হাতে লোকজন। গরীব নিঃস্ব নাসের মিঞার কথা কারুর মনে পড়বে না। আর মনে না পড়াই

ভালো, মনে পড়লেই বরং ভয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে যে ইলিয়াস শাহীর এক ফোঁটা রক্ত থাকলেই মসনদের দাবিদার থাকবে। ও শেষ ক'রে দেওয়াই ভালো। নাও, তুমি এখন আদায় উশুলের কথা বলো—'

রাত্রের সন্ধ্যার পর পুরুষরা বিদায় নিলে রাবেয়া এসে পায়ে তেল মাখাতে বসল। অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে তেল মাখিয়ে গেল রাবেয়া। অন্যদিন মালিক আর বাঁদী এই সময় দুজনে অনেক গল্প করে—ছেলে-মানুষী নানা রকমের গল্প। কিন্তু আজ কোন এক কারণে দুজনেই স্তব্ধ। রাবেয়ার মুখ বন্ধ করেছে একটা সঙ্কোচ। আর নাসের অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবছেন আকাশপাতাল।

অনেকক্ষণ পরে নাসের আস্তে আস্তে ডাকেন, 'রাবেয়া!'

চমকে ওঠে রাবেয়া 'জনাব!'

'কাছে আয়। বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দে।'

রাবেয়া কাছে এসে বসে। অল্প তেল দিয়ে বুকটা মালিশ করতে থাকে।

নাসের সস্নেহে ওর হাতের ওপর একটা হাত রাখেন।

'রাবেয়া, আচ্ছা ধর্ আমি যদি কোন দিন রাজা হই? তোর আনন্দ হবে না?'

চমকে কেঁপে ওঠে রাবেয়া। সে কম্পন নাসের স্পষ্ট অনুভব করেন।

অনেকক্ষণ পরে শুষ্ক কণ্ঠে রাবেয়া উত্তর দেয়, 'হবে বৈকি জনাব, হবারই ত কথা!'

'রাবেয়া তুই আমাকে ত ভালবাসিস। যাকে ভালোবাসা যায় তাকে ছুঁয়ে মিছে কথা বললে তার অনিষ্ট হয় তা জানিস? হিন্দুরা অন্ততঃ তাই বলে।'

হঠাৎ হাতটা ওঁর বুকের ওপর থেকে টেনে নেয় রাবেয়া—কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই। হেসে উঠে নাসের বলেন, 'তার মানে তুই আমার সঙ্গে মিছে কথাই বলছিলি! কিন্তু কেনরে—আমি যদি রাজা হই, তাহলে তোর ভয় কি?...খবরদার, আমার কাছে মিছে কথা বলিসনে, খুলে বল্।'

রাবেয়া চুপ করে থাকে। নীলসরোবরে আবার জোয়ার আসে, দু'চোখ আসে ওর ছলছলিয়ে। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'আপনি সুলতান হয়ে গৌড়ে গেলে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলব জনাব।...আপনার এই পা দুটি সেবা করতে না পারি ত আমার জীবনে আর রইল কি?'

'দূর পাগলী। আমি যদি গৌড়ে যাই ত তোকে কি ফেলে যাব? তোকেও নিয়ে যাব।'

'সে হয় না জনাব। গৌড়ের প্রাসাদ আমরা কল্পনা করতে পারি না। সেখানের হারেমে কত সুন্দরী বাঁদী। কত ওমরার মেয়ে আপনার সেবা করার জন্য লালায়িত হবে। শুনেছি কোন্ দূর হিস্পানী দেশ, কুর্দিস্তান, আর্মানী দেশ থেকে বাঁদী আসে। সেখানে আমার কোন প্রয়োজন থাকবেনা জনাব।'

'আমার চোখে রাবেয়াই বেশী সুন্দরী।'

'চেরাগের আলোতেও রোসনাই হয় জনাব—যতক্ষণ না সূর্য ওঠে।'

'আচ্ছা আমাকে তুই এত ভালবাসিস কেন রাবেয়া। আমি তো বুড়ো—তোর বাপের বয়সী।'

'তা তো কোনদিন ভেবে দেখিনি। একটু একটু ক'রে যেমন জ্ঞান হয়েছে এই পা-দুটিই জীবনের সবচেয়ে বড় কামনার জিনিস ভেবেছি।'

'বেশ ত, তাই যদি হয় আমি তোকে বিয়ে করব। তুই হবি আমার বেগম—রাবেয়া বেগম। তখন তোরই কত বাঁদী থাকবে।'

'তাতেও আমার লোভ নেই জনাব। আমার বাঁদী থাকবে সত্যি কিন্তু আমি যে চাই আপনার বাঁদী হয়ে থাকতে।...না জনাব, সেখানে আপনার অনেক বেগমের একজন হয়ে আপনার বদলে হীরে জহরৎ নিয়ে ভুলে থাকতে আমি চাই না। বছরে হয়তো একদিন আপনার দেখা মিলবে কি মিলবে না। সেখানে এই পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার মতো অনেক ভালো হাত তপস্যা করবে—সেখানে আপনি আমাকে মনে রাখবেন এমন অসম্ভব আশা আমি করি না।'

'তুই আমার বেগম হ'তেও রাজী নস? তাহ'লে আমি যদি কোনদিন গৌড়ের তখ্‌ত্‌-এ বসি তুই কি করবি?'

'এখানে খালি বাড়িতে আপনার ঐ জুতো জোড়া নিয়ে দিন কাটাব। গৌড়ের রাজপ্রাসাদের সুখ-সৌভাগ্যে আমার কোন লোভ নেই জনাব।'

'তাই তো, ভাবিয়ে দিলি। আচ্ছা যদি আমি হুকুম করি?'

'আমি বাঁদী—হুকুম করলে তা তামিল করতে হবে বৈকি।'

আহত কণ্ঠে নাসের বললেন, 'তুই বাঁদী—এতদিন কি এই পরিচয়ই তোর আছে। আমি তোকে 'বাঁদি' বলে ভাবি?'

মাথা হেঁট করে রাবেয়া বলে, 'তা ভাবেন না ব'লেই তো সাহস ক'রে এত

কথা বলতে পারলুম জনাব। আর যদি কখনও সে সৌভাগ্যের দিন আসে, সুলতান হয়ে গৌড়েই আপনি চলে যান—তো সেদিন সেই সাহসেই আপনার কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেব আমার স্বাধীনতা—আর এই বাড়ি, আমার এই সুখস্বর্গ।'

নাসের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই যা রাবেয়া, আমার ঘুম পাচ্ছে।'

দুরাশা নেই নাসেরের কোন কালেই। গৌড়ের মসনদ নিয়ে তিনি কোন দিনই মাথা ঘামান নি। দুদিনের চিত্তচাঞ্চল্য তাই ঠিক দু'দিনেই চলে গেল। আবার প্রতিদিনের মতো তিনি মাঠে মাঠে চাষের তদারক ক'রে, প্রজাদের ঝগড়া মিটিয়ে, দাবা খেলে—সুখে এবং শান্তিতে দিন কাটাতে লাগালেন। গৌড় বহুদুর, সে সব কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে লাভ কি?

কিন্তু সত্যি-সত্যিই একদিন খবর এসে পৌছল—বিরাট এক শাহী ফৌজ এই দিকেই আসছে! লোক-লস্কর, হাতী-ঘোড়া—সে বিরাট ব্যাপার।

বিরাট ব্যাপার তাই ধীরে ধীরেই চলে। যারা দেখেছে তারা সাত দিনের পথ দু'দিনে এসে খবর দেয়।

আশা নিরাশায়, আনন্দে ও ভয়ে নাসেরের বুক কাঁপে। ছেলেদের মুখ ওঠে শুকিয়ে অথচ অস্পষ্ট কোন এক লোভে চোখ-দুটোও জ্বলে। সামনে বিপুল বিপর্যয় সন্দেহ নেই। হয় এসপার নয় ওসপার। হয় তখ্‌ত্‌ নয়তো মৃত্যু! এ দুটোর মধ্যে অন্য কোন পথ নেই।

রাবেয়া কিন্তু এবার কাঁদে না। কলের পুতুলের মতো প্রতিদিনের কাজ ক'রে যায়—কোথাও এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে না। নাসের মিঞাও তার আচরণে কোন গলদ পান না—কিন্তু তবু তিনি অস্বস্তি অনুভব করেন। পাষাণের মতো ভাবলেশহীন রাবেয়ার মুখ—কিন্তু চোখ দুটি স্তম্ভিত কান্নায় রক্তোৎপল হয়ে উঠেছে তা তিনিও লক্ষ্য করেন।

অবশেষে একদিন প্রত্যুষে গ্রামের প্রান্তে অগ্রবাহিনীর ছাউনি পড়ল। গৌড়ের সাতজন সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ওমরাহ্‌ এলেন ঘোড়ায় চেপে, সঙ্গে একটি সুসজ্জিত হাতী—তাতে সোনার শূন্য হাওদা।

নাসের মিঞা প্রশান্ত মুখে বাইরের দাওয়ায় বসেছিলেন ফরাস বিছিয়ে। যদি মরতে হয় ত ইলিয়াস শাহের পৌত্রের মতই মরবেন। ভয় যেন না

প্রকাশ পায় তাঁর ভঙ্গিতে বা আচরণে—ভয় কিংবা প্রাকৃত জনোচিত কোন বিস্ময়!

ওমরাহের দল দূরে মাঠের মধ্যেই ঘোড়া থেকে নামলেন। কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে এলেন সামনে—তারপর সামনের ফরাসে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'গৌড় বাংলার ন্যায়সঙ্গত সুলতানের কাছে আমাদের বহুত বহুত সালাম। জাঁহাপনা, গৌড়ের তখ্‌ত্‌ থেকে বেইমানের চিহ্ন তাদেরই রক্তে ধুয়ে গেছে। সে তখ্‌ত্‌ আজ খালি। পুণ্য-শ্লোক ইলিয়াস শাহের পৌত্রকে আজ আমরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তাঁরই ন্যায্য মসনদে। অনুগ্রহ ক'রে চলুন সম্রাট।'

নাসের মিঞা বিচলিত হলেন না—আনন্দ প্রকাশ করলেন না। বস্তুত কোন ভাবই ফুটল না ওঁর মুখে। তিনি শুধু পুত্রকে ইঙ্গিত করলেন—আতর আর পান দিতে। মাননীয় অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো তাঁর কর্তব্য।

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন, 'শাদী খাঁ নেই তা শুনেছি—নাসের খাঁও তাহ'লে নেই।'

'না জাহাঁপনা—সেও তার এক বান্দার হাতে প্রাণ দিয়েছে। এখন আর কোন বাধা নেই—আপনি চলুন আপনার পাওনা বুঝে নিতে।'

'কিন্তু আপনারাই ত রয়েছেন। আপনারা থাকতে আমি আর কেন? আপনারা কেউ বসলেই ঠিক হ'ত না কি?'

'কী বলছেন। ইলিয়াস শাহের পৌত্র প্রপৌত্ররা জীবিত থাকতে আমরা বসব তাঁর সিংহাসনে?'

'কিন্তু তাঁর সিংহাসনে যখন ভাতুড়িয়ার কাফের জায়গীরদার এসে বসেছিল তখন আপনারা ত কেউ প্রতিবাদ করেন নি! বরং সাহায্য করেছিলেন। এমন কি জৌনপুরের মোল্লার দল এসে যখন তাকে উচ্ছেদ করতে গিয়েছিল তখন আপনারাই তাকে সলা-পরামর্শ দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন। জালালুদ্দিনের পরও বহুকাল কেটে গিয়েছে—কৈ আপনারা তো এতকাল ইলিয়াস শাহের তখ্‌ত্‌ তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে দেবার জন্য ব্যস্ত হন নি।'

ওমরাহের দল নতমুখে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে একজন ধীরে ধীরে বললেন, 'আমরা ঠিক এর জন্য দায়ী নই জাহাঁপনা, যদিচ আমাদের পিতা-পিতৃব্যের প্রাপ্য তিরস্কার মাথা পেতে নিতে বাধ্য। আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। আপনি মহানুভব, আমাদের ক্ষমা করুন। হাতী প্রস্তুত—চলুন

জাঁহাপনা। আমরা সবাই আপনার সামনে আল্লার নাম নিয়ে শপথ করছি, আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে ইলিয়াস শাহের তখ্‌তে আর কাউকে বসতে দেব না। আপনার শাহী রক্ষা করতে আমরা জান দেব। চলুন জনাব।—'

নাসের তবু অবিচলিত।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনারা বহুদূর থেকে এসেছেন আগে আতিথ্য গ্রহণ করুন বিশ্রাম করুন। আমিও কথাটা ভেবে দেখি।'

'ভেবে-দেখা'র প্রস্তাবে ওমরাহ্‌রা একটু বিস্মিতই হলেন।

গৌড়ের সিংহাসন যেচে এসেছে এক সামান্য চাষীর কাছে। এখনও ভেবে দেখার কিছু আছে নাকি?

ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরে নাসের হাসলেন। বললেন, 'ভেবে দেখা দরকার বৈকি! ভালো ক'রেই ভেবে দেখতে হবে খাঁ খানান রহমতুল্লা, আপনাকেই সোজা কথাটা বুঝিয়ে বলি। আপনিই এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। এখানে আমার সিংহাসন নেই, অগণিত দাসী চাকর নেই। সোনার থালায় খাবার আসে না। কিন্তু এখানে শান্তি আছে! নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন আছে। সোনার থালার খাবার একজনকে দিয়ে চাখিয়ে নিতে হয়, তাতে বিষ আছে কিনা—কাঁসার থালায় নিজের চাষের ভাত নিশ্চিন্ত মনে আহার করতে পারি। সুখ ও শান্তি একদিকে আর একদিকে প্রাচুর্য, বিলাস এবং অশান্তি। কিসের বদলে কি পাচ্ছি একটু ভেবে দেখা দরকার নয় কি?'

ওমরাহরা নিরুত্তর রইলেন। তাঁরা দয়া ক'রে একজনকে সিংহাসনে ডেকে নিতে এসেছিলেন—এখন যেন মনে হচ্ছে তাঁরাই দয়া-প্রার্থী।

সরবৎ এসে পৌছল। উৎকৃষ্ট আখের গুড়ের সরবৎ, লেবুর রস দেওয়া। নিজের হাতে সরবতের ঘটি এগিয়ে দিলেন নাসের মিঞা।

মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ ক'রে দৌলতের ঘরে আসতেই তিনি অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কি ঠিক করলে?'

নাসের ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে তাকালেন, 'দাঁড়াও কাল সকাল পর্যন্ত সময় নিয়েছি। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ভেবে দেখি—'

দৌলত বলে উঠলেন, 'এতে এত ভাববার কি আছে তাই তো বুঝি না। ন্যায্য প্রাপ্য—তোমার পিতৃ-পিতামহের সিংহাসন, সেই পাওনা বুঝে নেবে।

তাতে ভাবার কি আছে। গৌড় বাংলার জনসাধারণ ন্যায়ত তোমার প্রজা—তাদের প্রতিও তোমার একটা কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য তোমার পিতৃঋণ।'

নাসের বললেন 'দৌলত, মানুষের যখন যেটা সুবিধা হয় সেইটেকেই সে অনায়াসে কর্তব্য ব'লে খাড়া করে। তাতে বিবেককে ঘুষ খাওয়ানো হয় কিন্তু তাকে ঠকানো যায় কি ?'

তারপর একটু কঠিনভাবেই বললেন, 'কিন্তু সে কথা ঠিক তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসিনি। ভেবেছিলুম তোমার কাছে একটু শান্তি, একটু বিশ্রাম পাব। কিন্তু দেখছি আমি ভুল করেছিলুম।

'আমি তোমার স্ত্রী। তোমাকে ন্যায়ের পথে, গৌরবের পথে চালিত করা আমার কর্তব্য। স্ত্রীর কাছ থেকে তোষামোদ আশা ক'রো না। •তার জন্য তোমার ঢের বাঁদী আছে।'

'হ্যাঁ—সেইখানেই যাব। আমার ভুল হয়েছিল দৌলত।'

নাসের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন—এবং মুহূর্তমাত্র কোনদিকে না তাকিয়ে কারুর দিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে, সোজা রাবেয়ার ঘরের সামনে এসে ডাকলেন 'রাবেয়া!'

রাবেয়া মালিকের খাওয়ার পরই নিজের ঘরে চলে এসেছিল। এটুকু নাসেরের চোখ এড়ায়নি। এখন দেখলেন তাঁর অনুমানই ঠিক—রাবেয়া পাষাণ-মূর্তির মতো তার শয্যায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, চোখ দুটি নিরুদ্ধ কান্নায় জবা ফুলের মতো লাল। প্রথম ডাক তার কানেই যায়নি।

নাসের এবার চৌকাঠের মধ্যে ঢুকে ডাকলেন 'রাবেয়া!'

চমকে, প্রায় লাফিয়ে উঠল রাবেয়া।

'এ কী জনাব—এখানে না, এখানে না। ছি ছি, এ যে আপনার বাঁদীর ঘর। আমি যাচ্ছি, দয়া ক'রে আপনি বেরিয়ে চলুন।'

'উঁহু' দৃঢ় কণ্ঠে ঘাড় নাড়েন নাসের, 'যাব বলে আসিনি রাবেয়া, তোর কাছেই এসেছি। আজ আমার বিশ্রাম পাবার মতো আর কোন জায়গা নেই। যেখানেই যাচ্ছি সিংহাসন তাড়া ক'রে আসছে। সবাই আমাকে রাজা করতে চায়, সকলে যেন লুব্ধ, হিংস্র হয়ে উঠেছে। বারবাক—আমার বড় ছেলে তো স্পষ্টই বলে দিল যে—আমি যদি না যাইতো সে তার হক্ ছাড়বে না। একটু যে কোথাও নিভৃতে ভাবব, সে স্থানও আমার নেই। তাই এখানে এলুম রাবেয়া—'

রাবেয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বললে 'কিন্তু এখানে যে থাকতে নেই আপনার জনাব। কে কি ভাববে বলুন তো। আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আপনি অন্য কোথাও চলুন।'

নাসের ততক্ষণে এগিয়ে এসে ওঁর বিছানায় বসে পড়েছেন। ওর একটা হাত ধরে টেনে নিজের পায়ের কাছে বসিয়ে বললেন, 'জানিস আজ আমি গৌড়ের সুলতান। আমি যেখানে যাই সেইটেই আমার ঘর। নে বোস, পায়ে হাত বুলিয়ে দে।'

রাবেয়া আর প্রতিবাদ করলে না। নীরবে নতমুখে বসে ওঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নাসেরও অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে সহসা রাবেয়ার মাথাটা নিজের হাঁটুর ওপর চেপে ধরে জোর করে ওর মুখটা তুলে ধরলেন। ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে ডাকলেন, 'রাবেয়া—তুই অন্ততঃ আমায় গৌড়ের তখ্‌ত্‌ নিতে পরামর্শ দিবি না? তুই বলবি না ওখানে যেতে?'

ঠোঁট দুটো কাঁপল অনেকক্ষণ ধরে রাবেয়ার। তারপর কণ্ঠস্বর ফুটল, 'কেন বলবনা জনাব। বলাই তো উচিত।·· এ আপনার হক। তা ছাড়া আপনার প্রজারা, ইলিয়াস শাহী সুলতানের প্রজারা বহুদিনের কুশাসনে তিক্তবিরক্ত, আপনার মতো লোকের শাসনই তাদের দরকার। বহুর কল্যাণে নিজের সুবিধাও ত্যাগ করা উচিত আপনার।'

'তুইও এই কথাই বলছিস?'

'আপনি তো জানেন জনাব—আপনার কাছে মিছে কথা আমি বলি না।'

'বেশ—তা হলে আর একটা সত্য কথা বল। আমি যদি গৌড়ে যাই তুই আমার সঙ্গে যাবি তো?'

রাবেয়া নিরুত্তর।

'বল—উত্তর দে। সত্যি কথা বল—নির্ভয়ে।'

রাবেয়া স্থির কণ্ঠে বললে, 'না।'

'রাবেয়া—তুই ত আমাকে ভালবাসিস—আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?'

'ভালবাসি ব'লেই পারব জনাব। চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যেতে পারব না—তার চেয়ে দূরে বসে আপনার কথা ভাবব। সে ঢের ভাল।'

নাসের ভ্রূকুটিবদ্ধ নেত্রে একদৃষ্টে সামনের দেওয়ালটার দিক চেয়ে রইলেন। ঘরের মধ্যে নিঃসীম স্তব্ধতা, দুজনের দ্রুত-নিঃশ্বাসের শব্দ দুজনে শুনতে পাচ্ছেন।

বাইরে রাজ-অতিথি-সৎকারের কোলাহল যেন দূরশ্রুত সাগর গর্জনের মতই ওদের কাছে সুদূর হয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ পরে নাসের বললেন, 'আমি যদি তোকে বিয়ে করি রাবেয়া ?'

'আপনার স্নেহের সীমা নেই তা আমি জানি। কিন্তু আমার অপরাধ বাড়াবেন না—আমি বাঁদী, বাঁদীর মেয়ে, সেই আমার একমাত্র পরিচয় থাক্ !'

নাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আমার মন স্থির হয়ে গেছে রাবেয়া—এবার আমার শান্তি।'

রাবেয়া যেন নিমেষে পাগল হয়ে উঠল। সে হাঁটু গেড়ে বসে সবলে ওঁর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'কি মন স্থির করলেন জনাব—আমাকে বলে যেতে হবে !'

নাসের আবার বসলেন।—বাইরের দাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রী ও পুত্রের দল। কিন্তু ওদের তিনি চিনে নিয়েছেন, ওদের মতামতের জন্য তিনি ব্যস্ত নন।

বসে পড়ে রাবেয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তামাম দুনিয়ার রাজগীর চেয়ে একটিমাত্র হৃদয়ের রাজগী অনেক বড় রাবেয়া। আমার খুদা অন্ততঃ আমাকে তাই বলেন।'

আরও, আরও জোরে ওঁর পা দুটো রাবেয়া বুকের ওপর চেপে ধরে। চোখে তার জল নেই, সমস্ত জল যেন রক্ত হয়ে শিরাগুলি পূর্ণ ক'রে তুলেছে।

অস্পষ্ট, অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে সে বলে, 'আপনি আমাকে ভালবাসেন জনাব—এত ভালবাসেন ?'

'হ্যাঁ—বাসি রাবেয়া। আমাকেও তো এত ভাল কেউ বাসে না। আজ এই বয়সে আমি এ রত্ন হারাতে রাজি নই রে—দুনিয়ার সব জহরতের বদলেও না !'

'আমি—আমি যাব আপনার সঙ্গে জনাব।' বিহ্বল ভগ্ন-কণ্ঠে বলে রাবেয়া।

'বাঁচালি—আঃ—তুই আমাকে বাঁচালি রাবেয়া।'

নাসের ওর ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় চলে গেলেন। ছেলেকে ডেকে বললেন, 'খাঁ খানানকে ডেকে বলো আমি তখ্‌ত্‌ গ্রহণ করলুম। কাল প্রত্যুষে যাত্রা করতে পারব, তিনি যেন এখনই সব প্রস্তুত রাখেন।'

চারিদিকে কোলাহল উঠল, আনন্দের কোলাহল। নূতন স্থলতানের জয়ধ্বনিতে চারিদিকের আকাশ বাতাস কম্পিত হ'তে লাগল মুহুর্মুহু। কেবল সেই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে নিজের ঘরের মেঝেতে তেমনিই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রাবেয়া, নিজের বুকটা নিজেরই দুহাতে চেপে ধরা, দৃষ্টি তেমনিই নির্নিমেষ। শুধু সেই জমাট রক্ত গলেছে। বিস্ফারিত চক্ষুর কোণ বেয়ে নিঃশব্দে ধারায় ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।...

পরের দিন ভোর বেলায় একদল যাত্রা শুরু করলেন। তার মধ্য ভাগে রইলেন সুসজ্জিত হাতীর ওপর সোনার হাওদায় গৌড় বাংলার নূতন ইলিয়াস শাহী স্থলতান নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফ্‌ফর মাহ্‌মুদ শাহ—আর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রুকুনুদ্দিন বারবাক শাহ। স্থির হ'ল গৃহস্থালী ভেঙ্গে বেগম ও অন্যান্য পরিজনরা দু-একদিন পরে যাত্রা করবেন।

শুধু রাবেয়াকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন স্থলতান কিন্তু সে রাজী হয়নি। কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'ছি! সে বড় খারাপ দেখাবে জনাব। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা করুন—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি গৌড়ে পৌছব ঠিক!'

স্থলতান হেসে, ওর গাল টিপে আদর ক'রে বিদায় নিয়েছিলেন।..

গৌড়ে পৌছে সমস্ত উৎসব সমারোহের মধ্যেও তাঁর শান্তি রইল না। তিনি বারবার দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার পাঠাতে লাগলেন—'দেখে এসো আর কত দূর—কতদূরে হারেম এসে পৌচেছে।'

অবশেষে একদিন মহামান্যা বেগম সাহেবরা এসে পৌছলেন। তাঁদের মহামূল্য কিংখাপের ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি একে একে রাজপ্রাসাদের অন্দর-মহলে এসে নামল। কিন্তু স্থলতানের সেদিকে দৃষ্টি নেই। তিনি উৎসুক ব্যগ্র নেত্রে চেয়ে আছেন—পিছনে বাঁদীদের ডুলির দিকে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ছোট ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, 'সবাই ঠিক ঠিক এসে পৌছেচে তো?'

'সব।' নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে উত্তর দেয়, 'কেবল রাবেয়া—'

'রাবেয়া কি? রাবেয়ার কি হয়েছে?'

'ঠিক বোঝা গেল না। ও নাকি পথে কোনদিনই কিছু খায় নি। কেউ সে খবরও রাখত না। আমি যখন খবর পেলাম, তখনই হাকিম সাহেবকে পাঠালাম কিন্তু তিনি বললেন, দীর্ঘ দিনের উপবাসে দেহকে একেবারে

নষ্ট ক'রে ফেলেছে—বাঁচানো কঠিন। তবু তিনি চিকিৎসা করেছিলেন—কিন্তু অবস্থা বিশেষ ভালো নয় নাকি। ঐ যে, শেষের ডুলিতে আছে—'

শেষ কথা শোনার জন্য সুলতান অপেক্ষা করেন নি। ছুটে এসে অধীর হস্তে ডুলির পরদা সরিয়ে দিলেন—'রাবেয়া, রাবেয়া, এ কি করলি!'

শীর্ণ হাত একখানি বেরিয়ে ওঁর পায়ে পড়ল, 'আমি আমার কথা রেখেছি, গৌড়ে পৌঁছেচি। এবার ছুটি দিন জনাব!'

চোখের রক্ত বুঝি মুখে নেমেছে, তারই এক ঝলক ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে একটা হাসির ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত হয়ে স্থির হয়ে গেল।*

* নাসিরুদ্দিন মামুদের সিংহাসন আরোহণের কাল—১৪৪২ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি দূর পল্লী-অঞ্চলে চাষবাস করিতেন—অকস্মাৎ সিংহাসনের আহ্বান পান। একথা ইতিহাসে আছে। ইনি ইলিয়াস শাহের পৌত্র, ইঁহার পিতার নাম কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

অভাবনীয়

সকাল বেলাটা কনকের কাটে নিরন্ধ্র অনবসরে। নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না বললেও সামান্য অত্যুক্তি হয় মাত্র। ঠিক পাঁচটায় ওঠে ও। মিনিট-দশেকের মধ্যে তৈরী হয়ে নিয়ে উনুনে আঁচ দেয়। ঠিকে ঝি শুধু বাসন মাজে, বাটনা বাটে এবং ঘর মোছে—এসব কাজ সে করে না। স্ত্রী কৃষ্ণা একে আনাড়ি তায় তার কোলে কচি ছেলে, সে এত ভোরে উঠতে পারে না। সুতরাং এ কাজটা না করলে এখন চা এবং পরে ভাত পাওয়ার সম্ভাবনাই থাকবে না। এতেও মিনিট পাঁচ সাত চলে যায়। তারপর বসে সে খাতা দেখতে। শিক্ষকের জীবনে এই খাতা দুরদৃষ্টের মতই নিত্যসহচর। অনতিক্রমনীয় ও অপ্রতিষেধনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা; ইস্কুলের হাফ্ইয়ার্লি, কোয়ার্টার্লি এবং য়্যানুয়াল; তারপর আছে মধ্যে মধ্যে মাসিক পরীক্ষা—সাপ্তাহিক হোমটাস্ক। খাতা ছাড়া শিক্ষকের জীবনে আছে কি? খাতার অন্তহীন স্রোত—কুৎসিত হাতের লেখা এবং ভুলে ভর্তি—বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে, প্রতিটি পংক্তিতে। তবু দেখতেই হবে! এর হাত থেকে রেহাই নেই, এড়ানো যাবে না।

পৌনে ছটা নাগাদ উনুন ধরে গেলে সে চায়ের জল চাপিয়ে কৃষ্ণাকে ডেকে দেয়। অবশ্য এক এক দিন ছোট খোকাটার উৎপাতে কৃষ্ণা আগেই উঠে পড়ে। সেইদিন ঐ দুটো মিনিট তবু বাঁচে। এরপর শুধু চা এক কাপ খেয়ে ছোটে সে পটুয়াটোলা, সেখানে দুটি ছাত্র একই বাড়িতে। সুতরাং দেড় ঘণ্টার কম হয় না। সওয়া ছটা থেকে পৌনে আটটা সেখানেই বেজে যায়, কোন-কোন দিন আটটা। তারপর বাগবাজারে পাড়ি—পৌছতে পৌছতে সাড়ে আট। দশটা পর্যন্ত পড়ানো উচিত কিন্তু পৌনে দশটাতেই উঠ্তে হয়—সেখান থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এসে স্নান ক'রে খেয়ে পৌনে এগারোটায় ক্লাসে আসা এক দুশ্চর তপস্যা। সে সময় আবার অফিস টাইম—বাস্ ধরাই দায়, কোনমতে ঝুল্তে ঝুল্তে আসারও যেদিন সুযোগ মেলে না, সেদিন দু-পাঁচ মিনিট দেরীই হয়ে যায়। ওর প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস,—তাও নাইন। হেড্মাষ্টার অপ্রসন্ন মুখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনাদের সুবিধের জন্যেই সাড়ে দশটা থেকে পৌনে এগারটা করলুম তবু আপনারা ঠিক সময়ে আসে না। ছেলেরা মাইনে দিয়ে ইস্কুলে পড়ে—তাছাড়া ঐত মোটে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক'রে পিরীয়ড, ওরা এই সময়টুকু পুরো পড়বে ওদের গার্জেনরা এটুকু ত এক্স্পেক্ট করে!'

তেতে বড়ির মতই বকুনিটুকু গলাধঃকরণ ক'রে কোনমতে খাতায় একটা সই ক'রে সে ছোটে তেতালার সিঁড়ি ভেঙ্গে ক্লাস নাইনে(এ)তে। হাঁপাতে হাঁপাতে ও ঘামতে ঘামতে এসে পাখার নীচে বসে সুস্থ হ'তেই আরও পাঁচটা মিনিট কেটে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই ভোর থেকে উঠে এই প্রথম একটু অবসর মেলে।

সুতরাং—সকালে বাজার করার সময় হয় না। বিকেলে ইস্কুলের পরে ইস্কুল বাড়িতেই একটা কোচিং নেয়। সেটা শেষ হয় সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছটায়। এরপর আর একটি মাত্র টিউশ্যনী আছে—সেখানকার ছাত্রটি সওয়া সাতটার আগে বাড়ি ফেরে না।—এই ঘণ্টা দেড়েক সময় হাতে পায় ও দিনে রাতে! এই সময়টাতেই কনক সংসারের দিকে মন দেয়। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বাজার করে—তারপর কয়লা ডাল মশলা এ সব সংগ্রহ ক'রে বাড়ি ফিরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার ও চা খায় বেশ ধীরে-সুস্থেই। আহার্যের চেয়ে অবসরটাই যেন উপভোগ করে সে। ছেলেমেয়েরা ঘিরে বসে, ছোটটা কোলেই থাকে। ওর পরোটায় ভাগ বসায় সবাই। জলখাবার খেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক আলাপ সেরে পড়াতে যায় আবার। সেটা এই পাড়াতেই, যাতায়াতে বিশেষ সময় যায় না। নটা নাগাদ যখন ফেরে তখন এক-গাদা প্রুফ অপেক্ষা করে ওর জন্য। এক বিখ্যাত প্রকাশকের প্রুফ দেখে সে। অর্থ-পুস্তক ও পাঠ্য-পুস্তক দুয়েরই প্রুফ দেখতে হয়। সন্ধ্যার পর ওদের লোক এসে দিয়ে যায়—যত রাতই হোক্ সেগুলো দেখে রাখতে হয়—তারপর দিন সকালে এসে সেই লোকটিই আবার দেখা-প্রুফ চেয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু গত কাল সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেল একটা ব্যাপারে। খবর এল ভগ্নিপতির অসুখ—খুব বাড়াবাড়ি। সামান্য কী একটু জ্বর হয়েছিল—ডাক্তারে বুঝি কি ইঞ্জেকশন্ দেয়, তার ফলে হিতে বিপরীত ঘটেছে, বাঁচার আশাই নাকি কম। ইস্কুল থেকে ফিরে সেই খবর পেয়েই ছুটেছিল সেখানে—রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরেছে; রাত্রের টিউশ্যনী ত হয়ই নি—তা না হোক্—বাজারও হয়নি। আর সে কথাটা মনেও ছিল না। রাত্রে প্রুফ দেখা হয়নি। সকালে উঠে জরুরী প্রুফগুলো নিয়েই বসেছিল; চায়ের জল চাপিয়ে নিত্যকার অভ্যাস-মত স্ত্রীকে ডেকে আবার প্রুফে মন দিয়েছে, এমন সময় কৃষ্ণা প্রচণ্ড শব্দে একটা হাই তুলে উঠে বসে বললে, 'তা হ্যাঁ গা—বাজারের কি হবে?'

'বাজার?' খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে কনক, প্রশ্নের ফলে মুখের যে ফাঁকটা—সেটা ফাঁক হয়েই থাকে।

'ওমা তা বাজার করতে হবে না? রাঁধব কি?'

'বাজার কখন যাবো।...ডাল টাল নেই?'

'শুধু এক মুঠো ডাল পড়ে আছে—তারপর?'

'খিচুড়ী ক'রে নাও—'

'সে রকম ডাল নেই। তাছাড়া নিলক্ষ্যে খিচুড়ী কি ক'রে খাবে? ...পরশু আলু আনোনি, ঘরে একটা আলুও নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কনক বললে, 'ওপরের রঞ্জুকে বললে—'

'রঞ্জু ত নেই, সে মামার বাড়ী গেছে পাঁচ ছ' দিন। ওরাই একে-ওকে ধরে বাজার করাচ্ছে।'

'অ।' গলার স্বর কেমন যেন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে আসে কনকের, 'তা দাও থলিটা আর সিকে-পাঁচেক পয়সা—দেখি নিদেন একটু আলু আর মাছ যদি কিনে দিয়ে যেতে পারি।'

কৃষ্ণা আশ্বাস দেয়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওতেই হবে। যেমন ক'রে হোক চালিয়ে নেব। একটু বার্লি এনো কিন্তু, আর একটা পাতি লেবু—হ্যাঁ—এধারে ত ঘর খালি, ছেলেদের কী খাওয়াবো? পাউরুটি একটা যাবার সময় কিনে দিয়ে যেতে পারবে?'

প্রুফের অক্ষরগুলো যেন তাল পাকায় চোখের সামনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'এখন দয়া করে একটু চা দিতে পারো কি না ছাখো দিকি। আর ফরমাস বাড়িও না...'

কৃষ্ণা একটু ক্ষুব্ধই হ'ল। কলঘরের দিকে যেতে যেতে শুধু বলে গেল, 'ফরমাস সব আমার জন্যেই করি কিনা—'

কোনমতে চা খেয়ে জামাটা গলাতে গলাতেই দৌড়ল। কিন্তু মোড়ের মনোহারী দোকান তখনও খোলেনি—আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে রুটি মিলল। ফিরে এসে সেটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে যেতেও দশটা মিনিট অপব্যয়! এত কাণ্ড ক'রেও পটুয়াটোলায় পৌঁছে দেখলে ছাত্রদের তখনও খাবার খাওয়া হয়নি। অসহিষ্ণু ভাবে দশটি মিনিট বসে থাকার পর তাদের দেখা মিলল। বিপদের ওপর বিপদ—কর্তা স্বয়ং আজ এ ঘরেই এসে বসলেন খবরের কাগজ আর চায়ের কাপ নিয়ে, খুব তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করলেই ঘড়ির দিকে তাকাবেন।

তবু কনক পৌনে আটটাতেই উঠে পড়ল। অনাবশ্যক কৈফিয়তের সুরে বললে, 'আজ উঠি এখন, বাড়িতে অসুখ কিনা।'

নিমেষে খবরের কাগজ সরে গেল মুখ থেকে, কর্তা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, 'কী অসুখ, কার অসুখ, মাষ্টারমশাই ? কোন খারাপ অসুখ বিসুখ নয় তো ?'

অর্থাৎ আরও দুটি মিনিট অপব্যয়। বাজারে তেমনি ভীড় তখন, অন্যদিন সন্ধ্যাবেলা বাজার করে, ভীড়ের অভিজ্ঞতা কম। কোনমতে ধাক্কা খেয়ে গুঁতো খেয়ে আলু আর মাছ সংগ্রহ করার পর মনে পড়ল, আলু অন্য দিনের মতই নিয়েছে—মোটে দেড় পোয়া, তাতে দুবেলা কুলোবে না। তখন অগত্যা বেগুন, কুমড়ো, উচ্ছে—দু একটা আনাজ কিন্‌তে হ'ল। তারপর বার্লি, লেবু এসব ত আছেই—

এমনি ক'রে একরাশ বাজার নিয়ে পড়ি কি মরি ছুটতে ছুটতে যখন বাড়ি এসে পৌছেচে তখন সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে যাচ্ছে, জামাটা লেপ্‌টে গেছে গায়ের সঙ্গে—অবস্থা শোচনীয়। তবু ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজে গেছে—বাগবাজার যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই পা যেন ভেরে পড়ছে। অথচ যেতেই হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণা সংবাদটি দিলে, 'ওগো তোমার একটা চিঠি আছে। কৈ—কোথায় ফেল্‌লুম আবার—ও, এই যে!' নিজেই দেয় এগিয়ে।

খামে চিঠি। বড় চৌকো নীল খাম, দামী। এরকম খামে ত কেউ তাকে চিঠি দেয় না। ওরই মধ্যে একটু অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে কনক। এ আবার কে দিলে ? এমন খাম যেন কত কাল দেখেনি ও। মনেও পড়ে না।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় হাতের লেখাটা যেন খুব অপরিচিত নয়। কোথায় যেন কার লেখা সে দেখেছিল এর আগে, অনেকটা এই রকম। বিস্মৃতির পরপার থেকে যেন অশরীরী একটা স্পর্শ পায় ওর চেতনা।

কিন্তু কাব্য করবার সময় কৈ ?

চিঠিখানা পকেটে ফেলে সে আবার ছোটে···এবার বাগবাজার। উর্ধ্বশ্বাসেই ছোটে একরকম—

কৃষ্ণা কড়ায় ফোড়ন দিতে দিতে প্রশ্ন করে, 'কার চিঠি গো ?'

'কে জানে, আমার কি এখন পড়বার সময় আছে ?'

যেতে যেতেই উত্তর দেয় সে।

এর পর চিঠিটা পড়বার আর সময় হয় না—মনেও থাকে না। বাগবাজার

থেকে ফিরতেই পৌনে এগারটা বেজে যায়, স্নান না ক'রেও দশটি মিনিট লেট, সেদিন আবার সন্ধ্যাতেও সময় ছিল না। কোচিং ক'রে ভগ্নীপতির খবর নিতে গিয়েছিল, সেখান থেকে বাজার ক'রে নিয়ে ফিরতেই রাত্রের টিউশনীর সময় হয়ে গেল। একেবারে মনে পড়ল সেই ছাত্রকে একটা অঙ্ক কষতে দিয়ে যখন অন্য-মনস্ক ভাবে পকেটে হাত দিয়েছে তখন—খামখানা হাতে খড় খড় করে উঠ্‌ল।

কী এটা? চিঠি? ও, তাইত। সকালের সেই চিঠিখানা। মনে পড়ল ওর। কৌতূহলও হ'ল বৈকি। একান্ত অনবসরে মানব মনের এই প্রবল বৃত্তিটা চাপা পড়েছিল এই মাত্র,—এখন প্রবলতর হয়ে উঠল।

এখানেই খুলবে নাকি? ছাত্রের সামনে? দোষ কি? তাছাড়া ও ত অঙ্ক কষছে। সে খামখানা খুলে ফেলল।

ভেতরেও দামী চিঠির কাগজ। খামের মতই নীল রঙ্। কোন সম্বোধনও নেই, স্বাক্ষরও নেই। মেয়েলি হাতের লেখা। অল্প কয়েক ছত্র।

"আপনার যা চেহারা হয়েছে তাতে চিনতে পারবার কথা নয়—তবু দূর থেকে ট্রামে ক'রে যেতে দেখেই সেদিন চিনতে পেরেছি। তারপর বিভ্রাট বাধল ঠিকানা নিয়ে। এই তিন দিন ধরে প্রায় চল্লিশটা টেলিফোন্ ক'রে ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। একবার আসুন না। সত্যি কতদিন দেখিনি বলুন তো। প্রায় চার বছর হতে চলল। একবারটি আসুন—যে কোন দিন যে কোন সময়, লক্ষ্মীটি!"

আর সংশয় নেই। অনুমানেরও প্রয়োজন নেই। জীবনে তিন চার খানা মাত্র চিঠি পেয়েছে সে অসীমার কাছ থেকে—তবু হাতের লেখা ভুলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। নিহাত জীবনের এই ঘূর্ণাবর্তে বহুদূরে সরে এসেছে বলে তাই—

অসীমারই চিঠি। ঠিক তেমনি সংক্ষিপ্ত—অথচ বিপুল সম্ভাবনায় পূর্ণ। সম্বোধনও নেই—স্বাক্ষরও নেই। অসীমা কোনদিনই করে না তার চিঠিতে। একদিন কারণটা খুলে বলেছিল সে কথায় কথায়—'কী বলে সম্বোধন করবো বলুন ত! আমি ত ভেবে পাই না। যা ব'লে পাঠ লিখতে ইচ্ছা করে তা প্রকাশ্যে লেখা বে-আইনি। স্বাক্ষরের আগেই বা কি লিখব? আমি যে আপনার কে তা আজও জানি না।···না, ওসব হাঙ্গামে দরকার নেই। তার চেয়ে এই ভাল। কি পাঠ যে লিখতে চাই তা ত আপনি জানেন অন্ততঃ। বুঝে নেবেন।' এই ক'টি কথায় সেদিন কনকের চিত্ত কী উদ্বেলিত হয়েই না উঠেছিল। অলিখিত পাঠের শব্দসমষ্টি মনের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে যে আনন্দ সে পেয়েছিল আজও তার স্মৃতি ওর সমস্ত স্নায়ুকে মাতাল ক'রে তোলে।

বহুদিনের কথা কি ?

মনে হচ্ছে যেন হাজার বছর পার হয়ে এসেছে কনক সে-সব দিন থেকে।

আচ্ছা, অসীমার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় হয়েছিল যেন কবে ?···হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি ! বালিগঞ্জে তখন ওরা থাকে—পাশের বড় বাড়িটায় ভাড়া এল অসীমারা। ওর বাবা কোন্ যেন-এক নেটিভ্ স্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, সেখানেই থাকতেন। এখন মহারাজার কলকাতার ব্যবসা দেখবার দরকার হ'তে এখানে বদলি হয়েছিলেন। বড়লোকদের ব্যাপার—ওদের প্রথমটা সঙ্কোচই ছিল কিন্তু অসীমার মা নিজে থেকে একদিন ওদের বাড়ি বেড়াতে এলেন আর তার অমায়িক ব্যবহারে সহজেই সংশয়ের বেড়াটা গেল ভেঙ্গে।

কনক তখন ক্লাস নাইন-এ পড়ে। অসীমা আরও ছোট। তবু অসীমার সঙ্গে কেমন ক'রে ওর খুব ভাব হয়ে গেল। প্রথম প্রথম অসীমা আসত গল্প শুনতে ও গল্প করতে। কিন্তু কিছুদিন পরেই কি খেয়াল হ'ল, বই-খাতা নিয়ে ওর ঘরে এসে বসল। বললে, 'আপনার কাছে পড়ব কনকদা।' ওর মাও সস্নেহে বললেন, 'পাগলী মেয়ে ! তা পড়ুক না বাবা, এমনি ত বই ছুঁতেই চায় না। যদি তোমার এখানে বসে একটু পড়ে ত পড়ুক না !·· অবিশ্যি তোমার যদি ক্ষতি হয় ত সে আলাদা কথা—'

'না না—ক্ষতি আর কি ! কতটুকুই বা পড়ে ও!' গলায় জোর দিয়ে বলেছিলেন কনকের মা।

এর পর বছরখানেক পরেই সেই মহারাজার নিজের একটা বাড়ি বিনাভাড়ায় পেয়ে অসীমার বাবা পার্ক স্ট্রীটে উঠে গেলেন। মনে হ'ল সম্পর্কেরও বুঝি এই-খানে শেষ হয়ে গেল। কারণ কনকরাও তার মাস-কতক পরে শ্যামবাজার অঞ্চলে চলে এল।

কিন্তু সম্পর্ক অত সহজে শেষ হ'ল না।

তখন বোধ হয় কনক বি-এ পড়ছে। ফোর্থ ইয়ার। হঠাৎ একদিন চাপরাশীর হাতে অসীমার বাবার একখানা চিঠি এল, 'বাবা কনক, সময়মত একবার আসবে ?'

পার্ক স্ট্রীটেরই ঠিকানা। সেইখানেই আছে ওরা।

প্রথমটায় মনে করতে পারেনি, তারপরই অসীমার কথা মনে পড়ে নামটা চিন্‌তে পারে সে। ফ্রক্ পরা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি। সর্বদাই যেন কী এক কৌতুকের হাসি লেগে থাকে মুখে। ভারি মিষ্টি স্বভাব।

পরের দিনই গেল কনক দেখা করতে। অসীমার মা ইতিমধ্যে মারা গেছেন।

অসীমার বাবা ওকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমরা মাঝে দু'বছর এখানে ছিলুম না, ফিরে এসে পর্যন্ত অসীমা তাড়া দিচ্ছে তোমাদের খোঁজ করবার জন্য। তা তোমরা কোথায় উঠে গেছ—কিছুই জানি না। শেষে ঐ পাগলীই খুঁজে খুঁজে বার করেছে তোমার পাত্তা। ঐ যে—'

অসীমা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। এ কী! এ কোন্ অসীমা?

বিস্ময়ে কনকের মুখ দিয়ে কথা সরে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে। যেন ভেঙ্গে চুরে নতুন ক'রে গড়েছে ওকে। এই সুন্দরী তন্বী কিশোরী কি সেদিনকার সেই ফ্রক্-পরা ছোট্ট মেয়েটি?...

মুখের কৌতুক-হাসির রেখাটি শুধু তেমনি আছে। তাইতেই চিনতে পারে কনক।

প্রয়োজনটা খুলে বলেন জ্ঞানবাবু। মেয়ে এবার ম্যাট্রিক পাস করেছে। আরও পড়বে কিন্তু কলেজের পড়া সব ওর মাথায় ঢোকে না। একজন লোক চাই একটু সাহায্য করাব। কনক যদি একটু—

কনক আরও অবাক। সে বলে, 'কিন্তু আমি কি পারব? কীই বা জানি? অন্য কোন প্রোফেসর বা শিক্ষক যদি—'

জ্ঞানবাবু ঘাড় নাড়েন, 'না। পাগলী তাতে রাজী নয়, মাষ্টার রাখতে দেবে না। তুমি যদি একটু সাহায্য করো ত হয়। তোমার মত বোঝাতে নাকি কেউ পারে না। কিন্তু তাও ওর সর্ত কি জানো? রোজ এলে চলবে না, তোমাকে কিছু টাকাও দিতে পারব না—বেগার দিতে হবে। যত বলি যে তারও ত সময়ের দাম আছে, কিছু না দিলে চলবে কেন? তত ওর সেই এক কথা—তাহ'লে দরকার নেই, যা পারব তাই করব, নিজে নিজেই। ওঁর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক আন্‌তে চাই না—'

চোখের মধ্যে কি সুগভীর বিশ্বাস ও জোর ছিল অসীমার—কনকের সাধ্য ছিল না অস্বীকার করার। কনক যেতে আরম্ভ করলে নিয়মিত। অবশ্য প্রতিদিন নয়—অসীমা সে বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, সপ্তাহে দু'দিনের বেশি আসা চলবে না। অদ্ভুত, বিচিত্র মেয়ে। রহস্যময় ওর মনের গতি-প্রকৃতি।

তারপর দুটো বছর কী স্বপ্নে যে কেটেছিল কনকের!

মুখের ভাষায় প্রণয়ের কোন প্রকাশ্য ইঙ্গিত উচ্চারিত হয় নি—চিঠির ছত্রেও না। তবু কারুর মনের কথাই কারুর অগোচর ছিল না।

আশা?

হ্যাঁ—আশাও কিছু জেগেছিল বৈকি কনকের মনে। না জাগবার কারণ কি ? কনক সুশ্রী দেখতে, শিক্ষিত সচ্চরিত্র ছেলে। মধ্যবিত্ত ? তা হোক্ না—জ্ঞান বাবুরও অর্থের অভাব নেই। ঐ একমাত্র মেয়ে। আর একটি ছেলে ওঁর অবশ্য আছে, তবু এই মেয়েটিই যে ওঁর প্রাণ তা কে'না জানে ?

এমন সময় এম-এ পরীক্ষার মাত্র কয়েক দিন আগে হঠাৎ কথাটা শুনল ও অসীমার মুখে, 'আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি, মহারাজা ডেকেছেন!'

'কদিনের জন্যে ?' বিবর্ণমুখে প্রশ্ন করেছিল কনক।

'তার ঠিক নেই। বাবারও কিছু মতলব আছে। মহারাজার ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান। বিলেত থেকে ফিরে এসেছে সদ্য, খুব নাকি ভাল ছেলে। সেই জন্যই কিছুদিন ওখানে গিয়ে থাকবেন, নইলে হয়ত এখন না গেলেও চলত।'

খুবই সহজভাবে কথাগুলো বলে অসীমা। চরম নিস্পৃহতা ও অনাসক্তি ওর কণ্ঠে। যেন আর কার কথা।

কনকের মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি কিছুকাল, তারপর শুষ্ক ওষ্ঠে জিভ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আর তুমি! তোমার মত কি ?'

'আমার মতের কথা ত উঠছে না। বাবার যা ইচ্ছা তাই বলছি।'

'বাবা যদি এ বিয়ে ঠিক করেন ?'

'বাবার কথা শোনাই ত অভ্যাস। বাবার চেয়ে কি বেশী বুঝি আমি। আমার কল্যাণই ত তিনি চান।'

মুখে কি কৌতুকের হাসি ছিল সেদিন ? না ওটা ওর চিরাভ্যস্ত মুখভঙ্গী! অত বিচার করেনি কনক, বিচারের মত মনের স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থাও ছিল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল শুধু—আর যায়নি।

এম-এ-তে কনক ফার্স্ট ক্লাস পায়নি, সেকেণ্ড ক্লাসও না। কোন মতে পাস যে করেছে সে, করতে যে পেরেছে, তাইতেই ও দস্তুরমত বিস্মিত। তার ফলে রিসার্চ স্কলারশিপ বা অধ্যাপনা কোনটারই আশা রইল না। অথচ সংসারের যা অবস্থা—অপেক্ষা করারও সময় ছিল না। যে পথ খোলা ছিল তাইতেই ও ঢুকেছে। ইস্কুল মাষ্টারী।

তারপর ?

যথানিয়মেই জীবন আবর্তিত হয়েছে ওর। বিয়ে ও করতে চায়নি এটা ঠিক—কিন্তু সেটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ ব'লেই মনে ক'রে আপত্তিটা কেউ গ্রাহ্য

করেনি। বাবা মেয়ে দেখেছেন, সম্বন্ধ ঠিক করেছেন—বিয়েও হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বাবার শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে মা সমস্ত আপত্তি ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

খুব একটা কিছু আপত্তিরও কারণ খুঁজে পায়নি কনক।

কেন? কিসের জন্য অপেক্ষা করবে ও? কার জন্যে?…

এর পর গত তিন চার বছরে যেন কত কি ওলট্ পালট্ হয়ে গেছে। কনকের মনে হয় ওর পরমায়ুর চল্লিশটি বছর কেটে গেছে। বাবা মারা গেছেন, দাদা ভাল সরকারী চাকরী পেয়ে বিদেশে চলে গেছেন—একটা গোটা সংসার ওর মাথায় এসে পড়েছে। স্ত্রী কৃষ্ণা বিষম আনাড়ি, গুছিয়ে সংসার করতে পারেনা কোন দিনই। তার ওপর পর পর দুটি সন্তান। যুদ্ধের বাজারে নিচের তলার ফ্ল্যাটও সত্তর টাকার কমে হয় না। মাকে পাঠাতে হয় কিছু—কিছু বিধবা বোনকে। অর্থাৎ মাস গেলে সাড়ে তিনশ' টাকা খরচা, খুব কম হ'লেও—

ছাত্রের ডাকে চমক ভাঙ্গে। অতীতের আকাশ থেকে বর্তমানের মাটিতে নেমে আসে কনক।

অঙ্ক? ও—হ্যাঁ, তাইত্!

দ্রুত কতকগুলো অঙ্ক কষিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে সে।

ছাত্র প্রশ্ন করে, 'হিষ্ট্রীর টাস্কটা দেখবেন স্যার?'

'আজ থাক্ অনিল, বড্ড মাথাটা ধরেছে—'

বাইরে এসেও খুব খানিকটা হন্ হন্ ক'রে হাঁটে,—তারপর একেবারে মোড়ের মাথায় এসে থম্‌কে দাঁড়ায়।

একবার যাবে নাকি?

এখনই?

এত রাত্রে?

তা ছাড়া সময়ই বা কৈ? মনকে বোঝায় কনক—এই ত সবে রাত ন-টা। কল্‌কাতার হিসেবে এমন আর রাত কি? সকালে ওর সময় নেই মোটে—এক সেই রবিবার ভিন্ন আর অবসর পাওয়া যাবে না।

না, অতদিন অপেক্ষা করতে পারবে না সে। কনকের সারা অন্তরটা যেন উদ্বেল হয়ে ওঠে।

কিন্তু এমন ভাবে ছুটে যাওয়ার কি কোন অর্থ আছে? প্রয়োজন?

সংশয় দেখা দেয় বৈকি। উচিত অনুচিতেরও প্রশ্ন ওঠে।

তবে তাতে ওর গতি বাধা পায় না। সমস্ত সংশয়েরও ওপর হৃদয়বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। ওকে দুর্নিবার এবং অপ্রতিহতগতিতে ঠেলে সেই দিকে—যে দিকে ওর কৈশোর এবং যৌবনের মানসী ওর পথ চেয়ে আছে—

দক্ষিণের কী একটা পাড়ার ঠিকানা। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে বাসে চাপে সে। একবার মনস্থির করার পর আর সংশয় থাকে না, থাকে শুধু একটা ব্যগ্র ব্যাকুলতা—মনে হয় পকেটে টাকা থাকলে ও ট্যাক্সী করত।

অসীমা তেম্‌নিই আছে। তেমনি আশ্চর্য সুন্দরী, তেমনি মৃদু কৌতুকের হাসি ওর ওষ্ঠ-প্রান্তে। তেম্‌নি শান্ত, সংযত ভঙ্গী।

অথচ অভ্যর্থনার সময় যে ঐকান্তিকতা ফুটে ওঠে ওর দৃষ্টিতে, চিত্তবৃত্তিকে কষ্টে দমন করার যে সব চিহ্ন প্রকাশ পায় ওর সমস্ত আচরণে, তা চিনতে ভুল হয় না কনকের।

চোখের চাহনিতে অসীমার কী মিনতি, কী পূজা—

ইস্কুল মাষ্টারীর আবরণ গা থেকে খসে পড়ে যায়, অকালবার্ধক্য লোপ পায়—চিরন্তন তরুণ মাথা তোলে কনকের মধ্যে—খুশীতে ঝল্‌মলিয়ে ওঠে, বুদ্ধি ও যৌবনের একটা ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরিত হয় যেন ওর সর্বাঙ্গ থেকে।…

নিহাৎ ব্যক্তিগত কথাবার্তাও কিছু হয়। জ্ঞানবাবু মারা গেছেন। ওরা এই বাড়িটা কিনেছে। এখানে অসীমা আর তার ভাই আছে শুধু। ভাই বি-এ পড়ছে।

প্রশ্নটা বার-কতক ঠোঁটের কাছে এসে ফিরে যায়—শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে ক'রে ফেলে, 'তো… তোমার বিয়ে হয়নি?'

অসীমা সহজ ভাবেই বলে, 'না।'

'কেন—করোনি?'

'না।'

'কিন্তু বিয়ে হবার ত কথা ছিল—'

কৈ, তা ত জানি না।'

'সে কি! তুমিই ত বলেছিলে।'

'না। তা ত বলিনি। শুধু বলেছিলুম যে বাবার মতলব তাই। কিন্তু সারা পৃথিবী ত তাঁর মতে চলে না।'

'তিনি—মানে মহারাজকুমার কি রাজী হন্‌নি ?'

'হ্যাঁ, তিনিও রাজী ছিলেন, তবে কথাটা পাকাপাকি হবার আগেই বাবা মারা গেলেন।'

'তাতে কি হ'ল ? তিনি আবার পেছিয়ে গেলেন ?'

'না। আমার আর বিয়ে করার প্রয়োজন রইল না। বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিনই তাঁর ইচ্ছার মূল্য। এখন আমি আমার ইচ্ছামতই চলব এইটেই ত স্বাভাবিক।'

খুব শান্ত, খুব সহজ ভাবেই কথাগুলো বলে অসীমা। যেমন সেদিন বলেছিল। তেম্‌নি নিস্পৃহতা, তেমনি নিরাসক্তি ওর কণ্ঠে।

কনকের কি আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে ?

কি নির্বোধ, কী একান্ত রকমের অন্ধ !

বিহ্বল হয়ে বসে থাকে সে। অসীমার দিকেও চাইতে পারে না।

অবশেষে এক সময় এগারোটা বাজার শব্দে ওর চৈতন্য হয়।

'ইস্‌ এগারোটা বেজে গেল ? মাই গড—এতরাত্রে কি বাস্‌ পাবো ?'

'তার দরকার হবে না। গাড়ী বার করতে বলেছি, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

অসীমার নিজের তরফ থেকে একটাও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে না। হয়ত সবই জানে—বিয়ে, ছেলেপুলে, সবকথাই—কিম্বা জানে না। শুধু বলে, 'আবার আসবেন ত ? কবে ?··· একদিন ছুটির দিনে আসুন, খুব খানিকটা কোথাও ঘুরে আসি।'

'নিশ্চয় আসব। শনিবার এসে বলে যাবো, এ রবিবারে যেতে পারব কিনা।'

মূল্যবান গাড়ী ফাঁকা রাস্তা পেয়ে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে যেন হাওয়ায় পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে যায়। কিন্তু তার চেয়েও হাল্‌কা ঠেকে ওর নিজেকে।

সত্যি। এই ত মোটে আটাশ বছর বয়স ওর।

জীবনকে ভোগ করার, দুর্ভাগ্যকে ব্যর্থ করার এই ত সময়।

না, বর্তমানকে ও অস্বীকার করবে। এখনও ওর পথ চেয়ে সুন্দরী মেয়ে বসে থাকে, ওর আগমনের প্রহর গোণে।

জীবনে কিছু রস আছে বৈ কি !

কোন নীতি মানবে না ও। কোন কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবে না।...

বাড়িতে পৌঁছে দেখে কৃষ্ণা একেবারে রাস্তার ওপর বিবর্ণ পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে। ওর চোখে জল।

'এত রাত কেন গো?'

'এক জায়গায় গিয়েছিলুম, এক বন্ধুর অসুখ, তাই।'

অকারণে মিথ্যা কৈফিয়ৎ দেয়। অসংলগ্নভাবে কথাগুলো বলে ও।

কৃষ্ণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'তবু ভাল। এমন ভাবনা হয়েছিল! কেউ নেই যে খবর নিই। কোথায়ই বা নেব। এ ধারে ছোট খোকাটার কি বিশ্রী জ্বর!'

'জ্বর?' চম্‌কে ওঠে কনক, 'কত জ্বর?'

'কি ক'রে জানব, থার্মোমিটার আছে কি? তবে গা পুড়ে যাচ্ছে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে কনক, 'কি হবে, ডাক্তার ডাকব?'

'আজই ত জ্বর এসেছে—ডাক্তার ডেকে আর কি হবে? চলো তুমি বিশ্রাম করবে চলো।'

নিঃশব্দে এসে মুখ হাত ধোয় কনক, ছেলেটার গায়ে হাত দিয়ে দেখে সত্যিই গা পুড়ে যাচ্ছে।

'খাবার দিই? না একটু বসবে?'

'আজ—আজ আর খাবো না কিছু, ওখানে একটু খেয়েছি, এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খেয়ে নাও—'

কৃষ্ণা রান্নাঘরে যেতে যেতে বলে গেল, 'ওরা আজও এক তাড়া প্রুফ দিয়ে গেছে, বলে গেছে যে কালকের প্রুফগুলো ফেরৎ না পাওয়ায় খুব ক্ষতি হয়েছে। কাল প্রেস বসে থাকবে সারা দিন—সবগুলো কাল সকালে পেলে ভাল হয়।'

তা বটে। ওদের নিজেদের প্রেস, সব কাজ হিসেবের ওপর চলে। সব টাইপ জোড়া হয়ে থাকলে নতুন কম্পোজই বা করে কী ক'রে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কনক প্রুফ দেখতে বসে। ছোট আট-পয়েণ্ট টাইপের প্রুফ, দেখতে দেখতে চোখ টনটন করে, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখার ফলে শিরদাঁড়া ব্যথা করতে থাকে। তবু শুতে ভরসা হয় না—দেখতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। এই যখন জীবিকা—অবহেলা করা চলবে না।

অনেক রাত্রে কাজ শেষ করে উঠ্‌তে গিয়ে হঠাৎ সামনের আয়নাটায় নজর পড়ল। ওর বিয়ের আয়না-বসানো আলমারী, এম-এ পাশ করার পুরস্কার।·· দুই চোখের কোণে কালি, দুই রগ এবং গাল ঢুকে গেছে—অনেকটা বুড়ো মানুষের মত। রোগা ত হয়েছেই—একটু যেন কুঁজোও হয়ে পড়েছে।

আটাশ বছর? মোটে আটাশ বছর বয়স!

বাজে কথা।

ঐ দর্পণে সমস্ত ছবিটা ফুটে উঠেছে—শুধু ত দেহটাই নয়, বিপুল সংগ্রামের ইতিহাস সুদ্ধ, প্রতিদিনের পৃষ্ঠপট আঁকা ওর সমগ্র জীবনেরই ছায়া।

না। যৌবন ওর আর নেই, মিছে কথা। কল্পনা-বিলাসেরও সময় নেই।

ওসব মিথ্যা। সত্য হচ্ছে ওর তিনটে টিউশ্যনী, কোচিং আর এই প্রুফ দেখা। ছোটছেলেটার জ্বর—বোধহয় কাল ঝি আসবে না, এই সবই জীবনের সত্য।

বহুদূর, বহু পিছনে ফেলে রেখে এসেছে ও নিজের যৌবনস্বপ্নকে।

কনক বিছানায় শুয়ে অসীমার কথা ভাবতে চেষ্টা করে—কিন্তু অপরিসীম ক্লান্তির মধ্যে তার স্মৃতি ধুয়ে মুছে কোথায় মিলিয়ে যায় অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হয়ে।···

সাধু দর্শন

কদিনে রাঁচি শহর চষে ফেলেছিলাম, দেখবার মত যা কিছু প্রায় সবই দেখা হয়ে গিয়েছে সুতরাং ঐটুকু খুঁত রেখে গেলেও এমন কিছু ক্ষতি হ'ত না। অর্থাৎ এ নিয়ে মন খুঁৎ খুঁৎ করার কথা নয়।

মানে, জোনা ফল্‌স্‌টা দেখা হয় নি। এখন এটার নাম হয়েছে গৌতম ধারা, এবং শেঠ বিরলারা এক মন্দির ও ধর্মশালা বানিয়ে এক শিব মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন—ভগবান তথাগতেরও দু-একটি মূর্তি পথে ঘাটে পড়ে আছে। একটা তীর্থের ছাপ দেওয়ার ষড়যন্ত্র বোধ হয় আছে। কিন্তু বিলিতি আমলে ওটা শুধু ছিল 'ফল্‌স্‌'—সোজাসুজি জলপ্রপাত।

যা বলছিলুম, হুড্রু হয়েছে, রাজরোপ্পায় ছিন্নমস্তা দেখা হয়েছে—জোনা না দেখলে কোন ক্ষতি-বোধই করতুম না। কিন্তু দৈবের যোগাযোগে, হঠাৎ কাকাবাবুর বন্ধু স্থানীয় পুলিশ সাহেব গাড়ীখানা দিতে চাইলেন এবং আমরা যাঁদের বাড়ি অতিথি হয়েছিলাম, সেই রমানাথ বাবুর ছেলে নন্দ এসে খবর দিলে, 'শুন্‌ছি জোনাতে এক বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এসেছেন।'

ব্যস্‌। আর যায় কোথায়। মন স্থির ক'রে ফেললাম। মহাপুরুষ দেখবার শখ ছেলেবেলা থেকেই। সে জন্যে হরিদ্বারে ছুটে গেছি ভোলাগিরিকে দর্শন করব ব'লে, বৃন্দাবনে গেছি কেশবানন্দের খোঁজে, পুরীতে পাগল হরনাথ থেকে শুরু ক'রে লোকনাথের ন্যাংটা বাবা—বাদ দিইনি কাউকেই। কী পেয়েছি না পেয়েছি, তা জানি না, তবে দেখবার শখ্‌টা আজও যায় নি।

মা আপত্তি তুললেন, 'হ্যাঁরে আজই যাওয়া—কখন ফিরবি, কখন গোছগাছ করবি—'

'গাড়ীতে যাচ্ছি, বারোটার মধ্যেই ফিরব। আর যাওয়া ত সেই সন্ধ্যের সময়, দুটো বিছানা, পাঁচটা বাক্স গুছিয়ে নিতে কতক্ষণ লাগবে? সে তুমি ভেবো না মা।'

মেয়েদের বাদ দিয়ে যাওয়া হ'ল। সবসুদ্ধ আমরা জনা পাঁচেক পুরুষ মানুষই রওনা হলুম। বন্ধু ইন্দু সঙ্গে খাবার নিলেন একরাশ। ভাগ্নে মন্তু এবং ভাইপো রমু আছে, কাকাবাবু ত আছেনই। এঁদের সব কজনেরই রাঁচিতে এসে পর্যন্ত মুহুর্মুহু ক্ষিদে পাচ্ছে।

নতুন দামী গাড়ী এক ঘণ্টার আগেই জোনাতে পৌঁছে গেল। আমিই আগে আগে উৎসাহ সহকারে নেমে গেলাম। কিন্তু কোথায় সাধু আর কোথায়

কে! কাকস্য পরিবেদনা। নতুন গরম পড়েছে বলে ভ্রমণার্থীর সংখ্যাও কম—একটা যাত্রী পর্যন্ত কোথাও দেখা গেল না। যারা জঙ্গলে কাঠের সন্ধানে আসে তারাও এখনও কেউ এদিকে দেখা দেয়নি। নির্জন থম্‌থম্‌ করছে সমস্ত উপত্যকাটা!

কাকাবাবু খুব ঠাট্টা করলেন, 'কৈ হে, তোমার সাধু বাবা কৈ? এ যে সব ফাঁকা!'

'তাইত দেখছি।'

দমে গেলাম খুবই। নন্দটার দেখ্‌ছি আগাগোড়াই 'গুল্‌' এর ব্যাপার। বাড়ি ফিরে ছোক্‌রাকে এক হাত নিতে হবে—এমন কটু কথা বলব যে ওর গুলন্দাজী বেরিয়ে যাবে—

খুব ছুটোছুটি ক'রে খানিকটা স্নান করা গেল। তারপর পাথরে বসে ইন্দু-বাবুর রুটি, মার্মালেড, খেজুর, বিস্কুট এবং ডিমসিদ্ধর সদ্ব্যবহার ক'রে কতকটা যেন মনের ক্ষোভ মিট্‌ল।

আহারাদির পর কাকাবাবু পাথরের ওপরই এলিয়ে পড়লেন, ইন্দুও তাই—**for a cool and refreshing smoke**—এটুকু নাকি চাই। ভাইপো ও ভাগ্নে ততক্ষণে পাথর বেয়ে ওপরে উঠেছে, একমাত্র আমিই বেকার। ধূমপানের মর্ম বুঝিনে, খাড়া পাথর বেয়ে ওপুরে ওঠবার সাহস নেই। অগত্যা ঘুরতে ঘুরতে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে জলধারা ধরেই এগিয়ে চললাম।

যাঁরা জোনা বা গৌতমধারা গেছেন তাঁরাই জানেন যে জলটা যেখানে পড়ে সেখানে অনেকটা সমান—উপত্যকার মত, তারপর খানিকটা গিয়েই—ছোট ছোট স্তরে নীচে নেমেছে জলটা। পাঁচ ছ ফুট ক'রে নীচে পড়েছে আবার খানিকটা ক'রে সমান, এমনি ক'রে ওধারে একটা বড় জঙ্গলের বেড়ে ঘা খেয়ে বেঁকে আবার এমনি ভাবে নাম্‌তে নাম্‌তে গেছে। অবশ্য এত বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে চার দিকে (Boulder) যে, এই ক্রমিক অধঃপতনটা খুব চট্‌ ক'রে নজরে পড়ে না।

আমি এই সব পাথরে পা দিয়ে দিয়েই ঘুরে ফিরে অন্যমনস্ক ভাবে এগোচ্ছি হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল। জলটা একটা জায়গায় এসে একটা বিস্তৃত বাঁকা পাথরের গা বেয়ে নীচে পড়ছে। সেখানে জল-রেখা—বোধ হয় আশি নব্বই ফিট চওড়া হবে—অন্তত বর্ষার সময় তাই হয়—কিন্তু পড়েছে একদিকে বোধহয় সাত আট ফুট নীচে অপর দিকে মাত্র ফুট-তিনেক। সেই যেদিকে ফুট-

তিনেক নিচু সেই দিকেই পাহাড়ের খাঁজে, জলের ধারায় গা ডুবিয়ে, যেন সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে আত্মগোপন ক'রে বসে আছে প্রায়-উলঙ্গ একটি মানুষ।

অবশ্য মানুষ তাকে বললাম সৌজন্যের খাতিরে। কিম্ভুত-কিমাকার জীব বলাই উচিত ছিল। মিশ কালো রং, বোধহয় এদিককার আদিবাসীই হবে, এক মাথা টোকা চুল, তার কতকগুলো ধুলোয় এবং তৈলহীনতায় জট্ পাকিয়েছে, কতকগুলি এখনও পাকায় নি। গোঁফ-দাড়ি আছে, খোঁচা খোঁচা—মানে অবসর পেলে মধ্যে মধ্যে কামানো হয়। সামান্য একটি ন্যাকড়া কৌপীনের মত জড়ানো, দ্বিতীয় কোন আচ্ছাদন নেই। পাথরে ঠেস্ দিয়ে পাহাড়ের কোণে যতটা সম্ভব গা মিশিয়ে বেশ নিস্পৃহ নিশ্চিন্ত ভাবে বসে আছে, ওর মাথাটা শুধু বাদ, বাকী সর্বাঙ্গ বেয়েই ওপরের জল গড়িয়ে পড়ছে—জল আর তার সঙ্গে শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে তার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, একটা কি কুটো চিবুতে চিবুতে দূরে আকাশের কোলে যেখানে পাহাড়ের বৃক্ষলতাচ্ছাদিত শ্যামল রেখাটা গিয়ে মিশেছে সেই দিকে চেয়ে আছে।

প্রথমটা ভেবেছিলাম পাগল। এখানকারই কোন আদিবাসী গ্রামের লোক —মাথা খারাপ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখন এখানে এসে বসেছে বাড়ির লোক হয়ত খবরই পায়নি।

তারপরই একটা সন্দেহ হ'ল—সেই সাধু বাবা নয়ত ?

বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ? ? ধ্যুস্ !

চলে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু একটু একটু ক'রে সন্দেহটাই প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগল। হ'তেও ত পারে। হয় ত এরই নামটা অম্‌নিভাবে রটেছে—তিলকে তাল করাই এদেশের লোকের স্বভাব !

আরও কয়েকটা পাথর ডিঙ্গিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এইবার লোকটা দিক্‌চক্ররেখা থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলে।

'এই, কেয়া দেখ্‌তা হ্যায় ?' ব'লে উঠল লোকটা। কিন্তু কণ্ঠস্বরে না উষ্মা, না বিরক্তি—না অনুরাগ কিছুই প্রকাশ পেল না। লোকটার সমস্ত ভঙ্গীর মতই কণ্ঠস্বরও নিরাসক্ত, নিস্পৃহ।

কিন্তু ঠিক পাগলের মতও ত মনে হয় না।

এবার হাত তুলে একটা নমস্কার করলাম, বললাম, 'আপকো দর্শনকে লিয়ে আয়া হ্যায় !'

'দর্শন ? ত দেখ্ লেও ফির্।'

তারপরই, বোধ হয় মুহূত-খানেক পরই অসহিষ্ণুভাবে ব'লে উঠ্‌ল, 'আব্‌ দর্শন ত হো গিয়া—ভাগো না !'

'বাবা', হাত জোড় ক'রে বললাম, 'জেরা ঈশ্বরকো বিভূতি—'

অকস্মাৎ হা-হা-হা-হা ক'রে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে হেসে উঠল লোকটা। চমকে উঠলাম সে হাসির শব্দে, সভয়ে—কারণ নির্জন নিস্তব্ধ গিরি উপত্যকায় সে হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বিকৃত বীভৎস একটা শব্দের সৃষ্টি করলে।

পাগলই বটে। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

লোকটা এবার কথা কইলে, 'ঈশ্বরকে বিভূতি? ত ই সব কেয়া হ্যায়? আঁখ নেহি হায় তেরা?'

আঙ্গুল দিয়ে চারিদিকের পাহাড় বন প্রান্তর জলপ্রপাত দেখিয়ে দিলে।

আলো ঝল্‌মল্‌ নির্মেঘ নির্মল আকাশের কোলে শ্যামল মেঘের মত পাহাড়গুলি আঁকা। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, লতায় লতায় কী অপূর্ব শোভা। কত নাম-না-জানা পাখী ডাকৃছে মিষ্ট মধুর স্বরে—তার সঙ্গে চেনা ডাকও আসছে কোকিল পাপিয়ার। মুক্তাধারার মত জল ঝরে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে—'যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার'—সেই জল পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে বিচিত্র শব্দ এবং স্রোতের সৃষ্টি করে দূরে কোন সবুজ ঢেউখেলানো শস্যক্ষেত্র এবং অরণ্যের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। লোকটার অঙ্গুলি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৃষ্টিও একবার সবগুলোর ওপর ঘুরে এল।

কথাটা ঠিকই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই অসীম এবং অপূর্ব প্রকাশই ঈশ্বরের বিভূতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ তাঁরই এক বিচিত্র রূপ কিন্তু ঠিক এ কথা ত আমি বোঝাতে চাইনি। সব গোলমাল ক'রে দিলে লোকটা।

থতমত খেয়ে বললাম, 'নেহি, নেহি, সো বিভূতি নেহি—'

'তব্‌? তব্‌ কেয়া?'

'আচ্ছা উসব ছোড় দিজিয়ে। আপকো যোগ বিভূতি জেরা দেখ্‌লাইয়ে না—'

'মেরা যোগ বভূতি? উস্‌মে তুম্‌হারা কেয়া কাম, আউর হামারা কেয়া ফয়দা, বাৎলাও তো!'

'মৈনে শুনা হ্যয় আপ বাক্‌সিদ্ধ যোগী হ্যয়।

'যো শুনা হ্যয় সো শুনা হ্যয়। হামারা কেয়া? যাও, ভাগো!'

এই ব'লে লোকটা হঠাৎ থু থু ক'রে থুথু দিতে লাগল।

না, বদ্ধ পাগল। এই সাধু সাজাটাই হ'ল পাগ্‌লামির ভান। আর এইতে অমনি সবাই ভুলে গেছে—

উঠে দাঁড়ালাম। যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েও আবার কি মনে হ'ল, প্রশ্ন করলাম, 'দীক্ষা দেগা বাবা?'

'দীক্‌ষা? দীক্‌ষা কেয়া হোগা? ঈশ্বর খাড়া হুয় তুমহারা সামনামে, উন্‌কো দেখো, সম্‌ঝো—দীক্‌ষা লেনেসে ফয়দা কেয়া? যাও, হট্‌ যাও, ঝুটে আদ্‌মী, দিক্‌ মৎ করো—'

থু-থু ক'রে লোকটা থুথু দিতে লাগল আবার।

তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে। কাকাবাবুকে সব কথা বলতে, তিনি বললেন, 'তুমিও যেমন! সাধু সাধু ক'রে তুমিই ক্ষেপে উঠলে দেখ্‌ছি।…একটা পাগল—মুণ্ডা কি হো—তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে!'

একটা ধোঁকা তবু ছিল মনের মধ্যে, 'লোকটা হিন্দী বললে যে! আদিবাসী হ'লে ত হিন্দী বলবে না।'

'শিখেছে। হিন্দুস্থানীর অভাব আছে এ দেশে?'

কাকাবাবু উড়িয়েই দিলেন কথাটা।

এর কয়েকমাস পরে শুনলাম নরেশবাবুদের সেই অতি বিখ্যাত গুরু এসেছেন কলকাতাতে।

নরেশবাবু এ গুরুর গল্প বহুবার করেছেন। তাঁর নাকি আশ্চর্য সব ক্ষমতা, তিনি নাকি ত্রিকালজ্ঞ। এখনই এঁর তিন লাখের ওপর শিষ্য হয়ে গেছে। দ্বারভাঙ্গার উত্তরে হিমালয়ের কোলে জয়নগরে নাকি আশ্রম করেছেন। বিরাট আশ্রম, নানা দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সঙ্গে চতুষ্পাঠি, বেদের বিদ্যালয় সব স্থাপনা করা হয়েছে। বিরাট ব্যাপার। উনি আজকাল বড় একটা কলকাতা আসতে চান্‌ না। সেখানেই থাকেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই এবার এখানে এসেছেন।

শুনেই কৌতূহল হ'ল যাবার।

'কোথায় আছেন ভাই?'

নরেশবাবু যা নাম করলেন তাতে ত চক্ষুস্থির। ভবানীপুরের এক প্রচণ্ড বড়লোকের বাড়ি—তিনপুরুষ সবাই বিলাত-ফেরৎ এবং ধনী।

'সেখানে কি আমরা ঢুকতে পারব?'

'বিলক্ষণ। অবারিত দ্বার। কত ভক্ত শিষ্য যাচ্ছে প্রত্যহ তার ইয়ত্তা

আছে ?⋯কী করা যাবে বলো ভাই, বড়লোক না হ'লে ওঁর ঝক্কিই বা কে সাম্‌লাবে বলো ? ওঁর সঙ্গেই আসে একশ লোক, যেখানেই যান্ না কেন। তা ছাড়া কলকাতায়, শুধু কলকাতাই বা কেন, যেখানেই যাবেন অম্‌নি রথদোলের ভীড় ত লেগেই আছে। ওঁর ভক্ত কোথায়ই বা কম ?'

গেলাম সন্ধ্যাবেলা নরেশবাবুর সঙ্গেই। প্রকাণ্ড বাড়ি, দোতালার ওপর তার সর্ববৃহৎ হল ঘরে—গুরুদেব বসে আছেন। পুরু গদীর ওপর গেরুয়া রঙের শাল দিয়ে তাঁর আসন ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সেই আসনে গেরুয়া সিল্কের বহির্বাস পরে বসে আছেন এক দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তি। মাথায় জটা নেই, তার বদলে পিঠ পর্যন্ত এলিয়ে পড়েছে, কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফ দাড়ীও আছে, তবে খুব প্রচুর নয়। মোটের ওপর দেখলেই ভক্তি আসে।

ঘরের মেঝেতে ঢালা কার্পেট পাতা, তাতে অসংখ্য ভক্ত বসে আছেন, বোধ হয় ওঁর মুখের বাণী শোনবার জন্য। সকলেই উৎসুক, হাত-জোড় ক'রে সশ্রদ্ধ ভাবে চেয়ে বসে আছেন। গুরুদেব জন-দুই অসংখ্য-আংটি এবং দামী শাল-পরা সম্রান্ত ভক্তের সঙ্গে তখন কথা কইছিলেন, আমি গিয়ে প্রণাম ক'রে বসতে শুধু একবার হাসি হাসি মুখে চাইলেন কিন্তু তখন আর কথার সুযোগ হ'ল না।

অনেকক্ষণ পরে সেই দুটি ভক্ত বিদায় নিতেই সুযোগ বুঝে নরেশবাবু আমার পরিচয় করে দিলেন, 'ইনি একজন অধ্যাপক, এই বয়সেই বেশ নাম ক'রে ফেলেছেন। এঁর দাদা একজন ডি-এ-জি, এঁর পরের ভাই যিনি সম্প্রতি আই-সি-এস হয়ে এসেছেন। বেশ শিক্ষিত এঁরা সকলেই। আপনার নাম শুনে দর্শন করতে এসেছেন।'

'তাই নাকি ! বেশ বেশ। তা অত দূরে কেন। এস এস, কাছে এস।'

কাছে গিয়ে আর একদফা প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিলুম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বড় আনন্দ হ'ল বাবা তোমাকে দেখে, এই বয়সে যে মনে ভগবদ্-জিজ্ঞাসা জেগেছে এ বড় কম কথা নয়। না না, বিনয় ক'রে লাভ নেই। তুমি আমাকে দেখতে এসেছ, আমি কে ? আসলে তোমার মনে তৃষ্ণা জেগেছে তাঁর জন্যই—তাই একটা উপলক্ষ্য ধরবার চেষ্টা করছ, যাতে তাঁর কাছে পৌছতে পারো।⋯তা বাবা সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বুড়ো বয়সে মন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে পরলোকের একটা পাকা বন্দোবস্ত করতে ঝুঁকে পড়ি এই দিকে কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, বুড়োবয়সের জিনিস এ নয়। যৌবনের উদ্যম উৎসাহ বীর্য চাই, নইলে এ পথেও সুবিধা হয় না।

ঈশ্বরকে পাবার সাধনা দুর্বলের জন্য নয়, আসক্ত বদ্ধজীবের জন্যেও নয়। তোমরা ইচ্ছা করলে সব কিছু ত্যাগ করতে পারো এক মুহূর্তে, সব রকম দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে পারো অনায়াসে—বুড়োরা পারে ?'

অভিভূত হয়ে শুনছিলাম। বাস্তবিক, মহাপুরুষ বলতে হয় ত এঁরাই। কত কি নতুন কথা শোনালেন, কত কি নতুন ধরণের চিন্তা। জিনিসটা নিয়ে সত্যিই ভেবেছেন। অনেক রাত্রে যখন নরেশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম তখন গুরুদেব নিজে হাতে কিছু প্রসাদ দিলেন, উৎকৃষ্ট সন্দেশ কয়েকটি। আবার যেতে বললেন। আমার সঙ্গে কথা কয়ে নাকি তাঁরও তৃপ্তি হয়েছে।

আসবার সময়ে পার্শ্বের ঘরে দেখলাম তাঁর শয্যা প্রস্তুত হয়েছে। গেরুয়া রঙের বিছানা, লেপের ওয়াড় নেটের মশারী, সব গেরুয়া রঙের—বৈরাগ্যের রঙ সর্বত্র।

বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই কথাই মনে হ'তে লাগল, 'এত দিনে একটা সাধু দেখলাম বটে !'

ঘুমোবার আগে স্থির করলাম পরের দিনই আবার যাবো। যে ক'দিন থাকেন ওঁর দুর্লভ সঙ্গসুখ ছাড়া হবে না।

সস্তার বাড়ি

বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রাণ—শুধু হয়রাণই নয়, উদ্‌ভ্রান্ত, এমন সময় কল্যাণ এসে খবর দিলে, উত্তর কল্‌কাতায় একটা বাড়ি আছে, দোতালা বাড়ি, উপরে নীচে চারখানা শোবার ঘর, রান্না ভাঁড়ার—এছাড়া তেতলায় একটা চিলে কোঠা—মাত্র পঞ্চান্ন টাকা ভাড়া!

'কত?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বিজয়।

নিশ্চয় একশ পঞ্চান্ন বলতে গিয়ে কল্যাণ ভুল করেচে। শুধু পঞ্চান্ন ব'লে ফেলেছে।

কল্যাণ কিন্তু আবারও বলে—'পঞ্চান্ন, শুধু পঞ্চান্ন! রাজী আছ উত্তরে যেতে?'

উত্তরে কেন—যমের দক্ষিণ দোরেও যেতে বিজয়ের আপত্তি নেই—এমনই ওর অবস্থা তখন। কোথাও একটা আশ্রয় পেলেই বাঁচে। নীচের দুটি ঘর নিয়ে সে থাকে, ভাড়া পঞ্চাশ—সেটাকে বাড়াতে না পেরে বাড়িওলা তাকে তাড়াবার জন্যে এমন সব কৌশল অবলম্বন করেছে যে এক মুহূর্ত সেখানে থাকাও সমস্যা। ওরা উঠে গেলে নাকি সে পঁচাত্তর টাকা ভাড়া পাবে ঐ দুখানা ঘরের। তা পাক্—কিন্তু তার জন্য মানুষ এত অভদ্র হ'তে পারে? বিজয় বাড়ি খুঁজছে প্রাণপণে, বাড়ি পেলেই উঠে যাবে—এ কথাটা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। তারা ওপরে থাকে—ওরা নিচে সুতরাং ছোটখাটো অসংখ্য এমন অত্যাচারের সুযোগ তাদের আছে যা নিয়ে নালিশ মকদ্দমা ত করা যায়ই না—পাঁচজনের কাছে বলতে গেলেও উপহাসাস্পদ হবার সম্ভাবনা। যারা ভুক্তভোগী নয় তারা সে দুঃখ বুঝবে না। আর তাছাড়া ছা-পোষা কেরাণী লোক, বারোমাস মামলামকদ্দমা করারই বা সময় কৈ? ঝগড়া ঝাটি করতেই বিরক্তি বোধ হয়—ক্লান্তি আসে।

কিন্তু সে যাক্—কল্যাণ বলে কি?

পঞ্চান্ন টাকায় গোটা বাড়ি? এই বাজারে? পাগল নাকি ও?

গত দেড়মাস দুমাস বিজয় কম ক'রে অন্ততঃ দেড়শ' বাড়ি দেখছে। চোর খুপরীর মত দুখানা ঘর যার আছে সে যদি বা দয়া করে একশো টাকা না চায় ত আশি চাইবেই! তাও তার না আছে জল না আছে পাইখানা—ছত্রিশ ঘর ভাড়াটের জন্য হয়ত একটি কল এবং একটিমাত্র পাইখানা। এমনও আছে যারা

ব'লে দেয়, 'বিপদ আপদ হয় সে আলাদা কথা—তা নইলে মোটামুটি জল আপনাদের রাস্তার কল থেকেই আনতে হবে।'

আবার ভাড়া যদি একটু কম হয়—পঁয়ষট্টি-সত্তরের ধাক্কা যা—সে মনুষ্য বাসের অযোগ্য। দিনের বেলা আলো জ্বালতে হয়, ভিজে স্যাৎস্যাৎ করছে, কলতলা পাইখানার পাশের ঘর হয় ত—এমনি সব জোটে। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িগুলো এত পুরোনো নয় ব'লেই ওর এই দিকে ঝোঁক। নইলে উত্তরে আর আপত্তি কি?

সে সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলে, 'পঞ্চান্ন টাকায় একখানা গোটা বাড়ি? কি রকম বাড়ি রে?'

কল্যাণ একটু বিরক্তই হয়, 'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার বাব্বা—একবার দেখে এলেই পারো। তোমার ত দুখানা ঘরের দরকার, যদি তেমন ড্যাম্প্ হয়—নীচের ঘরগুলো নাই ব্যবহার করলে!'

'তা বটে। চলো এখনই দেখে আসি। কিন্তু এ খবর কে দিলে?'

কল্যাণ বললে, 'এই আত্মীয়দের মধ্যেই—আমার পিসেমশাইয়ের এক ভাগ্নী জামাইয়ের কাকার বাড়ি।'

কল্যাণের আত্মীয়তাবোধের সঙ্গে বিজয়ের বহুদিনের পরিচয়—সে আর বৃথা বাক্যব্যয় করলে না, শুধু গম্ভীর ভাবে বললে, 'তাহ'লেত আপনা-আপনির মধ্যেই, জানা শোনা। চলো বেরিয়ে পড়ি—'

কিন্তু বাড়ি দেখে আরও অবাক হ'লো বিজয়। শ্যামবাজারের মধ্যেই, বাড়ি খুব পুরানো নয়—নীচের ঘরগুলোতেও বাস করা যায় স্বচ্ছন্দে। জল কল সব সুবিধে। দিব্যি বাড়ি।

বিজয় দেখে শুনে অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'তুই নিশ্চয় ভুল শুনেছিস কল্যাণ। এবাড়ি শুধু পঞ্চান্ন হ'তে পারে না। হয় ভুল শুনেছিস নয় ত ঠাট্টা করেছে তোর কাকা।'

'অত কথায় দরকার কি তোর!' কল্যাণ বলে, 'আজই চল্‌না দুপুর বেলা অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়িওলাকে ভাড়া জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে আসবি। তা'হলেই বিশ্বাস হবে ত? ওদের অফিস আমাদের অফিসের দুখানা বাড়ি পরেই—'

বিজয় তবু প্রশ্ন করে, 'ক বছরের য়্যাডভান্স দিতে হবে? হয়ত তাইতেই মেরে দেবে রে! কিংবা সেলামী। ফার্ণিচার ত নেই, নইলে হয়ত কতকগুলো

ভাঙ্গা কাঠ দিয়ে দু হাজার টাকা নিয়ে নিত। কোন দিকে পুষিয়ে নেবে তাই ভাব্ছি।'

কল্যাণ বললে, 'না তা নয়। পিসেমশাইয়ের কাছে যা শুনেছি—লোকটা খুব নির্ব্বিবাদী। এখন সব রেণ্ট কণ্ট্রোল থেকে যা ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছে, ও বলেছে কি দরকার ওসব হ্যাঙ্গামে যাবার। যা রয় সয়—তাই ভালো! তবে জানাশুনো লোক নইলে ভাড়া দেবে না, নালিশ মকদ্দমা দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে না হয়—এই ওর একমাত্র চিন্তা।'

কথাটা বিজয়ের মনে লাগল।

তখন আর অঞ্জলির সঙ্গে কথা কইবার সময় নেই। কোনমতে দুটো নাকে মুখে গুঁজে অফিস দৌড়ানো—তাও পনের মিনিট লেট হয়ে গেল। নিহাৎ সরকারী অফিস বলেই রক্ষে। এখানে ঠিক সময় হাজির দেওয়াটা কেউই আশা করে না আজকাল।

ঘণ্টাখানেক কাজ ক'রেই দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল। বাড়িও'লা মানুষটি খুব ভদ্র, বছর পঞ্চাশ বয়স, গোলগাল মোটাসোটা—গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সমাদর ক'রে বসিয়ে চা আনতে পাঠালেন। তারপর কল্যাণের মুখে বিজয়ের পরিচয় পেয়ে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'বাড়ি আপনার পছন্দ হয়েছে?'

বিজয় সোৎসাহে বললে, 'খুব। বলেন ত এগ্রিমেণ্ট করতে রাজি আছি।'

'না না—থাক্। মানে আমি কি চাই জানেন, কোন পক্ষেই কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। আপনিই বা বাঁধা পড়বেন কেন?'

'কিন্তু সে যে আবার বিপদ, দুমাস বাদেই যদি আপনি বলেন দেড়শ টাকা ভাড়া দাও, নইলে পথ দ্যাখো—আমি বেশি ভাড়া পাচ্ছি। তখন? এই বিপদেই ত দিশাহারা, আবার ভাজনা খোলা থেকে আগুনে ঝাপ দেব?'

'না না—সে সব কোন ভয় নেই। আমি জেণ্টল্‌ম্যান্‌স্‌ ওয়ার্ড দিচ্ছি। বলেন ত আমার তরফ থেকে আমি একটা লিখে দিচ্ছি যে একবছরের মধ্যে ভাড়া বাড়াবো না। তারপরও বাড়লে কত বাড়াবো বলুন, পঞ্চান্ন টাকাটাত একশ' হতে পারে না।'

'সে ভালো কথা। এখন তা'হলে আমাদের কি করতে হবে?'

বাড়িওলা নীরবে কিছুক্ষণ পেপার ওয়েট্‌টা নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বললেন, 'ভাল হয় যদি দু মাসের ভাড়া জমা রাখেন। এছাড়া প্রতিমাসের ভাড়া আগাম

দিতে হবে। এই জমাটা দুমাস থাকার পর মাসে মাসে দশ টাকা ক'রে কাটা যাবে। আর যদি তার আগেই উঠে যান বা ভাড়া ঠিক মত না দেন ত ও টাকাটা বাজেয়াপ্ত হবে। আমি দেখুন স্পষ্ট কথার মানুষ--আমার অপরাধ নেবেন না।'

'না না ঠিক আছে। এত ভদ্রতা আমি আশাই করিনি।' বিজয় পকেট থেকে চেক্ বই বার ক'রে তখনই একশ' পঁয়ষট্টি টাকার চেক দিয়ে রসিদ নেয়। তারপর চা খেতে খেতে বলে, 'তা'হলে বাড়ি কবে পাচ্ছি আমি ?'

'আজই পেতে পারেন। শেষ ভাড়াটে চলে যাওয়ার পর চুণকাম করিয়ে দিয়েছি। আবার যদি দরকার হয় ত করিয়ে নিতে পারেন—আমি খরচ দিতে পারি। আমার পক্ষে ক'রে দেওয়া শক্ত।'

'কতদিন আগে গেছেন তাঁরা ?' বিজয় কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই প্রশ্ন করে।

'তা, মাস ছযেক হবে বোধ হয়।'

'এতদিন বাড়ি খালি আছে ? সে কি !' বিজয় বিস্মিত হয়।

কল্যাণ বলে, 'তোমার কপালে আছে। আর কি !'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বাড়িও'লা বলেন, 'না, মানে আমি ঠিক যাকে তাকে ভাড়া দিতে প্রস্তুত নই—বুঝলেন না ? হাঙ্গামা করা আমার পোষায় না।'

বিজয় বিজয়গর্বে রসিদ খানা অঞ্জলির চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, 'বাড়ি তৈরী, এখন কবে উঠবে বলো !'

'সে কি ! একেবারে পাকা ?' অঞ্জলির বিশ্বাসই হয় না।

তারপর সব কথা শুনে সে বলে, 'হ্যাগো এখনও এমন সত্যযুগের মানুষ আছে ?'

'আছে ত দেখছি।'

দুজনে মিলে পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে আগামী রবিবারেই উঠে যাওয়া সুবিধা। ওদের ঝিকে যদি শনিবার অফিস যাবার আগেই বিজয় ও বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় ত সে কতক ধোওয়া মোছা ক'রে রাখতে পারবে। তারপর অফিস থেকে ফিরলে ওরা ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাই গিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রেখে আসবে। কতক কতক বাজে জিনিসপত্রও চাইকি রেখে আসতে পারে।'

সেই মত ব্যবস্থাই হয়ে গেল। ওরা উঠে যাচ্ছে শুনে পুরাণো বাড়িওলা নিজে প্রস্তাব করলেন, 'বলেন ত আমরাও গিয়ে ধুয়ে মুছে দিয়ে আসতে পারি।'

'না দরকার হবে না—ধন্যবাদ্।' ব্যঙ্গের স্বরে বিজয় উত্তর দিলে।

শনিবার দিন আফিস থেকে ফিরে বই কাগজ ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিস একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়ে বিজয় স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে রওনা হ'ল। গিয়ে কড়া নাড়তেই ওদের ঝি এসে দোর খুলে দিয়ে একটু বিস্মিত ভাবেই বললে, 'ওমা দোর দেওয়া আছে? ছেলেটা তা'হলে গেল কোথা দিয়ে?'

'কে ছেলে? কাদের ছেলে?' অঞ্জলিও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে।

'তা জানিনি বাপু। কে একটা ছেলে—এই বছর সাত আটের—এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি যখন বারণ ক'রে দিলুম যে দেখো খোকা ধোওয়া ঘরে কাদা পায়ে ঢুকোনা, তখন নিচে নেমে এলো। তাও যতবার নিচে জল নিতে এসেছি দেখেছি খালি ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তা সে এলো কি করে? দোর দাওনি তুমি?

'একটু দেরি হয়েছিল। দাদা বাবু চলে যাওয়ার পর ত আর দোর দেওয়া হয়নি। পরে মনে হ'ল বটে, একা রয়েছি,—কেউ যদি বদমাইস এসে ঢুকে পড়ে? তাই তখন এসে দোর দিয়ে গেলুম। সদরে খিল লাগিয়ে যখন উঠেছি তখনই দেখি ছেলেটা ছাদ দিয়ে নামছে। যখন দোর খোলা ছিল তখনই ঢুকে পড়েছে। আমি জিজ্ঞেসা করলুম, অ খোকা তোমার নাম কি, কোথায় থাকো—তা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসলে, জবাব দিলে না। ভারি ফুটফুটে ছেলে—'

অঞ্জলি বললে, 'নিশ্চয়ই এই পাশের কোন বাড়ির ছেলে হবে। তার মা হয়ত খুঁজছে। তা সে গেল কোথায়?'

'কি জানি, আমি ত ভাবলুম চলে গেছে। এখন ত দেখছি দোর দেওয়া—'

বিজয় বললে, 'ত্যাখো কোন ফাঁকে আবার হয়ত ওপরে উঠে গেছে।'

অঞ্জলি বললে, 'ত্যাখো ত তরুর মা—থাকে ত ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। কার ছেলে—সে হয়ত কেঁদে কেটে খুন হচ্ছে—'

ঝি দোতালা তেতলা সব খুঁজে এসে বললে, 'কৈ বৌদি কোথাও ত নেই। গেল কোথা দিয়ে?'

বিজয় বললে, 'হয়ত ছাদ দিয়ে রাস্তা টাস্তা আছে। তা'হলে ত বিপদ, এতটুকু ছেলেই যদি যেতে আসতে পারে তাহলে ত অন্য লোক সহজেই পারবে।'

কিন্তু ছাদে উঠে দেখা গেল যে ছোট ছেলে কেন—খুব জোয়ান ছেলেও কেউ আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। একদিকে গলি অপর তিন দিকেই উচুঁ উচুঁ বাড়ি আসা যাওয়ার পথ নেই।

তখন সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

অঞ্জলি বললে, 'নিশ্চয়ই কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে ছিল, এখন আবার আমরা যখন ওপরে খুঁজছি তখন পালিয়াছে।'

তা অবশ্য হ'তে পারে। সদরদোরের কপাট ভেজানোই ছিল।

পরের দিন সকাল করে খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরের মধ্যেই এবাড়িতে সবাই চলে এল মালপত্র লরীতে বোঝাই ক'রে। ওরা ট্যাক্সীতে ক'রে আসবার সময় হাতি বাগান থেকে অঞ্জলির মা আর ছোট বোন মিনুকে তুলে এনেছিল। মা সব গোছ গাছ ক'রে দিয়ে বিকেলের চা খাবার ক'রে খাইয়ে—সন্ধ্যাবেলা চলে গেলেন। মিনু রইল—নতুন বাড়িতে অনেক কাজ বাড়ল, দিনকতক থাকলে সুবিধাই হবে, এই ভেবে অঞ্জলিই তাকে রেখে দিলে।

সন্ধ্যার পর অঞ্জলি মিনুকে ডেকে বললে, 'আমি ততক্ষণ রুটিগুলো সেঁকে নিই—তরুর মা বেলে দেবেখন—তুই খুকীকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে—'

'খোকা?'

খোকা তখন তরুর মার গা ঘেঁষে বসে গল্প শুন্‌ছে। সে বললে; 'আমি এরই মধ্যে শুতে যাবো বুঝি? বা রে! আটটায় খাবো—তার পরে ত ঘুম। মাসী কিচ্ছু জানে না।'

'তোমার বুঝি আজ নতুন বাড়ির অনারে পড়াশুনো সব ডকে উঠল খোকন?' অঞ্জলি হেসে বলে।

'বাবা ত পড়াবে—বাবা কোথায়?'

কি সব খুচরো জিনিস কিনতে বিজয় বাজারে গিয়েছিল। মিনু খুকীর দুধ গরম ক'রে নিয়ে তাকে কোলে ক'রেই ওপরে চলে গেল। দুধ খাইয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বিছানায় বসে খুকীকে ঘুম পাড়াতে শুরু করছে এমন সময় দেখলে ঘরে গুটগুট্‌ করে ঢুকছে একটি ছোট ছেলে। খোকনেরই বয়সী হবে, তবে খোকন নয়।

এঘরে আলো নেই, কিন্তু বাইরের বারান্দার আলো জ্বলছে তারই আভাতে বেশ দৃষ্টি চলে। ছেলেটি একেবারে ওর কাছে এসে দাঁড়াল—দুটো হাত বেশ করে ছড়িয়ে খাটের কানাটা ধরে হাসি হাসি মুখে চেয়ে রইল মিনুর মুখের দিকে—

মিনু তখন খুকীকে কোলে শুইয়ে প্রাণপণে চাপ্‌ড়াচ্ছে আর গুণ গুণ ক'রে গান গাইছে, কাজেই ছেলেটিকে কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ করতে পারলে না। তবে অনুমানে বুঝলে এ কালকের সেই ছেলেটি—বাড়ি ধোবার সময় যে ঢুকে পড়েছিল। ওর বেশ কৌতুক বোধ হল। ছেলেটা ত অদ্ভুত, বলা-কওয়া নেই—অচেনা লোকের বাড়ি সপ্রতিভ ভাবে ঢুকে আসে। পাগলা আছে বোধহয় একটু।

ভাবতে ভাবতেই মনে হল জামাইবাবু বেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই, তারপর তরুর মা দোর দেয়নি। ছ্যাখোদিকি কি অন্যায়—এমনি ভাবে অন্য লোকও ত ঢুকে পড়তে পারে!

খানিকটা চাপড়াবার পর খুকীর চোখ দুটো যেমন একটু বুজে এসেছে, মিনু সামনের দিকে ঝুঁকে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'ও খোকা, তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাকো?'

ছেলেটা উত্তর দিল না। মুচকী হাসতে লাগল শুধু।

মিনুরও আর বেশি কথা কইতে ভরসা হ'ল না পাছে খুকি উঠে পড়ে। খানিক পরে খুকীর ঘুমটা আর একটু গাঢ় হ'তে তাকে সন্তর্পণে তুলে বিছানায় শুইযে দিলে, সে সময় ওকে ছেলেটার দিকে পেছন ফিরতে হয়েছিল, কিন্তু সে একমিনিটের বেশি নয়—তারপর ফিরে আর ছেলেটাকে দেখতে পেলে না।

মিনু তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দায় এল। সেখানেও সে নেই। ছাদের দিকে উঁকি মেরে দেখলে সিঁড়ির দরজা বন্ধ। পাশের ঘরেও কেউ নেই। নিশ্চয় নীচে গেছে। সে নীচে নামছে এমন সময় কট কট ক'রে সদরের কড়া নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ের ডাক, 'খোকন!'

মিনুই গিয়ে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিল।

তারপর আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভেতরে এসে তরুর মাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তরুর মা তখন জামাইবাবু যাবার কত পরে দোর দিয়েছিলে?'

'ও মা কি বলছ গো! আমি ত ওনার সঙ্গে গিয়ে দোর দিয়ে এলুম।'

বিজয়ও সায় দিলে, 'হ্যাঁ আমি ডেকে নিয়ে গেলুম যে। নতুন পাড়া—কিছু কি বলা যায়। কেমন লোক সব—চোর ছ্যাঁচড় আছে কিনা জানি না ত!'

'কিন্তু—কিন্তু তা হ'লে সে ছেলেটা গেল কোথায়?'

'কে ছেলে রে?' অঞ্জলিও বেরিয়ে আসে।

'ঐ একটা খোকা। খোকনেরই মত হবে, কি আর একটু বয়স বেশী।

খুকীকে যতক্ষণ ঘুম পাড়ালুম সমস্তক্ষণ আমার কাছে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেমন পেছন ফিরে খুকীকে শো'াতে গেছি—কোথায় যে পালিয়ে গেল! ওকেই বোধ হয় তরুর মা দেখেছিল সেদিন!'

অঞ্জলি একটু চিন্তিত মুখে বললে, 'গেলই বা কোথায়? সে না হয় দুপুর বেলা—রাস্তা দিয়ে এসেছিল। আজ এই রাত্তিরে ওর বাপ মা ছেড়ে দিয়েছে? কোথা দিয়ে ঢুকেছে বাড়িতে—সত্যি এটা দেখা দরকার!'

ওরা এদিক ওদিক দেখলে। খাটের নীচে, সিঁড়ির কোণ, বাথরুম,—ওপরের ছাদ পর্যন্ত। কোথাও তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

এবার বিজয়ও একটু চিন্তিত হ'ল, 'তাইত সদর দোর বন্ধ, বাড়ি থেকে বেরোবার আর কোন রাস্তা নেই--গেল কোথায়?'

খানিকক্ষণ সবাই চুপ ক'রে থাকার পর তরুর মা সভয়ে বললে, 'হ্যাঁ বাবু, ভূত টুত নয় ত? রাম রাম!'

'দূর দূর—চুপ কর!' তাকে ধমক দিয়ে উঠে অঞ্জলি, 'ঐটুকু ছেলে ভূত শুনেছিস কোথাও?'

'তা বটে বাপু।' স্বীকার করে তরুর মা—'শুনি নি ত কখনও। খোকা ভূতের কথা!'

সেদিনের মত সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেলেও অঞ্জলির গা-টা ছম্ ছম্ করতে লাগল। আগে কথা ছিল যে বড় ঘরে অঞ্জলি ছেলেমেয়ে এবং বোনকে নিয়ে শোবে—বিজয় থাকবে পাশের ঘরে, ঝি শোবে নীচে। কিন্তু তরুর মার মুখের চেহারা দেখে তাকেই পাশের ঘরের ব্যবস্থা করা হ'ল—বিজয় বড় ঘরের মেঝেতে শু'ল আলাদা বিছানা করে।

কিন্তু এর পর দুটো দিন কাটল নিরুপদ্রবে। বিজয় ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে মিনুকে, 'ওটা তোমার অলস মস্তিষ্কের কল্পনা মীনাবতী—তরুর মা যেমন দিনদুপুরে ভূত দেখে, তুমি আবার সেই কথা শুনে ভাবলে বুঝি তুমিও দেখছ। ওইটে ইন্‌ফ্লুয়েন্স্ করলে আর কি তোমাকে—'

'আপনার যেমন কথা!' মিনু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। 'সন্ধ্যাবেলা বুঝি স্বপ্ন দেখে কেউ?'

'স্বপ্ন নয় কল্পনা!'

তুমুল কৃত্রিম কলহ জমে ওঠে শালী-ভগ্নিপতির মধ্যে।

বুধবার দিন কিন্তু আবার দেখা গেল তাকে। এবার দেখলেন খোদ কর্তাই।

কী একটা উপলক্ষ্যে অফিস সেদিন বন্ধ ছিল। টানা একটা দিবানিদ্রা দিয়ে বেলা চারটে নাগাদ বিজয় ছাদে উঠে পায়চারি করছিল। খোকন তার মামার বাড়ি গেছে সকালে—খুকী তখনও ঘুমুচ্ছে। মিনু অঞ্জলি তরুর মা নীচে। রান্নাঘরে বসে চায়ের জল চাপিয়ে দুই বোনে গল্প করছে, তরুর মা কলতলায় বাসন মাজছে। সমস্ত দোতলাটা নির্জন ও নিস্তব্ধ।

ছাদের একটা কোণ থেকে নীচের ঘরের বড় বিছানাটা দেখা যায়। পায়চারী করতে করতে হঠাৎ সেই কোণে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় বিজয়। ঠিক সেদিকে চায়নি সে, চোখের পাশে দৃষ্টির যে আব্ছায়া থাকে একটা, তাতেই মনে হ'ল যেন ঘরে নড়ছে কী একটা—নিয়মিত ভাবে। তখন ভাল করে তাকিয়ে দেখলে সে—একটি বছর-সাতেকের ছেলে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত খুকীকে হাওয়া করছে। দিব্যি ফুটফুটে ছেলে, পরণে হাফ প্যান্ট, খালি গা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে খুকীর দিকে, চোখের দৃষ্টিতে অগ্রজের সস্নেহ অথচ সকৌতুক ভাবটি ফুটে উঠেছে।

ভাল ক'রে তখনও এর পরিপূর্ণ অর্থটা মাথায় যায়নি—বিজয় কয়েক মুহূর্ত মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরই সব ইতিহাসটা মনে পড়ায়, ছেলেটিকে অতর্কিতে গিয়ে ধরবে বলে পা টিপে টিপে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে নেমে এল।

নীচে নামতে বড় জোর ওর দু মিনিট গেছে সবসুদ্ধ। কিন্তু কৈ? সে ত নেই। খুকী যেমন ঘুমোচ্ছিল তেমনি ঘুমোচ্ছে। তবে কি সেও স্বপ্ন দেখছিল, কিংবা কল্পনা? মিনুকে যা বলেছে তারও তাই?

কিন্তু না, ঐ ত পাখাখানা পড়ে আছে—ওটা সাধারণতঃ দেওয়ালের গায়ে পেরেকে আট্কানো থাকে।

তাহলে ছেলেটা গেল কোথায়?

খাটের নীচে উঁকি মেরে দেখলে বিজয়, পাশের ঘর, ওপরের ছোট বাথরুমটা—কোথাও ত নেই। আবার একবার ছাদে উঠল—যদি অন্য দিক দিয়ে উঠে গিয়ে থাকে তার অলক্ষ্যে—না তাও ত নেই। দোর বন্ধ করে নেমে এসে দোতালাটা আবার ভাল ক'রে দেখলে তারপর একতলায় নেমে সিঁড়িতে এল। রান্নাঘরে ওরা বসে কাপে চা ঢালছে, তরুর মা বাসন ধুয়ে জমা ক'রে রাখছে চৌবাচ্চার পাড়ে। পাশের ঘর দুটোরই কপাটে শেকল তোলা। সদর দরজা বন্ধ।

'হ্যাগো—তাকে দেখেছ কেউ?'

'কাকে গো?' ওর গলার আওয়াজে বিবর্ণ হয়ে অঞ্জলি বেরিয়ে আসে। মিনুর হাত কেঁপে খানিকটা চা মাটিতে পড়ে যায়।

সংক্ষেপে বিজয় সব কথা খুলে বলে। অঞ্জলি সবটা ভাল ক'রে শোনবার আগেই ছুটে গিয়ে খুকীকে বুকে তুলে নিলে। তারপর সবাই মিলে বাড়িটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজলে। কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই।

তরুর মা তখন ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। ওর গলায় কান্নার স্বর।

'কি হবে বাবু, আমি আর ওপরে যেতে পারব নি!'

অঞ্জলি তাকে ধমক দিয়ে ওঠে—'কেন কী হয়েছে কি? এই ত তিন দিন এসেছিস? সে তোদের ভয় দেখিয়েছে, না কোন অনিষ্ট করেছে?'

তরুর মা তখন যেন একটু প্রকৃতিস্থ হল, 'তা বটে বাপু। তা ঠিক কথা। কৈ ভয়ডর ত কারুকে দেখায়নি—'

অঞ্জলি বিজয়কে বললে, 'এইজন্যে বোধ হয় বাড়িওয়ালার এত সাধুতা, তাই ভাড়া এত কম। তুমি এক কাজ করো— পাড়ায় দু'একজনের সঙ্গে দেখা করো। জানো ভাল ক'রে ব্যাপারটা কি।'

বিজয়ের কথাটা মনে লাগল।

চটিটা পায়ে গলিয়ে সে তখনই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

পাশেই থাকেন এক রিটায়ার্ড সাবজজ, তিনি তখন বাইরের রকে বসে সকালের খবরের কাগজটা পড়ছেন। বিজয় নমস্কার ক'রে পাশে গিয়ে বসতে তিনি মুখ না তুলেই বললেন, 'দেখা দিয়েছে বুঝি?'

ভালরকম বুঝতে না পেরে বিজয় বললে, 'আজ্ঞে?'

কাগজখানা নামিয়ে রেখে এবার ওর দিকে চাইলেন ভাল ক'রে সাবজজ বাবু, 'বলছি সেই ছেলেটাকে দেখেছেন ত? তাইত এসেছেন? সাধারণতঃ এত দেরি হয় না, বাড়িতে আসার পরের দিনই ছুটে আসে সবাই!'

একটু হাসলেন তিনি। বিদ্রূপ ও করুণা মাখানো হাসি।

বিজয় বললে, 'দেখেছি আমরা আসবার আগেই। তবে আপনাদের কাছে খবরটা নিতে আসবার ঠিক অবসর পাইনি।' ইচ্ছে ক'রেই একটু খোঁচা দেয় বিজয়।

'ও। দেখেছেন আগেই! আপনাদের সাহস আছে ত!' একটু ক্ষুণ্ণই হন ভদ্রলোক, 'মজা এই, আপনারা একবারও ভেবে দেখেন না যে চারিদিকে যখন বাড়ির আকাল তখন এত সস্তায় বাড়ি দেয় সে কী ক'রে। আগে কেউ আসেন না আমাদের কাছে—তখন মনেই পড়ে না পাড়ায় এতগুলো লোক আছে।

আসেন ঠকে, ঘা খেয়ে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে ছুটতে ছুটতে।…কত ত দেখলুম। তিন দিনও কেউ থাকতে পারে না। আবার সেই পুরোনো আস্তানাতেই ভাড়া বেশী দিয়ে ছুটে যেতে হয়! হুঁ!'

ক্লান্ত হয়েই যেন থামেন তিনি। বিজয় মনে মনে ততক্ষণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, সে সেটা গোপন না ক'রেই বললে, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি?'

'ভূত! আবার কি!'

'ভূত?'

'হ্যাঁ মশাই—ভূত। তবে বলি শুনুন—'

এই বলে তিনি কাহিনীটা খুলে বললেন।

'বছর পাঁচেক্ আগে একটি ভদ্রলোক এই ঘরটি ভাড়া নেন। আগে খুব বড় জমিদার ছিলেন তিনি—নানা বদ খেয়ালীতে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। এখানে আসার পরই ওঁর স্ত্রীর কি ভারী ব্যারম হয়—ডাক্তার ফাক্তার ডাকেন নি, ভুগে ভুগে তিনি মরে গেলেন। নিয়ে দিয়ে রইল ঐ ছেলে—দিন কতক ঝি রেখেছিলেন সেই রেঁধে দিত, অন্য কাজও করত। কিন্তু সে মাইনে পায় না, কত দিন থাকবে? তা ছাড়া রান্না খাওয়ারও জিনিস থাকতো না অর্ধেক দিন। তখন কর্তা নিজেই একবেলা রান্না করতেন, বিকেলের জন্য কোনদিন সেই ভাতই থাকত, কোনদিন বা—মানে যেদিন পয়সা-কড়ি জুটত—সেদিন হোটেল থেকে রুটি মাংস কিনে আনতেন। প্রায়ই মদে বুঁদ হয়ে ফিরতেন—ছেলেটাকে ঠেঙাতেন বেদম। আবার নেশা ছুটে গেলে খুব আদরও করতেন। ছ'টা হয়ে মরে গিয়েছিল, ঐ এক ছেলে—শিবরাত্রির সলতে। উপার্জনের মধ্যে ছিল শুনেছি জুয়া খেলা—যেদিন কিছু মিলত সেদিনই মদের মাত্রা বেশী। যেদিন হেরে যেতেন সেদিন চুপচাপ। ছোট ছেলে একাই থাকত বাড়িতে—উনি দোরে চাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যেতেন। আমাদের সঙ্গে কোনদিন আলাপ পর্যন্ত করেন নি। তবু আমি একদিন মশাই উপযাচক হয়ে বললুম, আমাদের কাছে রেখে যান না কেন ছেলেটাকে—সারাদিন তবু খেলাধুলা করতে পারে, আমার একপাল নাতি-নাতনী রয়েছে। ও হরি, মুখের উপর বললে কিনা, ধন্যবাদ। দরকার নেই কিছু—যত সব বদ্ ছেলে আপনার বাড়ির—অত মিশ্‌লে ছেলে বিগড়ে যাবে।…সেই থেকে আর কথা কইনি ওর সঙ্গে, ঘেন্না হ'ত। অত অভদ্র ছোটলোককে কি বলব —ওর ছাগল ও যেদিকে পারে কাটুক।…তারপর একদিন দেখি দিনেও তালা

ঝুলছে। পর পর তিন দিন এমনি গেল। মনে করলুম বাড়িওলা খুব তাগাদা করছে, তাই সরে পড়েছে কোথাও বাপ বেটায়। দিন রাতই ত পাওনাদাররা আসত। একদিন বাড়িওলাও এলেন—বললেন, জানেন কিছু খবর—বললুম, না মশাই কিছু জানি না। তবে হ্যাঁ—আমার স্ত্রী একদিন বলেছিল ছেলেটাকে ওর মধ্যে পুরে রেখে যায় নি ত, মাতালের কাণ্ড। আমিই উড়িয়ে দিলুম—দূর, তাই কখনও পারে। হাজার হোক বাপ। তবু কান পেতে শুনতাম, কোন শব্দই হ'ত না। চার দিন পরে লোকটা ফিরল একটা রিক্সা ক'রে—খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, চক্ষু কোটরগত—হাত পা কাঁপছে। আমি তখন এই রকেই বসে। গাড়ী থেকে নেমে কোনমতে দরজার তালা খুলল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আজ তারিখ কত বলতে পারেন? আমি তারিখ বললুম। তখন বললে, আমি কতদিন আসিনি বলুন ত?...তা চার পাঁচ দিন হবে। তখনই চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, আমার খোকা!'

বলতে বলতেই সাবজাজ বাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। চশমা খুলে কোঁচার খুটে চোখ মুছলেন। বিজয় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলে, 'তারপর?'

'আমি ত অবাক। খোকা ওর মধ্যে ছিল নাকি? চলুন চলুন, কী সর্বনাশ। ভেতরে গিয়ে দেখি ঠিক তাই—বিছানায় শুয়ে পড়ে আছে—তখনও প্রাণটা ধুক্ ধুক্ করছে তবে সে যে বেশিক্ষণ নয় তা দেখেই বুঝলাম। ঘরে খাবার মত একটা জিনিসও ছিল না, তার ওপর ছেলেটা নাকি কিছুদিন ধরেই ভুগছে—এই পাঁচ দিনের উপবাসে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে। কী লক্ষ্মী ছেলে মশাই, একটু আওয়াজ করেনি, কাঁদেনি কাটেনি কিছু নয়—বরং ওর বাবা যখন এসে চিৎকার করে ডাকলে, খোকনরে ব'লে, একবার একটু চোখ চেয়ে হাসলে। ...আমিই গেলুম ছুটে ডাক্তার ডাকতে। কিন্তু ডাক্তার কি করবে আর? সন্ধ্যাবেলাই ছেলেটা মরে গেল।'

'তারপর?'

'বাপটা তিনদিন ছিল পড়ে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যা জানলুম, ওর জুয়ার আড্ডায় সেদিন বুঝি অনেক টাকা জিতেছিল। যে বেশি হেরেছিল সে ওর টাকাটা কেড়ে নেবার মতলবে মদের সঙ্গে ধুতরোর রস মিশিয়ে খাইয়ে দেয়—তাতেই তিন চার দিন ওর কোন হুঁশ ছিল না—তারাও টাকা কড়ি নিয়ে সরে পড়েছে।... এদিকে এই কাণ্ড। তিন দিন লোকটাও মুখে জল দিলে না—আবার একটা নরহত্যা হয় দেখে আমরা একদিন জোর ক'রে তাকে ভাত খাওয়ালুম।

খেয়ে এখানেই পড়ে ঘুমোল তারপর সন্ধ্যেবেলা উধাও—আর ফেরেনি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা জানি না। বাড়িওলা পুলিস কেস ক'রে তালা ভাঙ্গিয়ে মালপত্র ফেলে দিয়ে বাড়ি চুনকাম করিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত—কিন্তু তারপর আর ভাড়া হয় না। যে আসে সেই ছেলেটিকে দেখে, কারুর কোন অনিষ্ট করেনি কখনও—তবু ভূত দেখে কে আর থাকে বলুন।'

বিজয় ফিরে এসে আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি খুলে বললে অঞ্জলির কাছে। মিনু ত কেঁদেই ফেললে, অঞ্জলিরও চক্ষু সজল হয়ে উঠল।

'আহা বাছারে।'

বিজয় একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তাহলে এখন কি করা? আবার সেই পুরনো বাড়ি?' অঞ্জলি উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ক'রে বললে, 'কী আর করব। আমি এখানেই থাকবো। সে ত আমাদের কোন অনিষ্ট করছে না। আত্মা একা থেকে হাঁপিয়ে ওঠে তাই আসে। আমার কোন ভয় নেই।'

তরুর মা বললে, 'তাই বলে ভূতের সঙ্গে থাকবে?'

'এই ত তিনদিন রইলি, কী করেছে সে তোর? অত ভয় হয় রামকবচ নেগেনা।'

'না না, সে কথা কি বলছি। আমি কি আমার লেগে বলছি, ছেলেমেয়েগুলি রয়েছে।' অপ্রতিভ ভাবে বলে সে।

'তা থাক। ওদের সে ভালবাসে, নইলে খুকীর গরম হচ্ছে দেখে সে বাতাস করবে কেন?'

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে—সেইদিন থেকেই সে এ বাড়ি ছেড়ে দিলে একেবারে। আর কোনদিন কখনও কেউ তাকে দেখতে পায়নি।

অঞ্জলি বরং দুঃখই করে, 'আহা রে, আমি দেখতে পেলুম না একবারও! তোমরা সবাই দেখে নিলে!'

বিজয় বলে, 'সে বেচারীকে সবাই ভয় করেছে, তোমার মত ভালবাসেনি কেউ। ঐ ভালবাসাটুকুর জন্যই তার তৃষিত আত্মা মুক্তি পাচ্ছিল না বোধ হয়। এবার সে স্বর্গে চলে গেছে।'

অঞ্জলি ছল ছল চোখে বলে, 'তাহোক্ এবার মহালয়ায় আমি তার নামে তিনটি বামুন খাইয়ে দেব।'

মিনু বলে, 'মাঝখান থেকে আপনি কিন্তু সস্তায় একটা বাড়ি পেয়ে গেলেন জামাইবাবু!'

'তা বটে।' বিজয়ও হাসে।

স্মরণীয়

ঘটনাটা আপনাদেরও মনে আছে নিশ্চয়। এমন কিছু বেশি দিনের কথা নয়।

দেবপ্রয়াগ থেকে বেরিয়ে শ্রীনগরের পথে যাচ্ছিল বাসখানা, কেদার-বদরীর যাত্রী নিয়ে। হঠাৎ একটা পাহাড়ী ছাগল না কি বাঁচাতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায় নীচের খাদে। বহু নীচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় বাসখানা। বাইশজন যাত্রী আর কনডাক্টর ড্রাইভারের একজনও বাঁচেনি।

এই হ'ল খবরের কাগজের রিপোর্ট।

কিন্তু এটা ঠিক নয়।

একজন বেঁচে ছিলেন। শচীন ঘোষ মশাই। বড় কনট্রাক্টর এবং কলকাতা শহরের একটি বিখ্যাত সিনেমা-গৃহের মালিক। বর্তমান বয়স পঞ্চান্ন বছর।

ওঁর নিজের ধর্ম-কর্মের দিকে কখনই তেমন মন নেই। আসলে সে অবসরও ছিল না। সামান্য সরকারী চাকরীতে ঢুকেছিলেন, তারপর সুদীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম ক'রে পয়সা রোজগার করতে হয়েছে তাঁকে—বাজে কাজ বা চিন্তার অবসর ছিল না। মধ্যে মধ্যে মা কালীকে পূজো মানসিক করেছেন বটে, সত্যনারায়ণও দিয়েছেন বহুবার--আর খুব বিপদে পড়লে সামনে যে দেব-দেবী পড়েছেন বা যাঁকেই জাগ্রত মনে হয়েছে তাঁকেই ডেকেছেন এবং পূজো মানসিক করেছেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে মানসিক শোধ হয় নি। এ ছাড়া ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। ভগবান ব'লে কোন একজনকে ধারণা করবার চেষ্টাই করেন নি। দেব-দেবীরা প্রসন্ন হ'লে হয়ত ভাল করতে পারেন—এই বিশ্বাসবশতই পূজো মানসিক করা—তাঁদের নিয়েও চিন্তা করার কখনও অবসর পাননি। জ্যোতিষী-তান্ত্রিকের কথামত দু-একবার মাদুলী পরেও দেখেছেন—দামী পাথরের আংটি কয়েকটা এখনও আছে হাতে। কিন্তু সে কোন্‌টা কোন্ গ্রহকে তুষ্ট করার জন্য তা তাঁর আজ আর মনে নেই। যখন পরেছেন তখনও অত মাথা ঘামান্‌নি বোধ হয়। যে যা বলেছে নির্বিচারে কিনেছেন। পাথর আর সোনা, দামী জিনিসই ত হাতে রইল—পয়সা ত আর জলে যাচ্ছে না।

এ-হেন শচীন ঘোষকে যে কেদার-বদরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হ'ল সে কেবলই স্ত্রীর পীড়নে। তাঁর মেজমেয়ের শ্বশুর নাম-করা ধনী ডাক্তার। গৃহিণী যুক্তি দিলেন, 'বেয়াই মশাই অমন প্র্যাকটিস্ ফেলে যদি যেতে পারেন, তুমি এই ক-টা দিন ব্যবসা থেকে ছুটি নিতে পারো না! তোমার ত তবু কর্মচারীরা রয়েছে—দুই ছেলে রয়েছে। একেবারে কারবার বন্ধ হয়ে ত যাবে না! ওঁর ত সবটাই লোকসান!'

কথাটা মিথ্যে নয় ব'লেই জবাব দিতে পারেন নি। দু-একবার গাঁই-গুঁই ক'রে রাজী হতে হয়েছিল। বেয়াই, বেয়ান, তাদের বেয়াই—এমনি সব দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনেই কুড়িজন হয়ে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল ঝি আর বামুন। সুতরাং একটা বাস রিজার্ভ করেই যাচ্ছিলেন তাঁরা। গেঁয়ো যাত্রীরা পাশে বসে বমি করতে করতে যাবে—সে অসহ্য। তা'ছাড়া বাইশ জন যাত্রীকে বাসও'লারাও সহজেই রিজার্ভেশ্যন্ দিয়েছে—এর ওপর কজন লোকই বা ধরত!

সে যাই হোক—শচীন ঘোষ মশাই মরেন নি। বাকী সব যাত্রীর মধ্যে এমন ভাবে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন—যে দলিত পিষ্ট হলেও চূর্ণ বিচূর্ণ হন্ নি। 'রাখে হরি মারে কে' এই প্রবচনকে যেন সার্থক করবার জন্যই তিনি বেঁচে গেলেন এ যাত্রা। গাড়িখানা গুঁড়িয়ে গেল, তার কাঠগুলো দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হল, লোহার অংশটুকু তালগোল পাকিয়ে গেল, কাঁচের গুঁড়ো বালুকা-কণায় মিশিয়ে গেল, লোকগুলো তার ভেতরে পড়ে কীচকের মত অবস্থা হয়ে মারা পড়ল—তবু তারই ভেতর কেমন এক অত্যাশ্চর্য ভাবে শচীন ঘোষ বেঁচে গেলেন।

তবে প্রথমটা তাঁরও কোন জ্ঞান ছিল না। আঘাতের প্রচণ্ডতায় সমস্ত চৈতন্য লোপ পেয়েছিল। মুমূর্ষুর গোঙানি ও আর্তনাদ নিস্তব্ধ হবারও অনেক পরে একটু একটু করে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। প্রথম একটা কি গোলমেলে অনুভূতি বোধ হ'ল। তারপর একসময় তিনি অনুভব করলেন, তাঁর শরীরের সর্বত্র অসহ্য যন্ত্রণা। কে যেন লোহার মুগুর দিয়ে আপাদমস্তক পিটেছে তাঁকে। অবশ্য সে অভিজ্ঞতা যে আছে তাঁর—তা নয়। তবে ঐরকমই কল্পনা করলেন।

অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা দেহ যেন কে চিবুচ্ছে।

কিন্তু কেন?

তাঁর কি কোন অসুখ করেছে? মায়ের অনুগ্রহ? প্লেগ? বাত? না কি এটা?

চোখমেলে তাকাবার চেষ্টা করলেন, কিছু বোঝা গেল না। প্রথমত ভাল ক'রে চোখ চাওয়া গেল না, দ্বিতীয়তঃ সব যেন কেমন গোলমেলে মনে হ'ল।

আচ্ছা, তিনি এখন কোথায়?

ভাবতে ভাবতে একটু একটু ক'রে মনে পড়ল কথাটা।

ও, তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কেদার-বদরী যাচ্ছিলেন। বাস্-এ ক'রে রওনা হয়েছিলেন দেবপ্রয়াগ থেকে ভোরবেলা। একমুঠো কিসমিস্ আর এক কাপ চা খেয়ে।

তারপর ?

কী যে হ'ল তা তিনি জানেন না। বাস্‌টা কেমন ঘুরতে ঘুরতে ধাক্কা খেতে খেতে পড়ছিল, এটা তাঁর মনে আছে। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আর মনে নেই।

তা'হলে একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছে নিশ্চয়। বাস্‌টা ওপর থেকে গড়িয়ে পড়েছে। অনেক নীচে—কারণ একটু আগেই তাঁরা অনুমান করবার চেষ্টা করছিলেন, বাঁদিকের খাদ্‌টা কত নীচু। কেউ বলছিলেন খাড়া দেড় হাজার ফুট, কেউ বলছিলেন আঠারো শ' ফুটের কম নয়।

ঐ অতটাই পড়েছেন তাহ'লে।

তা ত হ'ল,—এখন কি অবস্থা ?

মারা গিয়েছেন তিনি তাতে ত কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এখন এ অনুভূতিটা কিসের ? এ কি মরণের পরের অনুভূতি। পরলোকে পৌঁছে কি আবার চেতনা ফিরে পেয়েছেন তিনি ?

কিন্তু তাহ'লে এ যন্ত্রণা কিসের ? পৃথিবীর অনুভূতি, দৈহিক যন্ত্রণা—পরলোকে ত থাকবার কথা নয়। তবে ? তবে কি তিনি নরকে পৌঁছেচেন ? এইটেই কি নরক যন্ত্রণা ? স্বর্গ নরক তবে কি কোথাও আছে সত্যিই ? তবে নরক যদি হবে—সে যমদূতটাই বা কৈ ?

আর যেন ভাবতেও পারেন না শচীনবাবু। ক্লান্তভাবে পড়ে থাকেন খানিকটা। কিন্তু যন্ত্রণাও যে আর সহ্য হয় না।

হাত-পা একটুখানি নাড়বার চেষ্টা করেন—পারেন না। চারদিকে যেন কী এক নাগপাশ বেঁধে রেখেছে তাঁকে। কি এগুলো ?

আর একবার ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেন। দেখা যায় না ভাল ক'রে। কিন্তু এ কি—একেবারে মুখের কাছে এ কার মুখ ? এ যে ভবশরণবাবুর। হ্যাঁ—সেইরকমই ত মনে হচ্ছে।

না—আর একটু ভাল ক'রে দেখা দরকার। একেবারে চোখের এত কাছে থাকলে কি দেখা যায় কিছু ?

মাথাটা অতি কষ্টে একটু সরান শচীনবাবু। ওঃ—যেন ছুঁচ বিঁধছে ঘাড়ে।

ও হরি, এ কি কাণ্ড! যাকে তিনি নাগপাশ মনে করছিলেন, আসলে সে ত কতকগুলো নরদেহই। তাঁর চারপাশে মানুষ—সব দিকেই। তিনি মানুষের ওপর পড়ে আছেন, তাঁর ওপরে মানুষ, দুদিকে মানুষ। এ বোধ হয় বেয়ান,

গয়নার কোণগুলো বিঁধছে প্রতি-নিয়ত। অত ভারি হালফ্যাসানের গয়না নিয়ে কেউ তীর্থে আসে! বড়মানুষী দেখান শুধু। পাশে যে থাকে তার প্রাণ যায় আর কি।

মনে হ'ল চেঁচিয়ে বলেন, 'বেয়ান আপনার ঐ কঙ্কনপরা হাতটা সরিয়ে নিন!' পারলেন না! ভবশরণবাবুকে ডাকবার চেষ্টা করলেন, ক্ষীণ স্বর মাত্র বেরোল গলা দিয়ে।

আবারও চোখ বুজে পড়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ক্লান্তিতে দেহ এলিয়ে আছে। সামান্য কিছু করবারও ক্ষমতা নেই।

অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ চাইলেন।

হোক যন্ত্রণা, হাতখানা তিনি মুক্ত করবেনই।

এবার ডাকলেন চেঁচিয়ে, 'ও বেয়ান, হাতটা সরাবেন?'

কোন উত্তর নেই। অজ্ঞান হ'য়ে আছে বোধ হয়।

হাতখানা টেনে বার করা যায় না কিছুতেই? ওঃ, ভগবান, মাথা ছিঁড়ে যাবে এবার। আর একটু, একটু—হ্যাঁ হাতখানা মুক্ত হয়েছে। হাতেও যেন জোর নেই। অসাড়। হয়ত ভেঙ্গেছে। কে জানে?

আরও খানিকটা পরে ভবশরণের মুখখানা সরাবার চেষ্টা করেন। এমন কাঠ কেন? আড়ষ্ট, শক্ত! তবে কি? তবে কি—?

আসে পাশে যতটা পারা যায় হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব করলেন। কঠিন, শীতল দেহ। বেয়ানের নাকে হাত দিয়ে থাকেন। আর একটা কার মুখ—না, সেখানেও নেই। নিশ্বাস নেই কারুর।

তা'হলে কি সবাই মারা গিয়েছে—এক তিনি ছাড়া?

এগুলো সব মড়া?

শোকে, দুঃখে, ভয়ে—একটা চিৎকার ক'রে উঠলেন শচীনবাবু।

কি সর্বনাশ! এ তাঁর কি হ'ল?

তাঁর স্ত্রীরও কি ঐ অবস্থা?

নাম ধরে ডাকলেন। অনেকদিন পরে ও নামটা ব্যবহার করলেন।

'ও গো শুনছ! হ্যাঁ গো। ও প্রমীলা?'

না। কারুর সাড়া নেই; হয়ত সেও গিয়েছে। কিংবা বেঁচে গিয়েছে তাঁর মত। অজ্ঞান হয়ে আছে। হয়ত হাত-পা ভেঙ্গেছে।

বেশ হয়েছে! যেমন জেদ ক'রে আসা।

এইবার একটা সত্য একটু একটু করে প্রতিভাত হ'ল। তিনি এখন পরলোকে নেই—দস্তুর-মত ইহলোকেই আছেন এবং বাপ-মার পুণ্যে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন। হয়ত বা হাত-পা ভেঙ্গেছে। কিন্তু সে আলাদা যন্ত্রণা। ছেলেবেলায় একবার হাত ভেঙ্গেছিল তাঁর—তিনি জানেন সে কি যন্ত্রণা! না, তিনি রক্ষাই পেয়েছেন!

জয় বাবা কেদারনাথ!

এর পরে সুদীর্ঘ ইতিহাস!

একটু একটু ক'রে মৃতদেহের সুকঠিন বন্ধন যদি বা কাটিয়ে বেরোবার চেষ্টা করেন--লোহার কাঠামোটা বেঁকে চুরে তালগোল পাকিয়ে গেছে—সেটায় আটকে যান।

নানা কৌশল ক'রে—কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় তিনি যখন সেই বিচিত্র নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলেন তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গিরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকার ভয়াবহ সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে সূচীভেদ্য অন্ধকার নেমে এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। তখন কোথাও যাবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। ক্ষত বিক্ষত আড়ষ্ট দেহে পড়ে পড়ে নানা অজানা জন্তু-জানোয়ারের ডাক শুনতে লাগলেন তিনি। দু-একটা ডাক বাঘের ডাক ব'লেই বোধ হ'ল। মনে হ'ল খুবই কাছে ডাকছে। কিন্তু মনে মনে এই ব'লে আশ্বাসলাভ করলেন শচীনবাবু—এই নির্জন পাহাড়ে অঞ্চলে খুব দূরের ডাকও খুব কাছে ব'লে মনে হয়।

তবু একটু আগে যে সান্নিধ্য ভয়াবহ বলে বোধ হচ্ছিল সেই মৃতদেহপূর্ণ লৌহপিণ্ডের দিকেই ঘেঁসে বসলেন। মরা হোক—তবু মানুষ!

অসহ্য তৃষ্ণা। আঘাতে বোধহয় জ্বরও এসেছে, তাইতে তৃষ্ণা আরও অসহ্য ব'লে বোধ হচ্ছে। আর পারা যায় না।

অথচ উপায়ই বা কী?

ক্রমে ক্রমে আবারও চৈতন্য আচ্ছন্ন হয়ে আসে শচীনবাবুর।

শুকনো পাতা ও পাথরের ওপর পদশব্দে ঘুম বা আচ্ছন্নভাব কেটে গেল শচীনবাবুর। তিনি তাকিয়ে দেখলেন, চারদিকে বেশ ফরসা হয়ে গেছে। প্রথমেই চোখ পড়ল উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়—সেখানে রীতিমত রোদ ঝল্‌মল্‌ করছে। প্রথম প্রভাতের সোনালী রোদ।

আঃ! বেঁচে থাকার মত আরাম আছে!

পদশব্দ আরও কাছে এল।

চেয়ে দেখলেন কৌপীনবস্ত এক সন্ন্যাসী। রীতিমত জটাজুট-বাঁধা ছাই-মাখা সন্ন্যাসী। হাতে একটি কাঠের কমণ্ডলু। স্তব্ধ হয়ে ভাঙ্গা গাড়ীটার দিকে চেয়ে আছেন, সর্বস্ব-ত্যাগীরও চোখ ছল্ ছল্ করছে এই শোচনীয় মৃত্যুর দিকে চেয়ে!

ক্রমশঃ তাঁর চোখ পড়ল শচীনবাবুর দিকে।

পরিষ্কার উর্দু মিশানো হিন্দীতে বললেন, 'তুমি বেঁচে গেছ বাবা? সবই পরমাত্মার কৃপা।' তারপর হেঁট হয়ে বললেন, 'কাল থেকে পড়ে আছ এমনি? জল খাবে?'

কমণ্ডলু থেকে শচীনবাবুর শুষ্ক জিহ্বায় ঠাণ্ডা, অমৃতের মত জল ঢেলে দিলেন।

'চলো বাবা—উঠতে পারবে? থোড়া দূরে আমার আশ্রম। কাল আমি আশ্রমে ছিলাম না যখন এই কাণ্ড হয়েছে। রাত্রে ফিরেছি—অত কিছুই বুঝিনি। আজ সকালে উঠে দেখতে পেয়েই ছুটে আস্‌ছি!'

শচীনবাবু ওঠবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

আরও যেন ব্যথা হয়েছে তাঁর গায়ে। হাত-পা নাড়বার ক্ষমতা নেই। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তা বুঝলেন। কমণ্ডলু রেখে অনায়াসে ওঁকে তুলে নিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে এক সময় একটি স্রেফ্ শুক্‌নো পাতা দিয়ে বানানো কুটীরে—পাতারই শয্যায় এনে শুইয়ে দিলেন।···

আর কিছু মনে নেই শচীনবাবুর। প্রবল জ্বরে অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে রইলেন কয়েকদিন।

সুস্থ হয়ে উঠে যেদিন বেরোতে পারলেন সেইদিনই গেলেন জায়গাটার খোঁজ করতে। খুঁজেও পেলেন, কাঠ ও কাঁচের গুঁড়ো তখনও ছড়ানো। কিন্তু আর কিছু নেই। সাধুর মুখে শুনলেন, সরকারী লোক এসে সাফ্ ক'রে নিয়ে গেছে।

আরও একদিন বাদে সাধু তাঁকে ওপরের লোকালয়ের পথটা দেখিয়ে দিলেন। পকেটে টাকা-কড়ি সবই ঠিক ছিল, শচীনবাবু কিছু দিতে গেলেন সাধুকে—সাধু হেসেই অস্থির। টাকা কি হবে? তিনি ত খান কিছু কন্দ আর পাকা ফল, যা এ পাহাড়ে মেলে। কুলই বেশী। পাহাড়ী গরু এসে দুধ দিয়ে যায় তাঁকে। পয়সা কি হবে? এ কদিন শচীনবাবুর জন্যই তিনি দুধ আর আটা বাইরে থেকে চেয়ে আনছিলেন। তাঁর দরকার নেই।

অপ্রতিভ হলেন শচীনবাবু। অবাকও হলেন রীতিমত। টাকা চায় না এমন লোক এই প্রথম দেখলেন তাঁর জীবনে। দুখানা দশটাকার নোট বার করেছিলেন—কম নয় টাকাটা—আবার পকেটে পুরে নমস্কার জানিয়ে রওনা হলেন।

সাধু যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে সোজা গিয়ে একসময় একেবারে দেবপ্রয়াগেই পৌছলেন। অপেক্ষাকৃত জনবহুল জায়গা, শহর বললেই হয়। এখানে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শচীনবাবু। ঐ গভীর অরণ্যে মানুষ শখ করে দু-একদিন থাকতে পারে, কর্মকোলাহল-মুখরিত নাগরিক জীবনের পর মন্দ লাগে না এক-আধদিন, তাও দল বেঁধে এলে তবে। চারিদিকে অভ্রংলিহ পাহাড় —যেন উঁচু পাঁচিল দেওয়া জেলখানা। বেলা আটটার আগে সকাল হয় না, আবার চারটে বাজতে না বাজতে চারিদিকে অন্ধকার ক'রে আঁসে।

এমন জায়গায় মানুষ থাকে!

দেবপ্রয়াগে পৌছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পাণ্ডার বাড়ি পৌছলেন। পাণ্ডাদের বাড়ি পুরুষ কেউ নেই, সকলেই যাত্রী নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাড়ির মেয়েরা প্রথমটা চিনতেই পারে না ওঁকে। কাপড় চোপড়ের যা দুরবস্থা, ক'দিন ত একবস্ত্রেই কাটালেন বল্‌তে গেলে। তার ওপর দাড়ি গোঁফ কামানো হয় নি— জংলির মত দেখতে হয়েচে। যাই হোক—পরিচয় পেয়ে অবশ্য খাতির করল। চা খেয়ে বাঁচলেন কদিন পরে। ফরসা কাপড়-জামা কিনলেন, বিছানাও কিনলেন কিছু কিছু। দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে মৃতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তর্পণ করলেন। তারপর আহারাদি সেরে বিকেলের বাস্-এই রওনা হয়ে গেলেন ঋষিকেশ। বাস চাপবার আর সাহস ছিল না—কিন্তু দ্রুত ফেরবার ইচ্ছাতেই সে আশংকা দমন করলেন।···

ঋষিকেশ পৌছতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। সেদিনের মত একটা ধর্মশালাতেই উঠলেন। দুর্বল শরীর প্রবল ঝাঁকানীতে আরও জখম হয়ে গেছে। বিশেষত পাহাড়ের পথে নামবার সময় বারবার বমি আসছিল। সেটা সামলাতে গিয়ে মাথা ধরে উঠেছে বেজায়। ধর্মশালাতে পৌছেই শুয়ে পড়লেন। এ কদিন পাতার বিছানায় শুয়ে বাঘের চামড়া মুড়ি দিয়ে দিন কেটেছে। আজ ত রীতিমত বিছানা। আরামে চোখ বুজে এল।

পরের দিন সকালে যখন ঘর ছেড়ে চায়ের চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লেন—তখন অনেকটা সুস্থ বোধ হচ্ছে। একটা দোকান থেকে কিছু গরম জিলাপী সংগ্রহ

ক'রে খুঁজে খুঁজে একটা চায়ের দোকান বের করলেন। চা ফরমাস ক'রে তাদের বেঞ্চিতে জাঁকিয়ে বসতেই নজরে পড়ল সেই বেঞ্চেরই অপর পাশে খান-দুই বাংলা খবরের কাগজ পড়ে রয়েছে। আর কোন খদ্দের চা খেতে এসে ফেলে গেছেন বোধ হয়। কারণ পরিপাটি পাটকরা, একটার খাঁজে আর একটা—এই অবস্থায় পড়ে আছে।

খবরের কাগজ এতকাল পরে—তায় বাংলা। সাগ্রহে টেনে নিলেন শচীন বাবু। পুরোনো কাগজ, তবে বেশী পুরোনো নয়। দিন তিনেক আগেকার। এ কদিনের খবর ত কিছুই প্রায় জানেন না। ভালই হ'ল।

কাগজ খুলতেই প্রথম চোখ পড়ল তাঁর—নিজেরই একটি ছোট ছবির দিকে।

এ কী কাণ্ড!

তাঁর ছবি কাগজে কেন? কে দিলে ছাপতে!

ওহো—

এ যে শোক-সংবাদ! ওরা ধরেই নিয়েছে যে তিনি মারা গেছেন।

তা আর কীই বা ভাবতে পারে! এক বাস লোক সবাই ম'ল কেবল তিনিই বেঁচে রইলেন—ভাবা কঠিন বৈকি!

তবু একটু ধাক্কা খেলেন যেন মনে মনে। কেন, কে জানে।

সময় লাগল একটু সামলে নিতে। তারপর আবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন। বেশ ভাল ক'রেই খবরটি ছাপা হয়েছে:—

"কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর শোচনীয় মৃত্যু"

"তীর্থপথে বাস দুর্ঘটনার শোচনীয় পরিণতি।"

"কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ব্রজরাণী চিত্রগৃহের মালিক শচীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি কেদার-বদরীর পথে এক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। গত ২৩শে মে তিনি অপর আত্মীয়স্বজনদের সহিত সস্ত্রীক তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। যেদিন দেবপ্রয়াগ হইতে"···ইত্যাদি।

বিরাট খবর।

ঘটনাটা মোটামুটি ঠিকই দেওয়া হয়েছে। সব শেষে তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত বিবরণও কিছু আছে।

"তিনি দানশীল, পরোপকারী, উদার হৃদয়, ভগবদ্ভক্ত ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে

কিন্তু নিজের সেই দুর্দিনের কথা ভুলেন নাই। শুধু আত্মীয়স্বজন নহে, শুধু বন্ধুবান্ধবরাও নহে,—একান্ত অপরিচিত লোকও কখনও তাঁহার নিকট হইতে বিমুখ হইয়া ফেরে নাই। দীর্ঘদিন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও তিনি কদাচ মিথ্যা ভাষণ বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার সহকর্মী ও সমব্যবসায়ীরা সকলেই মুগ্ধ ছিলেন।...কর্মচারীগণের সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ব্যবসায়ী জগৎ নহে—সমগ্র বাংলা দেশেরই এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল।"

এ কী লিখেছে এরা? কার কথা লিখেছে?

তাঁর কথা? তাঁর গুণাগুণ?

পরিচিত কেউ উপস্থিত না থাকলেও তিনি কেমন যেন একটু লজ্জাবোধই করলেন। যদিও বেশ জানেন যে পাঞ্জাবী চা-ওয়ালা বাংলা জানে না এবং পড়তে পারবে না, তবু যেন তাঁর মনে হ'ল সে তাঁর দিকে চেয়ে সকৌতুকে হাসছে মুচ্‌কি মুচ্‌কি।

তাড়াতাড়ি পিরীচে ঢেলে চা-টা গলাধঃকরণ ক'রে বেরিয়ে এলেন।

ওঁর মনে হ'ল ওঁরই অন্তরের কোন সত্তা যেন তাঁকে তাড়া করেছে।

ভেবেছিলেন আগেই বাড়িতে একটা টেলিগ্রাম করবেন। শুধু স্ত্রীর খবরটা পান্‌নি বলেই দেরী করছিলেন। দেবপ্রয়াগের থানায় জানিয়ে এসেছেন। দুটি টাকাও দিয়ে এসেছেন—খবর পাওয়া মাত্র এখানে টেলিগ্রাম করতে। যতদূর জানা গেছে—কেউই বাঁচেনি। ঐত কাগজেও তাই লিখেছে—'বাস্‌-এর একজন যাত্রীও রক্ষা পায় নাই।'

তবু—। যদিই তাঁর মত কোন অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে থাকে?

এখন মনে হ'ল একটা টেলিগ্রাম ক'রে নিজের খবরটা অন্ততঃ ছেলেদের দেন। কিন্তু তখনও ডাকঘর খোলে নি। অপেক্ষা করতে হবে।...আবার মনে হ'ল অত তাড়াই-বা কি? শ্রাদ্ধশান্তি ত চুকেই গেছে। পয়সা যা খরচ হবার সবই হয়েছে। এখন ধীরে সুস্থে খবর দিলেই চলবে।

ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ধারে এসে বসলেন শচীনবাবু। বড় শান্তির জায়গা। কুল্ কুল্ করে বয়ে যাচ্ছেন গঙ্গা।—কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল খরস্রোতে পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে ফেনায়িত হয়ে উঠছে—সবটা মিলিয়ে অপূর্ব!

অনেকক্ষণ বসে রইলেন তিনি।

ভাবতে লাগলেন ঐ খবরের কথাটা।

অমনিই লিখতে হয় নাকি? সকলের বেলাই কি ঐভাবে লেখা হয়?

আর পাঁচজনের নামে যা পড়েন—তারও কি মূল্য এই?

এই প্রসঙ্গে বহুদিন পর তাঁর নিজের জীবনের কথা মনে পড়ল। দীর্ঘ যে জীবন তিনি পেছনে ফেলে রেখে এসেছেন।

ভগবদ্ভক্ত? ভগবান সম্বন্ধে কখনই তিনি কিছু ভাবেন নি। মানসিক করার মত দেবদেবী ছাড়া কোন ভগবান কোথাও আছে কি না এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয় নি তাঁর। অবশ্য হ্যাঁ—একটা দিন তিনি ডেকেছিলেন বটে—যেদিন একেবারে সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সেদিন তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছিলেন।

'হে ভগবান রক্ষা করো বাবা। দেখো যেন একেবারে না ডুবি।' এমনি-ভাবে সেদিন ডেকেছিলেন। সারারাত ঘুমোতে পারেন নি—কাতর ভাবে ডেকেছিলেন সবাইকে। জোড়া সত্যনারায়ণ, কালিঘাটে জোড়া পাঁঠা, সংকটাকে বেনারসী সাড়ী—মায় পাড়ায় শীতলা মাও বাদ যাননি। সেসব মানসিকের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি বটে কিন্তু ডেকেছিলেন তিনি খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই। কে জানে সেই মানসিক শোধ না করার অপরাধেই হয়ত তাঁর এমন ভরাডুবি হল।

পরোপকারী? দানশীল!

হ্যাঁ—। তা লোককে খাটিয়ে নিয়ে পয়সা দেওয়া যদি পরোপকার হয় ত তা তিনি করেছেন। কিন্তু সেটাকে ঠিক দান বলা যায় কি? লোকে যাকে দান বলে তা তিনি করেন নি কোন দিন। অনেকে অনেক বার এসে ধরেছে তাঁকে। হাসপাতালটাই বেশি—রকমারী হাসপাতালের জন্য তা-বড় তা-বড় লোক এসে তাঁকে বহুবার ধরেছে। কিন্তু তিনি দেন নি। কঠোর পরিশ্রমের ধন যাকে "দশ আঙ্গুলে খাটা কড়ি' বলে—তা তিনি অপরকে দেবেন কেন? কেউ কি তাঁকে কোনদিন একটা পয়সা দিয়েছে? ঐ ভয়ে তিনি কখনও কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বাড়ি-ঘর করাবার কন্‌ট্র্যাক্ট নেন নি। প্রথমত শেষের দিকের পেমেন্ট পেতে দেরী হয়—শেষ্‌ টাকাটা জোগাড় হ'তে চায় না কিছুতেই। তারপর—একেবারে না হ'লে হয় ত ধরে পড়বে—'এটা স্যার আপনি আমাদের দানই করুন না!' না, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

ঐ একটা কথা ওর ভেতর ষোল আনা সত্যি লিখেছে বটে। 'সামান্য অবস্থা

হইতে—' ঐ কথাটা। চাকরী করতে করতেই এটা-ওটা ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। প্রথম প্রথম এক বন্ধুর সঙ্গে ছুটির পর বড়বাজারে শুধু ঘুরেই বেড়াতেন। পুরো একটি বছর এইভাবে ঘুরেছেন। তারপর ঘাঁৎ-ঘোঁৎ জেনে নিয়ে একটু একটু ক'রে কাজে নেমেছেন, খুব সন্তর্পণে। যখন দেখেছেন সারা দুপুর খাটার মাইনের চেয়ে সন্ধ্যাবেলা দু ঘণ্টা খাটুনির মজুরী ঢের বেশী পাচ্ছেন, তখনই চাকরী ছেড়ে সোজাসুজি ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন।

তবে 'যে এসেছে তাকেই' সাহায্য করার কথাটা ঠিক নয়। কেনই বা করবেন? তাঁকে কে করেছে? কেউই কাউকে করে না। নিজের বুদ্ধি আর উদ্যমে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলতে হয়। সংসারে ঐ এক শ্রেণীর লোক আছে—তারা কেবল পরের মুখ চেয়ে থাকে। ভাবে আত্মীয়রা বন্ধুরা খেটে খুটে পয়সা করেছে শুধু তাদের জন্যে। সামনে তোষামোদ করে—পেছনে বোকা বলে। না—এদের তিনি যে কোনদিন কোন সাহায্য করেন নি, তার জন্য তিনি আজ অনুতপ্ত নন। ঠিকই করেছেন। তোষামোদকে তাঁর অত্যন্ত ঘৃণা—তোষামোদকে আর ভিক্ষাবৃত্তিকে।

মিথ্যাভাষণ আর প্রবঞ্চনা?

নির্জনে বসেও লাল হয়ে উঠলেন শচীনবাবু কথাটা মনে ক'রে। না, সত্য পথে অবিচল থাকতে তিনি পারেন নি। ওটা বিশ্বাসও করেন না। যে বন্ধুটি তাঁকে প্রথম উৎসাহ দিয়েছিল—একটু একটু ক'রে তার কাছ থেকে সাতটি হাজার টাকা তিনি নিয়েছিলেন, সেটা আর শোধ করা হয় নি। লভ্যাংশের অর্ধেক ভাগ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ সে হঠাৎ মারা গেল। লেখাপড়া ছিল না। তার স্ত্রী জানত—এসে দাবীও করেছিল কিন্তু শচীনবাবুর পক্ষে তখন কথাটা উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় কি? স্বীকার করলেই ঐ সাত হাজার টাকা বার ক'রে দিতে হ'ত তখনই—তাছাড়া লাভের অর্ধেক, চুলচেরা। সেও কোন্ না ছ' সাত হাজার হ'য়ে দাঁড়াত। অতগুলো টাকা হাতে ছিলও না—আর কারবার থেকে ঐ টাকা তখনই বার করতে গেলে পথে বসতে হ'ত। কারবার চলত না। কাজেই ঝেড়ে জবাব দিয়েছিলেন।…তারপর কি আর নতুন করে সে টাকা দিতে যাওয়া যায়?

সে ছাড়াও দু-চার জনের টাকা তিনি মেরেছেন। নানা ঘটনাচক্রে সেটা হয়েছে—কিন্তু এটা ঠিক যে, সতর্ক হবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। টাকাটা শোধ দেবার জন্য খুব যে ব্যস্ত হয়েছিলেন তাও মনে হয় না।

নানাভাবে ঠকিয়েছেন নানা লোককে। কিন্তু কি করা যাবে? পৃথিবীর সাংসারিক গঠনটাই এই রকম। তুমি না ঠকালে লোকে তোমাকে ঠকাবে। ঠকতে তিনি রাজী নন। চিরদিনই জেদী। উন্নতি করতেই হবে—যেমন ক'রে হোক, এই ছিল তাঁর জেদ। তার ফলে হয়ত—তাঁকে ঠকাতে হয়েছে। এমন কি কর্মচারীদেরও। তা কি করবেন! তারা দিনরাত চেষ্টা করছে কেমন করে বেগ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পয়সা দুটো বেশী নেবে—তিনি যদি চেষ্টা ক'রে থাকেন যে কি ক'রে তাদের দু'পয়সা কম দেবেন ও সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়। আত্মরক্ষার অধিকার সকলকারই আছে।...পুত্রবৎ? তা একরকম বটে—পুত্ররা ঐ রকম ব্যবহার করলে তিনি পুত্রদেরও সহজে ছেড়ে দিতেন না।

বেলা বেড়ে ওঠে। উঠে পড়েন শচীনবাবু। স্নানাহার আছে। এখানে স্নানটা সেরে নিতে পারলে হ'ত কিন্তু—গামছা আনেন নি। ধর্মশালাতেই সেরে নেবেন—আহারের হোটেল ত আছেই।

যাবার পথে ডাকঘরের সাম্‌নে দিয়েই গেলেন কিন্তু কে জানে কেন, 'তার' করার কথা তখন আর মনে রইল না।

ছেলেদের কথাই ভাবছিলেন অবশ্য।

কথাটা ঠিক নয়। ছেলেরাও চায় তাঁর কাছ থেকে টাকা বার ক'রে নিতে। তা তিনি জানেন। কিন্তু কর্মচারীদের মত তাদের ত জব্দ করতে পারেন না। ছেলেরা তাঁকে কৃপণ ভাবে, তারা চায় খুশী-মত খরচ করতে। ব্যবসা সম্বন্ধেও তাদের ধারণা আলাদা। তারা চায় বড় ক'রে ব্যবসা ফাঁদতে—ধনী ব'লে এবং ধনী ব্যবসায়ী ব'লে যাতে তারা গণ্য হ'তে পারে।

হয়ত তারা তাঁর মৃত্যু-সংবাদে খুশীই হয়েছে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে পুত্রবধূরাও খুশী হবে। স্বাধীন হবে তারা।

হয়ত বা সেই কৃতজ্ঞতাতেই অমন ক'রে শোক-সংবাদটা প্রকাশ করেছে। ওঁর বড় ছেলের বিজ্ঞাপন লেখার হাত খুব ভাল—সে-ই হয়ত লিখে দিয়েছে সংবাদটা। সব খবরের কাগজেই তাঁদের বিজ্ঞাপন থাকে, জানাশুনো ত আছেই!

এখন তিনি বেঁচে আছেন শুন্‌লে তারা কি করবে?

আনন্দিত হবে না খুব—এটা তিনি জানেন।

হয়ত অপ্রতিভ হবে। হয়ত ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ করার জন্য অনুতপ্ত হবে। মিছি মিছি এতগুলো টাকা গেল।...

অন্যমনস্ক হয়েই স্নানাহার সারেন শচীন বাবু। প্রচণ্ড রোদ বাইরে, হু হু ক'রে তপ্ত বাতাস বইছে। তবু ঘরে বসে থাকতে পারেন না। ভিজে গামছাটি মাথায় চাপিয়ে গঙ্গার ধারে ছায়া-শীতল স্থানে এসে বসেন।

মধ্যাহ্নে আরও নির্জন হয়ে উঠেছে গঙ্গাতীর। কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন নেই।

আশ্চর্য!

ঐ শোক-সংবাদের বিশেষণগুলো যেন তাঁকে বড়ই বিচলিত করেছে।

আজ মনে হচ্ছে ঐ বিশেষণগুলো যদি তাঁর প্রাপ্য ব'লে গ্রহণ করতে পারতেন ত মন্দ হ'ত না। এই ত মানুষের জীবন, এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে যেতে বসেছিল। শেষ হয়ে গেলও তাঁর স্ত্রীর। তাঁর স্ত্রীর জন্য পুত্রবধূরা ছাড়া সকলেই দুঃখ করবে তা তিনি জানেন। বহু গোপন দান ছিল গৃহিণীর—তার জন্য স্বামীর কাছে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। বিশেষ ক'রে ঝি-চাকরদের ও আত্মীয় স্বজনদের—স্বামীকে লুকিয়ে প্রায়ই টাকা-পয়সা দিতেন। কিন্তু শচীন বাবুর জন্য কেউ দুঃখ বোধ করবে না।···

অথচ আজ মনে হচ্ছে—মানুষের এই ভাল বলার, শোক করার কিছু মূল্য আছে। অথবা এইটেরই মূল্য আছে। এতদিন যে সব ভুলে একমাত্র টাকারই সাধনা ক'রে এসেছিলেন—সে টাকার কতটুকু মূল্য? এক মুহূর্তের দুর্ঘটনাতেই সব শেষ। ও টাকা ত তাঁর কোন উপকারেই আসত না। এ পৃথিবী ত্যাগ করার পর আর যেটুকু স্বীকৃতি বা স্নেহ পৃথিবী থেকে চায় মানুষ—তা টাকা জমিয়ে পাওয়া যায় কি? বরং খরচ করলেই পাওয়া সম্ভব।

ভগবান? না ভগবানকে তিনি কোন দিন ভাবেন নি। ভেবেছেন শুধু বর্তমান জীবনকেই। সামান্য খণ্ডকালকে তিনি সমস্ত সত্তা দিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন, নিরবধি কালের কোন হিসেব রাখেন নি।

অনন্ত কালের কাছে এই জীবন কতটুকু—তা ভাবতে কেউ তাঁকে শেখায়ওনি।

এখন ফিরে গেলেও কি তা ভাবতে পারবেন তিনি?

কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবেন? মোড় ফেরাতে পারবেন নিজের জীবনের? মনে ত হয় না। বহু পুরাতন অভ্যাস সেই ভুল পথেই তাঁকে চালনা করবে। আর এই শোক-সংবাদের বিশেষণগুলো তাঁকে বিদ্রূপ করবে তাঁর স্মৃতিপথে। প্রকাশ্যে ঐ বিশেষণ নিয়েই বিদ্রূপ করবে তাঁর কর্ম্মচারীরা, তাঁর দূর সম্পর্কের হতাশ আত্মীয়-স্বজনরা।

এটা মিথ্যা প্রমাণ করতে ফিরে যাবেন, না মিথ্যাটাকেই সত্য মনে করবার সুযোগ দেবেন ?···

দিন গড়িয়ে অপরাহ্নে পৌছল ; অপরাহ্ন পৌছল সন্ধ্যায়।

শচীন বাবু বসেই রইলেন এক ভাবে। বহু রাত্রে ধর্মশালায় ফিরে গেলেন আবার।

সে দিনও ছেলেদের কাছে সংবাদ দেওয়া হ'ল না। পরের দিনও না, তার পরের দিনও না।

অবশেষে একদিন আবার শচীন বাবু যাত্রা করলেন দেব-প্রয়াগের দিকে। হয়ত সে সাধুর পর্ণকুটীর এখনও সম্পূর্ণ ভুলে যাননি। সে পথ একদিন খুঁজে পাবেন।

মিথ্যাই মধুর। থাক সে মিথ্যা সত্য হয়ে।

বিশ্বাসের বাইরে

অনেক ভূতের গল্প আপনারা শুনেছেন—আজ আপনাদের এক সত্যিকারের ভূতের গল্প শোনাবো। তবে তত ভয়ঙ্কর নয়।

অনেকদিন আগের কথা অবশ্য। এখন থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে এ নাটকের শুরু। এর পাত্র-পাত্রী সবই ঐতিহাসিক। কিন্তু ঘটনাটি ঠিক এই রকমই ঘটেছিল কিনা তা আজ প্রমাণ করার উপায় নেই। কারণ এতদিন আগেকার ঘটনা—বহু কাহিনী হয়ত এতে সংযোজিত হয়েছে—তার ফলে আজ এটা একটা প্রবাদে দাঁড়ালেও এর ভেতর থেকে সত্য রূপটি বেছে বার করা কঠিন। বিলেতের বহু কবি ও ঔপন্যাসিক এই ঘটনা দিয়ে নানা কাব্য-কাহিনী রচনা করেছেন, মায় স্যার্ ওয়াল্‌টার স্কট্ পর্যন্ত।

সে কথা থাক—আসল গল্পে ফিরে আসি।

এ নাটকের নায়িকা হচ্ছেন লেডি নিকোলা সোফিয়া বেরেস্‌ফোর্ড—লর্ড গ্লেন্‌লির কন্যা এবং স্যার্ ট্রিস্ট্রাম বেরেস্‌ফোর্ডের স্ত্রী। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই স্কচ্—অর্থাৎ স্কট্‌ল্যাণ্ডের অধিবাসী।

নাটক বলছি এই জন্যে যে এ ঘটনার শুরু হয় খুবই নাটকীয় ভাবে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, নিকোলা সকালবেলা খাবার টেবিলে এসে বসলেন তাঁর ডান হাতের কব্জীতে একটা কালো ফিতে বাঁধা। দীর্ঘ দিনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক—ভালো ক'রে তাকাবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু ঐ কালো ফিতেটা চোখে পড়ায় স্যার ট্রিস্ট্রাম বিস্মিত হয়েই মুখ তুলে তাকালেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের মুখ-চোখও তাঁর খুব শুক্‌নো লাগল। চোখের কোলে কালি। যেন সারারাত ঘুম হয় নি।

'কী হয়েছে গো তোমার?'

'কিছু না। আজকের ডাক এসেছে?' প্রশ্ন করেন নিকোলা সোফিয়া।

'না, এখনও আসে নি। কিন্তু হাতে ও ফিতেটা বেঁধেছ কেন? বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

'ও প্রশ্নটা আপাতত থাক। সত্যি জবাব দিতে পারব না। কিন্তু ডাক কি এখনও আসেনি? অন্য দিন ত এসে যায়।'

'না। এলে চাকর দিয়ে যেত।'

নিকোলা তবু স্থির থাকতে পারলেন না। একজনকে পাঠালেন খোঁজ করতে। সেও ফিরে এসে জানাল ডাক এখনও আসে নি।

স্যার্ ট্রিস্ট্রাম আরও বিস্মিত হলেন।

'কেন বলো দিকি চিঠির জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ ?'

'বলব—পরে।' সংক্ষেপে উত্তর দেন লেডী বেরেস্‌ফোর্ড।

খাওয়া শেষ হ'লে ওঁরা বসবার ঘরে এলেন। কিন্তু লেডী বেরেস্‌ফোর্ড স্থির হয়ে বসতে পারেন না—চিঠি এসেছে কোন ? চিঠি ?

অবশেষে স্যার ট্রিস্ট্রাম সন্দিগ্ধ ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন, 'কার চিঠি আসবে ? তার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথাই বা কেন ?'

স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করা তখনকার দিনে খুব দুর্লভ ব্যাপার ছিল না। স্বামীর সংশয়টা ক্রমশ আশঙ্কার খাতে বইছে দেখে লেডী বেরেস্‌ফোর্ড মুখ খুললেন, 'লর্ড টাইরোনের মৃত্যু সংবাদ প্রতীক্ষা করছি। যে কোনও মুহূর্তে সে খবর আসতে পারে।'

'তার মানে ? তিনি কি খুব অসুস্থ ? কৈ আমরা ত কোন খবর পাই নি ? তোমাকে তাঁর অসুখের খবর কে দিলে ?'

'কেউ দেয়নি কিন্তু খবরটা তবু ঠিক। তিনি গত মঙ্গলবার ভোর চারটেয় মারা গেছেন!'

'বল্লেছে তোমাকে! যত সব গাঁজাখুরী কথা!···পরশু ভোর চারটেয় মারা গেছে—এরই মধ্যে সে খবরটি তোমাকে কে দিলে ?···কিছু খারাপ স্বপ্ন দেখেছ বুঝি ? আর তাই নিয়ে মন খারাপ করছ ?'

'আচ্ছা তুমি দ্যাখো।' স্ত্রী উত্তর দিল।

আর্ল অফ টাইরোন—নিকোলা সোফিয়ারই বাল্যবন্ধু ও সহপাঠি—জন। শৈশব ও বাল্যে একই সঙ্গে খেলাধূলো পড়াশুনো করেছেন—সোফিয়ার বিয়ের পরও যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। স্ত্রীর বন্ধু ক্রমশ স্বামীর বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল।

স্যার্ ট্রিস্ট্রাম যতই উড়িয়ে দিন—একটু পরেই চিঠি এসে পৌছল। আর্ল অফ টাইরোনের বাড়ির সরকার চিঠি লিখে জানিয়েছেন—তাঁর মনিব জন, আর্ল অফ টাইরোন্ আর ইহলোকে নেই। গত মঙ্গলবার শেষরাত্রে হঠাৎ পরলোকে গমন করেছেন!

স্যার ট্রিস্ট্রাম স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মুখে কথাই সরে না! তারপর যখন অতিকষ্টে তিনি কণ্ঠস্বর ফিরে পেলেন তখন প্রশ্ন করলেন, 'কেমন করে জানলে তুমি ?'

'তা জানতে চেয়ো না। তবে আর একটা সুখবর দিই—তুমি ছেলে ছেলে ক'রে অস্থির হও, আস্‌ছে বছরের মধ্যেই তোমার ছেলে হবে!'

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড বন্ধুর মৃত্যু সংবাদের চিঠিটা হাতে ক'রে ওপরে উঠে চলে গেলেন।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের এ কথাটাও ফল্‌ল। তাঁদের একটি ছেলে হ'ল এক বছরের মধ্যেই।

স্যার ট্রিস্ট্রাম কিছুতেই ভেবে পান না কেমন ক'রে তাঁর স্ত্রী এ ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। বারবার প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোন সদুত্তর পান না। শুধু তাই নয়, সেই দিনটি থেকে নিকোলা সোফিয়া প্রত্যহ, দিনরাত ডান হাতের কব্জীতে কেন যে একটা কালো ফিতে জড়িয়ে রাখেন তারও কোন কৈফিয়ৎ পান না স্যার ট্রিস্ট্রাম, জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর মেলে, 'ও প্রশ্নটা থাক্। জানতে চেয়ো না—সত্যি উত্তর পাবে না। অথচ, তুমি ত জানো তোমার কাছে মিছে কথা বলতে চাই না আমি।'

অগত্যা মনের কৌতূহল মনেই চেপে রাখতে হয় স্যার ট্রিস্ট্রামকে, তবে বেশি দিন না—ছেলে হবার বছর কয়েকের মধ্যেই স্যার ট্রিস্ট্রাম মারা গেলেন।

নিকোলা সোফিয়ার অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের কাছে শোনা গেল যে এ ঘটনার কথাও তিনি আগে জানতেন। স্বামীর মৃত্যুর ঠিক তারিখটা পর্যন্ত তাদের বলে রেখেছিলেন।

লোকে যখন সবাই সান্ত্বনা দিতে এল—তখন আবারও এক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন সোফিয়া—'আমাকে আবার বিয়ে করতে হবে—কারণ এখনও অনেকগুলি ছেলেপুলে আছে আমার অদৃষ্টে।' তারপর একটা ছোটখাট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যদিও জানি যে সে বিয়ে আমার সুখের হবে না। সারা জীবন জ্বল্‌তে হবে আমাকে সে স্বামী নিয়ে।'

'তবে করবেই বা কেন সে বিয়ে?' কেউ কেউ অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে কপালটা দেখিয়ে দেন শুধু—ভাগ্য।

হ'লও তাই। পাকে-চক্রে কর্ণেল জর্জেস্ বলে একটি লোককে বিয়ে করলেন নিকোলা সোফিয়া। সে বিয়ে তাঁদের সুখের হ'ল না কিন্তু ছেলেপুলে হ'ল অনেকগুলি।

তবে একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী মিল্‌ল না তাঁর। তিনি বলে রেখেছিলেন যে তাঁর সাতচল্লিশ বৎসর বয়স যেদিন পূর্ণ হবে—সেই দিনই তিনি মারা যাবেন। নিজের ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন বিশ্বাস ছিল তাঁর যে তিনি উইল টুইল তৈরী ক'রে ঐ দিনটির জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। পাদ্রী ডেকে কন্‌ফেশান (স্বীকারোক্তি—পাপের বা অপরাধের) করা পর্যন্ত হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কি? নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সে জন্মদিনটা কেটে গেল—

মরা ত দূরের কথা আঁচড় পর্যন্ত লাগল না তাঁর গায়ে।

এই ঘটনার পর নিকোলো সোফিয়া খুব নিশ্চিন্ত হ'লেন। যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছেন এই ভাবে হাসি-খুশীতে দিন কাটাতে লাগলেন।

ফলে পরের জন্মদিনটিতে তিনি বেশ একটি ছোটখাট উৎসবেরই আয়োজন করলেন। বহু লোক নিমন্ত্রিত হ'ল—তার মধ্যে ওঁর বাপের বাড়ির দেশের পাদ্রীও ছিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় ভোজের আসরে বসে সবাই যখন ওঁর উনপঞ্চাশৎ জন্মদিনের শুভকামনায় মদ্যপান করতে যাবেন তখন সেই পাদ্রীটি হঠাৎ বলে বসলেন, 'আপনারা ওঁর বয়স কিন্তু খামোকা এক বছর বাড়িয়ে দিচ্ছেন।'

'তার মানে?' সবাই ত অবাক্।

অবাক্ নিকোলা সোফিয়াও। বরং তাঁর যেন মুখ একটু শুকিয়েও উঠেছে ইতিমধ্যে। তিনি বললেন, 'তার মানে? আমি ত এই আটচল্লিশ পূর্ণ করলুম আজ।'

'মাপ করতে হচ্ছে। আজ আপনি সাতচল্লিশ পূর্ণ করে আটচল্লিশে পড়লেন!'

'কে বললে?'

একজন পেছন থেকে বললেন, 'ওঁর বয়স কত উনি জানেন না?'

পাদ্রী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'না। সেদিন হঠাৎ আমার গির্জের পুরোনো খাতা-পত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে আপনার জন্মের খবর লেখাটা নজরে পড়ে গেছে। আমি ঠিকই দেখেছি—আজ আপনার সাতচল্লিশ পূর্ণ হ'ল। সে খাতায় আপনার বাবার নিজের হাতে সন তারিখ ঘণ্টা সব লেখা আছে—ভুল হ'তে পারে না।'

নিকোলা সোফিয়ার মুখ আরও শুকিয়ে উঠল। তিনি একেবারে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা যদি হয় ত মাত্র আর দু-তিন ঘণ্টা বাকী আছে আমার পরমায়ুর।'

ভোজ সভা অকালে পণ্ড হ'ল। সকলেই বিমর্ষ মুখে পাদ্রীকে গাল দিতে দিতে বাড়ি ফিরে গেলেন। দু-একজন বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এটা কুসংস্কার কিন্তু সোফিয়া দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আমি ভাল ক'রেই জানি—আপনারা কালই খবর পাবেন।'

সবাই চলে গেলেন, কেবল একটি মাত্র বান্ধবী রইলেন ওঁর কাছে।

ঘণ্টা দুই পরেই খবর পাওয়া গেল যে নিকোলা সোফিয়া আর ইহলোকে নেই। আকস্মিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে!

এই যে বিপুল রহস্য—এ বোধ হয় মনুষ্য সমাজের অজ্ঞাতই রয়ে যেত যদি না ঐ বান্ধবীটি শেষ মুহূর্তে নিকোলা সোফিয়ার কাছে থাকতেন। মরবার আগে তাঁকেই বলে গিয়েছিলেন সব কথা—যে বিরাট রহস্য এই দীর্ঘকাল বোঝার মত তাঁর বুকে চেপে বসেছিল তা বুকের প্রাণস্পন্দন চিরকালের মত স্তব্ধ হবার আগেই নামিয়ে যেতে পেরেছিলেন তিনি।

কথাটা অনেক দিনের। ওঁদের বাল্যকালের কথা।

তখন স্কটল্যাণ্ড অসংখ্য কুসংস্কারের দেশ। ভূত, প্রেত, ডাইনি—সবকিছুই বিশ্বাস করে ওরা। শুধু দৈবক্রমে যে শিক্ষকের কাছে এরা দুজন পড়েছিলেন—নিকোলা সোফিয়া ও লর্ড টাইরোন, তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি ওদের বুঝিয়েছিলেন যে ভূত প্রেত বাজে কথা। মৃত্যুর পরপারে আত্মার আর কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ?'—চার্বাকের কথা একেবারে। যদিও আত্মা থাকে ত সে ঘুমিয়ে থাকে—শেষ বিচারের দিনটির জন্য—বাইবেলে যেমন লেখা আছে। অন্য কোনরকম বিদেহী জীবন যাপন করে না এটা ঠিক।

বারবার শুনতে শুনতে এই বিশ্বাসটিই এঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। পরে নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন এঁরা—কিন্তু এই বিশ্বাসেরই সমর্থন খুঁজেছেন সে আলোচনার মধ্যে।

তারপর এল একদা এক ভয়ঙ্কর রাত্রি। লেডী বেরেসফোর্ড যেদিন কালো ফিতে বেঁধে নেমে এলেন খাবার টেবিলে, তার আগের রাত্রি!

অকস্মাৎ একটা দম্‌কা ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে লেডী বেরেসফোর্ড দেখলেন, কে যেন অন্ধকারে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

চিৎকার করতে গেলেন ভয়ে—গলা দিয়ে স্বর ফুটল না। উঠে বসবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ভয়ে যেন নড়বার ক্ষমতাও লুপ্ত হয়েছে।

সেই আব্ছায়াতেই এটা বুঝতে পারছিলেন যে আগন্তুক তাঁর স্বামী নন। স্বামীর দাঁড়াবার ভঙ্গী অন্ধকারেও অনুভব করতে পারেন তিনি। নিশ্চয়ই চোর ডাকাত কেউ—বা কোন বদমাইস লোক।

যে এসেছিল সে-ই কথা কইলে, 'ভয় নেই। আমি জন।'

একি, লর্ড টাইরোন? এত রাত্রে? এখানে, তাঁর শয়ন গৃহে?

'এখানে তুমি কেমন ক'রে এলে?' তিনি প্রশ্ন করলেন! বন্ধুর গলা পেয়ে তাঁর সাহসও ফিরে এসেছে।

'আমি কাল মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে চারটের সময় মারা গিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস যে কত ভুল তাই জানাতে এসেছি একবার। এই সময়টুকুর মত ছুটি পেয়েছি। মৃত্যুর পরেও জীবন আছে। তুমি বিশ্বাস করো।'

লেডী বেরেসফোর্ডের মুখ দিয়ে কথা বেরোল অনেকক্ষণ পরে। 'কিন্তু কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো একথা? আমি যে স্বপ্ন দেখছি না তার ঠিক কি?'

'বেশ। আমি গোটাকতক ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে যাচ্ছি—এক বছরের মধ্যে তোমার ছেলে হবে একটি। আজ থেকে ঠিক সাত বছর পরে তোমার স্বামী মারা যাবেন। তুমি আবার বিয়ে করবে, সে বিয়ে তোমাদের সুখের হবে না—কিন্তু ছেলেপুলে হবে অনেকগুলি। পূর্ণ সাতচল্লিশ বছর বয়সে তুমি মারা যাবে।'

লেডী বেরেস্ফোর্ড তবু ছাড়বার পাত্রী নন্। তিনি জিদ্ ক'রে বললেন, 'কিন্তু এও ত স্বপ্ন হ'তে পারে। স্বপ্নে ত এমন ভবিষ্যৎ অনেকেই জানতে পারেন বলে শুনেছি। তুমি আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে যাও যে তুমিও এসেছিলে সত্যি-সত্যিই।'

একটু ইতস্তত করে লর্ড টাইরোন ওর মশারীটা তুলে দিলেন।

'এবার বিশ্বাস হবেত?'

'তাই বা কেমন করে হবে? এ ত আমি ঘুমের ঘোরেও নিজেও তুলতে পারি। কাল যদি আমার সেই ধারণাই হয়?'

টাইরোন্ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আর বেশি জিদ্ করোনা সোফিয়া, তার ফল ভাল হবে না।'

'না। না—প্রমাণ চাই আমি, প্রমাণ!' সোফিয়া তবু জোর করেন।

হাসলেন লর্ড টাইরোন্—সে হাসির শব্দ যেন একটা শৈত্যের মত সোফিয়ার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল। লর্ড টাইরোন বললেন, 'দেখি তোমার একটি হাত।'

সাগ্রহে লেডী বেরেসফোর্ড তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

দুটো আঙ্গুলে ক'রে ওঁর কব্জিটা একবার মাত্র স্পর্শ করলেন লর্ড টাইরোন। কয়েক মুহূর্তও নয়—এক মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা, কী ভয়ঙ্কর হিমশীতল সে স্পর্শ। এমন ভয়ঙ্কর, এমন সর্বাঙ্গ-অবশ-করা স্পর্শ যে হয় তা তিনি জানতেন না। সে স্পর্শে লেডী বেরেস্‌ফোর্ড অজ্ঞান হয়ে গেলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

পরের দিন সকালে যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি দেখলেন পরলোকগত লর্ড টাইরোনের দুটি আঙ্গুলের স্পর্শ যেখানে লেগেছিল কব্জির সেই অংশটা যেন শুকিয়ে পুড়ে গিয়েছে। এমনই কদাকার হয়ে গেছে সেখানটা যে সেটা ঢাকবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা ফিতে জড়িয়ে নিলেন কব্জিতে, এ অবস্থা কেউ না দেখতে পায় কোনদিন।

তারপর থেকে কোনদিন কেউ তাঁর কব্জিটা খোলা দেখেনি। আমরণ তিনি ওটা ঢেকে রেখেছিলেন কালো ফিতে দিয়ে। কাউকে বলতেও পারেন নি কথাটা। দুই স্বামীর কেউই জানতেন না।

মরবার আগে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বান্ধবীকে কথাটা বলে গেলেন কিন্তু তবু ফিতেটা খোলেন নি—মরবার পর সকলে খুলে দেখলেন—দুই আঙ্গুলের দাগে সেখানকার চামড়া ভেদ করে মাংস পর্যন্ত যেন ঝলসে শুকিয়ে গিয়েছে—

কিন্তু একটা কথা নিকোলা সোফিয়া বুঝতে পারেন নি—সেই একদিন ছাড়া আর কোনদিন লর্ড টাইরোন তাঁকে দেখা দেন নি। প্রত্যক্ষ ত নয়ই, স্বপ্নেও না।

তবে কি মৃত্যুর পরপারে আত্মা বেঁচে থাকলেও—তারা পৃথিবীতে আর আসতে পারে না? আসতে পায় না!

ইতর প্রাণী

খুশি যেদিন প্রথম এ বাড়িতে আসে, সেদিনকার কথাটা বেশ মনে আছে বৈ কি!

সারারাত ধরেই বৃষ্টি চলেছে। ভোরবেলাও ছাড়বার কোন লক্ষণ নেই—বছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না; তবু উঠতেই ত হবে! তাই শুয়ে শুয়েই 'চা কৈ গো!' ব'লে হুঙ্কার ছাড়া গেল।

গৃহিণী উঠেছেন অবশ্য আগেই। তিনি রান্নাঘর থেকে হাঁক মারলেন, 'অ বাবা বাহাদুর, একবার দেখ্‌না বাবা। গলির মোড়ে গয়লাটা এসেছে কিনা! এখনও ত দুধ দিয়ে গেল না—চা হবে কিসে?'

বাহাদুর আমাদের বালক ভৃত্য। নেপালী নয়, উত্তর প্রদেশেই বাড়ি। একেবারে বালক কাল থেকে এখানে এসে পড়ায় বেশ পরিষ্কার বাংলা শিখেছে। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাতা ও একটা কলাই করা বাটি নিয়ে দুধের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

কিন্তু সদর দোরটা খুলতেই যে তার যাত্রা ব্যাহত হ'ল—সেটা ঘরে শুয়েই টের পেলাম। চাপা উত্তেজনার ভাব একটা—ছেলেমেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন।

একটু পরেই 'বাবা বাবা ত্যাখো বাহাদুরের হাতে কি!' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে আর লাফাতে লাফাতে আমার ছোট মেয়ে মিণ্টুটা এসে উপস্থিত, তার পিছনে পিছনে বাহাদুর।

বাহাদুরের হাতে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র মার্জার শিশু, এখনও বোধ হয় চোখ ফোটেনি। তার ওপর হয়ত সারারাত-ই বৃষ্টিতে ভিজেছে—লোমগুলো জলে কাদায় লেপ্‌টে গেছে, শীতে ও অনাহারে থর থর করে কাঁপছে। ভাল করে আওয়াজ বেরুচ্ছে না—এত দুর্বল, কোনমতে চিঁচিঁ-একটা শব্দ হচ্ছে মাত্র। কার বাড়ির বাচ্চা এনে পাড়ায় ছেড়ে দিয়ে গেছে! বেড়াল পোষাই বা কেন এমন ক'রে!

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। চা নেই—তার জায়গায় এই সব উৎপাত!

'ছেড়ে দিয়ে আয়, ছেড়ে দিয়ে আয়! কোথায় আঁস্তাকুড়ে নর্দমায় ঘুরেছে—নোংরা। যা, ফেলে দিয়ে এসে হাত ধো।'

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মিণ্টুর চোখ সজল হয়ে উঠল।

'না বাবা, তাহ'লে ও মরে যাবে! ওকে তাড়িয়ে দিও না—'

বাহাদুরের চোখেও করুণ মিনতি, 'থাক না বাবু, বেশ ভাল বিড়াল—দেখতে বেশ ভাল হবে এর পর।'

ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম—কথাটা সত্যিই। সাদায় কালোয় বেশ ভাল দেখতে, ল্যাজটাও লম্বা, কাবুলি বেড়ালের জাত।

তবু মুখে বললাম, 'কিন্তু ও কি বাঁচবে? আর যা নোংরা। বাড়ি ঘর নোংরা করবে, চুরি ক'রে খাবে, বেড়ালের যে অনেক গুণ!'

স্বর নরম হয়েছে বুঝতে পেরেই বাহাদুরের গলায় জোর এল। সে বললে, 'সে আমি ওকে এখনই পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি বাবু। আর ময়লা করে—সে আমি সাফ্ করব। থাক্ বাবু, য়্যা?'

বিশেষ ক'রে মেয়ের চোখের দিকে চেয়ে আর না বল্‌তে পারলুম না!

খানিক পরে উঠে দেখি, এরই ভেতর তাকে ধোয়ানো মোছানো হয়ে গেছে, মিণ্টু তার নিজের দুধ থেকে একটু একটু গরম দুধ মাটিতে ঢেলে দিচ্ছে আর বাহাদুর তুলোয় ক'রে ক'রে বেড়াল বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে। আর ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমার অন্য ছেলেমেয়েরা, বুলু টবু ভানু—এরা।

সকলেরই চোখে মুখে উৎসাহ এবং তৃপ্তি!

আমারও মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। ওদের তবু একটা খেলার জিনিস হ'ল!

বেড়ালটার নাম রাখা হ'ল খুশি। যদিচ সে পুং জাতীয় বেড়ালই। মার্জারী নয়।

খুশি দেখতে দেখতে বেড়ে উঠল। মোটাসোটা লোমওয়ালা এতখানি কাবুলি বেড়াল। ইয়া ল্যাজ।

সে এখন আমার সংসারে অপরিহার্য।

অফিস থেকে ফিরলেই লাফাতে লাফাতে এসে পায়ে গা ঘষবে আর দু'পায়ের মধ্যে ল্যাজ ফুলিয়ে ফুলিয়ে খেলা ক'রে বেড়াবে—নইলে আমারও আজকাল খারাপ লাগে।

বড় ছেলে টবুর পড়ার কাছে না বসলে তার পড়া হয় না। ওর টেবিলে খোলা খাতা কি বইয়ের ওপর গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকবে চোখ বুজে—আর টবুর যখন অঙ্ক মিলবে না—তখন তাকে খোঁচা দিয়ে বল্‌বে, 'এই খুশু বল্ না?' সে তখন জৃম্ভন ত্যাগ ক'রে একবার বলবে 'মিউ'—এ তার নিত্য কর্তব্যের মধ্যে।

ভানু, মিণ্টু, বুলু—সকলেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও। শুধু গৃহিণী যা একটু চটা—মধ্যে মধ্যে অপকর্ম ক'রে ফেলে বলে। তবে তারও মায়া পড়েছে একটু,

সেকথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। বাহাদুরটা থাকলে তারও বন্ধু হয়ে উঠত। বোধ হয়—নেই এই যা! খুশি আসবার মাস তিনেকের মধ্যেই একটা ছোট রকম চুরি ধরা পড়ায় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আর খোঁজও রাখি না।

ইতিমধ্যে আর একটি পোষ্য বেড়েছে বাড়িতে—এক কাকাতুয়া। এটা আমারই শখ। রথের মেলায় কিনে এনেছি। লাল ঝুঁটি-ওলা লালম'ন—নিজে হাতে খাওয়াই, ধোয়াই। নাম রেখেছি লালু।

গৃহিণী বলেন, 'বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।'

আমি বলি, 'গ্যাখো না—কাকাতুয়া অনেক কাজে দেয়!'

সত্যিই কাজে দিলে একদিন।

সেদিনও বাদলার রাত, ঠাণ্ডা পেয়ে সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ ক্যাঁ ক্যাঁ ক'রে কাকাতুয়াটা ডেকে উঠল—ভীষণ ঝটাপটি, মনুষ্য কণ্ঠের আর্তনাদ!

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি ছুটে!

অন্ধকারে ভাল ক'রে দেখা যায় না কিছু। শুধু এইটুকু বোঝা গেল কালো জামা আর প্যাণ্ট পরা কে একটা লোকের টুঁটি কামড়ে ধরেছে লালু, আর সে যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করছে এবং চেঁচাচ্ছে!

'চোর! চোর! বাবা লাঠি আনো।' টবু চেঁচিয়ে ওঠে।

নতুন চাকর বনমালী গিয়ে জাপ্টে ধরে চোরটাকে।

গৃহিণী সাবধান করেন 'দেখিস্ বনমালী, ছোরাটোরা নেইত—'

'আর ছোরা। চোরের বাছা টের পেয়েছেন মজাটা।'

'ওরে আলোটা কেউ জ্বাল্ না!' অসহায় ভাবে বলি। ঘুমের ঘোরটা তখনও কাটেনি। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কথা হচ্ছে আলোটা জ্বালে কে? আলো জ্বালার চেয়ে জরুরী কাজ তখন চোরকে প্রহার দেওয়া। টবু বীরদর্পে ছুটে গিয়ে ধাঁই ধাঁই ক'রে—গোটা কতক কীল চড় লাথি বসিয়ে দিল চোরটাকে।

কিন্তু এরই মধ্যে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটল।

খুশি ঘুমোয় ঘরের মধ্যে। প্রায়ই মিণ্টুর বিছানায়, মিণ্টুর বুকের কাছে শুয়ে ঘুমোয়। গোলমাল শুনে সেও বাইরে এসেছিল, তবে কোন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেনি এতক্ষণ। বোধ হয় ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। অকস্মাৎ

যেন সে ক্ষেপে গেল। একটা গভীর গর্জন ক'রেই সে লাফিয়ে পড়ল টবুর ঘাড়ের উপর—তাকে আঁচড়ে কামড়ে বিপর্যস্ত ক'রে তুললে।

ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে—কী ঘট্‌ল ভাল ক'রে বোঝবার আগেই।

ততক্ষণ গৃহিণীই বোধ হয়, বারান্দায় আলোটা জ্বেলে দিয়েছেন। ভাস্থর হাতে ছিল একটা ছড়ি, এর চেয়ে কোন ভারী হাতিয়ার খুঁজে পায়নি সে ঘুমের ঘোরে—সে সেটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলে খুশির গায়ে। আমিও গিয়ে ওর টুঁটী চেপে ধবে আছ্‌ড়ে ফেলে দিলুম ছুঁড়ে।

কিন্তু ওর এই আচরণ এতই অদ্ভুত, এত বিস্ময়কর যে ভাল ক'রে ব্যাপারটা বুঝে ছুটে আস্‌তে আস্‌তে সে টবুকে দারুণ ঘায়েল ক'রে দিয়েছে। অসংখ্য জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে বেচারীর, সবচেয়ে বাঁ চোখের কোণটা খাম্‌ছে নিয়েছে—আর একটু হ'লে চোখটাই যেত।

তবে ততক্ষণে কারণটা সবাইয়ের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চোর আমাদেরই প্রাক্তন চাকর—বাহাদুর।

বাহাদুরই যে একদা ওর প্রাণ রক্ষা করেছিল, খাইয়ে সেবা ক'বে বাঁচিয়েছিল—সামান্য ইতর প্রাণী সেটা ভোলেনি!

জানা শোনা চোর ব'লে বাহাদুর সন্ধান মতই এসেছে—এবং চুরি ক'রে ঠিক সরেও পড়ত– কেবল এই কাকাতুয়ার কথাটা জানা ছিল না ব'লেই গোলমাল বেধে গেল।

সবাই বললে 'চোরকে পুলিশে দাও' কিন্তু লালু ওর যা অবস্থা করেছে দেখলুম তারপর আব পুলিশে দেওযার কোন অর্থ হয় না। তাছাড়া সে কেঁদেকেটে সকলের হাতে পায়ে পড়তে লাগল। অগত্যা ধমক্ ধামক্ দিয়ে ছেড়েই দিলুম।

কিন্তু থানায় না দৌড়লেও তখনই ডাক্তারের কাছে দৌড়তে হ'ল। ডাক্তার এসে টবুকে ড্রেস ক'রে গেলেন—তিন চারটে ব্যাণ্ডেজ করতে হ'ল। গোটা কতক ইন্‌জেক্‌শনেরও ব্যবস্থা হ'ল। বেড়ালের নখ ভাল নয়—মন্তব্য করলেন ডাক্তারবাবু।

ছেলের পর্ব চুকিয়ে মনে পড়ল খুশির কথা।

'খুশিটা কোথা গেল রে?' প্রশ্ন করি ছেলেদের।

গৃহিণী নাম শুনেই জ্বলে ওঠেন—'বিদেয় করো বিদেয় করো ও আপদ শিগ্‌গির। তখনই বলেছিলুম আমি। ওসব বেইমানের জাত—ওদের নিয়ে অমন ক'রে মাথায় তোলবার দরকার নেই। তাত শুনবে না।'

কথাটার প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারলুম না।

'আর যা বলো বলো—ওকে বেইমান ব'লো না। ও যা ক'রেছে—ইমান্‌টা রাখতে গিয়েই করেছে। বাহাদুরই যে ওকে বাঁচিয়েছিল সেদিন—সেটা যদি ও না ভুলতে পারে মানুষের মত তবে ওকে দোষ দিতে পারো কি? মানুষের মত শিক্ষাদীক্ষা ত পায়নি!'

গৃহিণী রাগ ক'রে বললেন 'ঐ আদিখ্যেতা ক'রে ক'রেই ত এই কাণ্ড বাধালে! যেমন নিজে—ছেলেমেয়েগুলিকেও তেমনি তৈরী করছ!'

ছেলেমেয়েদের ডেকেও মতামত নিলুম।

দেখলুম তারাও খুশিকে ক্ষমা করেছে। মায় টবুও।

সুতরাং ওকে তাড়াবার প্রশ্ন আর ওঠে না। কিন্তু সে গেল কোথায়?

অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল সে ছাদের কোণে দু'তিনটে উপুড় করা ফুলগাছের টবের মধ্যে প্রায় লুকিয়ে বসে আছে।

মিণ্টু গিয়ে একরকম জোর ক'রেই ধরে নিয়ে এল।

করুণ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে এতবার টবুর দিকে চেয়ে ঘাড় হেঁট ক'রে বসল—মানুষের মতই।

যাই হোক্ ভুলে গেলুম কথাটা। ঠিক আছে। দু'দিনেই ওরা দু'পক্ষ ভুলে যাবে।

কিন্তু অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেই মিণ্টু ছলছল চোখে এসে খবর দিলে, 'বাবা, খুশি কিছু খাচ্ছে না!'

'সে কিরে?'

'হ্যাঁ বাবা। সবাই মিলে চেষ্টা করলুম কত—কিছুতেই কিছু খেলে না!'

গৃহিণী এসেও খবরটা সমর্থন করলেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার ছাখো। সেই যে টবুর বিছানার পাশে এসে বসেছে—ঠিক সেই এক জায়গায় বসে আছে। দুধ বা মাছ—একটু কিছু মুখে দিলে না! চা খাবার জন্যে অন্য দিন কি রকম করে, আজ চায়ের পিরিচ এনে মুখে ধরা হ'ল—একবার চেয়েও দেখলে না। জোর ক'রে খাবার জায়গায় ধরে নিয়ে গেল—ছুটে পালিয়ে এসে বস্‌ল আবার টবুর পাশেই!'

তবে কি ওর অনুতাপ হ'য়েছে। ঐ ধরণের প্রাণীর এত অনুভূতি আছে? বিস্মিত হই যৎপরোনাস্তি।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। পিঠে হাত রেখে আদর করলুম। চুপ ক'রে ঘাড় গুঁজে বসে রইল। দেখলুম চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কিছুতেই খাওয়ানো গেল না—হাজার সাধ্য সাধনাতেও না।

সেদিনও না, তার পরের দিনও না।

আর কোনদিনই কিছু খেলে না।

দিনসাতেক পরে টবুর বিছানার পাশে ঠিক সেই জায়গাটিতেই শুয়ে মারা গেল!

পাশাপাশি

মাসের একুশ তারিখে বাহারী এবং বিচিত্র ধরণের খাম ডাকে দেখলেই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়—এ-ত ওঁরা সশরীরে এসেই নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। জাঠ্‌তুতো দাদার কন্যার বিবাহ, সপরিবারে যাওয়া চাই-ই, কোন ওজর-আপত্তি তাঁরা শুনবেন না। অসুস্থ হয়ে পড়লে নিদেন য়্যাম্বুলেন্সে করেও যেতে হবে—ইত্যাদি? অর্থাৎ নিমন্ত্রণের কোথাও কোন ফাঁক বা ত্রুটি রইল না। আন্তরিকতার অভাব ত নেই-ই।

বিয়েটা আরও ক'দিন পরে—কিন্তু যথেষ্ট পরে নয়। ইংরেজী মাসের পঁচিশ তারিখে। আর ছ-টা দিন পরে হ'লে কার কি ক্ষতি হ'ত জানি না! অবশ্য দিনটা যাঁরা স্থির করেছেন—তাঁদের কারুরই এ-সব বিবেচনা করার কথা নয়। কন্যাপক্ষ ধনী, বরপক্ষ অবস্থাপন্ন। আমার এই দাদা কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসা করতেন—রাজসাহীতে। বুদ্ধি ক'রে যুদ্ধের সময়ই কলকাতা চলে আসেন এবং বাংলা এমন কি সুদূর আসামে পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করলেও কেন্দ্রটা থেকে যায় কলকাতাতেই। কাজেই বঙ্গ-বিভাগের লোকসানটা বদল ক'রতে হয়নি বরং 'উদ্বাস্তু' হিসাবে বহু সুবিধা আদায় ক'রে ছেড়েছেন। এখন এঁর কলকাতায় খান-কতক বাড়ি, গাড়ী-লরী-বাস—এ ছাড়া কন্‌ট্রাক্টরী ব্যবসা ত আছেই। অর্থাৎ রীতিমত বড়লোক।

পাত্রের বাবা সরকারী দপ্তরের মোটা মাইনের কর্মচারী, রিটায়ার করবার পরও চাকরী পাবেন—এই দরের অফিসার। পাত্রটিও সাহেবী ইস্কুলে ও কলেজে পড়ে যাদবপুর থেকে কী যেন পাস করেছে, এখন এক নাম করা বিলাতী ফার্মে চাকরী করে। এই বয়সেই শ-সাতেক টাকা পায় সবসুদ্ধ, এ ছাড়া আলিপুরে ফ্রি কোয়ার্টার এবং গাড়ী। বহু সৌভাগ্যে এমন জামাই মেলে। তা, অবশ্য তিনি খরচও করছেন—বৌদি নিজে এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে তিনিই জানিয়ে গেলেন, বারো-মেসে এক সেট, তোলা এক সেট, এই দুই সেট সোনার এবং এক সেট জড়োয়া গহনা দিচ্ছেন। এ বাদে ফার্ণিচার সব চন্দননগরের—একটাও খেলো জিনিস তিনি দেবেন না। মায় পিয়ানো গ্রামোফোন রেডিও—কোন কিছু বাদ নেই। ছেলেকে সিল্কের-স্যুট, গরম-স্যুট, ড্রেস-স্যুট আরও কত কি তিনি ফর্দ দিয়ে গেলেন—সবমিলিয়ে আটটি জোড়া পোশাক দিচ্ছেন। ধুতি-চাদর পাঞ্জাবী—এ সব তিনি ধরছেনই না। ওরা যেমন নগদ নিচ্ছে না—তেমনি তিনি পুষিয়ে দিচ্ছেন। ঘর-খরচা বাদে মোট ছাব্বিশ হাজার টাকা খরচ করছেন।

'তা জামাই আমার ভাই রাজা একেবারে। সত্যি বলছি, আর জন্মে ও রাজার ঘরে জন্মেছিল। কী মেজাজ কি বলব। উনি বলছিলেন পোশাকের অর্ডার দিতে সঙ্গে ক'রে একদিন ঘুরেছিলেন। ওঁর অফিসের গাড়ী পথে বিগড়ে গেল—তখনি ট্যাক্সি নিলে। ওঁকে ত ভাড়া দিতে দিলেই না—কোথাও ট্যাক্সীওলার কাছ থেকে ফিরতি টাকা নিলে না। তিন টাকা চোদ্দ আনা উঠল, সটান্ দশ টাকার নোট ফেলে দিয়ে নেমে গেল। এক জায়গায় এক টাকা ছ আনা উঠল—পাঁচ টাকার নোট! উনি সঙ্গে ক'রে ওঁর অফিসে নিয়ে এসেছিলেন। চাকর, দারোয়ান, বেয়ারা—সবাইকে দশ টাকা ক'রে বকশিস্ করলে—মায় লিফ্‌ট্‌ম্যানকে পর্যন্ত। কী মেজাজ বল দেখি ভাই। উনি তবু মিষ্টি ক'রে বকলেন—বললেন, এমন করলে ভবিষ্যতে চালাবে কি ক'রে? তা উত্তর দিলে কি জানো ভাই সেজবৌ, বললে, খরচা কমাব কেন—দরকার হয় আয় বাড়াবো!...আর দেখতেও একেবারে রাজপুত্তুর। দেখবিই ত—দেখিস্—কী রূপ। মিলির আমার বরাত ভাল।'

কথাটা শুনে আমার স্ত্রীর চক্ষু বিস্ফারিত হ'ল—ছেলেমেয়েরা—যারা তাদের পিতার দারিদ্র্য দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—তাদের দৃষ্টি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল কিন্তু আমি যেন কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। আমার একটা গল্পও মনে পড়ল কিন্তু সেটা এখানে বলা অশোভন ও অসঙ্গত—সুতরাং চুপ ক'রে গেলাম। গল্প নয়—সত্য ঘটনা—ঘটেছিল অনেকদিন আগে, প্রায় আশী-নব্বই বছর আগে। হঠাৎ খুব নোট জাল হচ্ছিল। পুলিশ কাউকে ধরতে পারে না—কাগজে কাগজে তাদের গালাগাল দেয়। হঠাৎ একদিন এক বড়লোকের বিবাহ-বাড়িতে এক কাণ্ড ঘটল। একজন বড় পুলিশ সাহেবও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তাঁর সামনেই ঘটনাটা ঘটে। উত্তর কলকাতার এক বিখ্যাত ধনী (নামটা আজ মনে নেই) তাঁর নতুন আমদানী ল্যাণ্ডো থেকে নামছেন, গায়ে দামী শালের জোড়া, তখনকার দিনেই শাল জোড়াটার দাম নাকি পড়েছিল ছাব্বিশ শ' টাকা এবং সেটা সদ্য কেনা। নামতে গিয়ে ল্যাণ্ডোর কোন্ এক খোঁচায় আটকে গেল শালের একটা জায়গা। এক মুহূর্ত থেমে সেটা খুলে নেওয়া চলত—কিন্তু তাতে বড়মানষিটা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং তিনি থামলেন না—তিনিও যত এগিয়ে চলেন শালও তত ছেঁড়ে। শেষে একেবারে অনেকখানি ছিঁড়ে যেতে গা থেকে খুলে ফেলে দিয়ে সহিসকে হুকুম করলেন বাড়ি গিয়ে আর একটা শাল নিয়ে আসতে। পুলিশ সাহেবের কেমন মনে হ'ল যে অর্থে এতখানি

নিস্পৃহতা কোনক্রমেই স্বাভাবিক নয়। সেদিন থেকে তিনি উক্ত লোকটির ওপর নজর রাখতে লাগলেন—এবং নোট জালকারী ধরা পড়তেও দেরী হল না।

ভাবী জামাতা বাবাজীর সামান্য বাবুয়ানী প্রসঙ্গে এই গল্পটা মনে আসতে নিজে নিজেই লজ্জা বোধ করলাম।

মিলির বরাত অবশ্যই ভাল। কিন্তু আমাদের বরাতে এখন বিয়েটা না হ'লেই ভাল হ'ত। হাতে কিছুই নেই—অনেক কষ্টে দশটি টাকা গৃহিণী জোগাড় ক'রলেন—অফিসের দুই বাবু মিলিয়ে ধার মিলল আর পনেরোটা টাকা। এই সম্বল ক'রেই কর্তা-গিন্নী বার হলাম এবং অনেক ঘুরে হাঁপিয়ে ঘেমে—অবশেষে বাইশ টাকা দশ আনায় এক বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ী কিনে বাড়ি ফিরলাম। মনটা কর্ কর্ করতে লাগল। এই তেইশ টাকা থাকলে ছেলেমেয়েদের কত গজ জামার কাপড় হ'ত!

বিয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখি লোকে লোকারণ্য—কিন্তু তার ভেতর আমাদের চেনা লোক কৈ? কর্ম-কর্তারা দু-একজন একেবারে গেটের কাছে আছেন বটে কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সামান্যই পরিচয়। দাদা বা ভাইপোদের কারুর টিকিও দেখা গেল না। নিজেই একপ্রকার বোকা-বোকাভাবে চাইতে চাইতে হাসি-হাসি মুখে গিয়ে একটা জায়গায় বসলাম। আমার আশে-পাশে যাঁরা বসে, কথার-ভাবে বুঝলাম এঁদের প্রত্যেকেরই কয়েকখানি ক'রে গাড়ী আছে, বাড়ি আছে এবং এঁদের আয়ও কয়েক হাজার টাকা। কারণ সারাক্ষণই কানে এল, বিভিন্ন গাড়ীর গুণাগুণ, ভাড়াটেদের দুর্ব্যবহার, কর্পোরেশনের এসেসরদের পক্ষপাতিত্ব এবং ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসারদের নির্বুদ্ধিতার—বিচিত্র ও বিবিধ বিবরণ।

ইতিমধ্যে খাওয়ার জায়গা হয়েছে জনৈক ভৃত্য মারফৎ এমনি একটা খবর পেয়ে নিজেই গরজ ক'রে উঠে পড়লাম। যাঁরা খেতে গেলেন না—কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলেন, আমাদের মত হা-ঘরেদের দিকে তাকাবার অবকাশ হ'ল না। ভালই হ'ল—কারণ অপকৃষ্ট বনস্পতি এবং সস্তার তেলে প্রস্তুত খাদ্য যতদূর সম্ভব কম খেয়ে উঠ্‌তে পারলাম। তারপর গৃহিণীর যখন খবর পাওয়া গেল তখন আমাদের মত পদাতিকদের পক্ষে কলকাতা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ট্রাম বাস বন্ধ—ট্যাক্সিরও দেখা মিলল না, কোনমতে রিক্সা চড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হ'ল। বাড়ি পৌছলাম রাত একটা।

জামাইটি অবশ্যই ভাল হয়েছে—সত্যিই খুব ত সুশ্রী, স্বভাবটিও মিষ্টি বলেই মনে হল। যাক্—মেয়েটা সুখী হবে এই ভাল।

পথে গৃহিণী কিন্তু সারাক্ষণই মুখ গম্ভীর ক'রে রইলেন। সংক্ষিপ্ত উত্তর ছাড়া সারা পথ তাঁর কাছ থেকে কিছুই বার করা গেল না।

বাড়িতে এসে গ্লাস দুই জল এবং হজমের ওষুধ খেয়ে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রশ্ন করলাম—'ব্যাপার কি বলো ত? ললাটে মেঘ কেন দেবী?'

এবার তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন,—'ছ্যাখো, আর কখনও কোন বড়লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে ব'লো না।

'কেন বলো দেখি! কী হ'ল আবার? দরিদ্রের প্রতি ধনীর ব্যবহারে যে একটুখানি তাচ্ছিল্য স্বাভাবিক এবং সঙ্গত—সে জ্ঞান কি এখনও হয়নি? তুমি কি আদর-আপ্যায়ন আশা ক'রে ওখানে গিয়েছিলে?'

'না—আদর আপ্যায়ন নয়—সে আশাও করি না—কিন্তু ওখানে গিয়ে আরও বিচিত্র শিক্ষা হয়েছে। বড়লোকের বাড়ি গেলেও শুধু হাতে যাবো।'

দেখি ক্ষোভে অপমানে তাঁর দুই চোখে জল এসে গেছে।

'আরে ব্যাপারটা কি বলোই না ছাই।'

তখন তিনি যে ইতিহাস বিবৃত করলেন তা সংক্ষেপে এই :—

যেখানে কন্যা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বসেছিলেন—সেইখানেই উপহারগুলি নেওয়া হচ্ছিল। বলাবাহুল্য উপহারের স্তূপ জমে উঠেছে তখন এবং আরও আসছে। আমার বিষয়ী দাদা সেটা অনুমান ক'রে আগে থাকতেই তাঁর একটি প্রবীণ কর্মচারীকে বসিয়ে রেখেছিলেন খাতা-কলম দিয়ে, তিনিই উপহারগুলি গ্রহণ করছিলেন এবং খাতায় জমা করছিলেন। আমার স্ত্রী স্বভাবতই একটু বেশী কৌতূহলী, তা'ছাড়া তাঁর নজরও খুব সাফ্। তিনি দূর থেকেই দেখছিলেন যে, যে খাতায় এই সব উপহার জমা করা হচ্ছিল সেটি লম্বা লেজারের ধরণের খাতা এবং তাতে কলম করা হয়েছে। তিনটি কলম কেন—দেখবার জন্য তিনি উপহার দিয়ে একটু অশোভন রকমেরই দেরী করছিলেন সেখানে। খাতাটি ভাল করেই পড়েছেন। তাতে প্রধান কলম দুটি, একটি উপহার দাতার নাম আর একটি উপহারের বিবরণ। বিবরণ কলমটি আবার তিন ভাগ করা হয়েছে—আনুমানিক একশত টাকা মূল্য এবং তদূর্ধ্ব, আনুমানিক পঞ্চাশ টাকা ও তদূর্ধ্ব—তৃতীয় ও সর্বশেষ কলমটির শিরোনামা খুব সংক্ষিপ্ত—'গাদা'।

এবং সহজেই যা অনুমেয়—আমাদের উপহারটি সেই শেষ কলম অর্থাৎ 'গাদা'তেই জমা হয়েছে। দাদার যে বৃদ্ধ কর্মচারিটি বসেছিলেন তিনি নাকি বাজার-দরের ঘুণ—ক্রিয়াকলাপের যা কিছু বাজার হাট তিনিই করেন। কাজেই আনুমানিক মূল্যে তাঁর ভুল হবার কথা নয়।

গৃহিণী যতই রাগ-গোসা করুন, মাসকাবার হ'তে তিনিই মনে করিয়ে দিলেন যে মেয়ে-জামাইকে একদিন খেতে বলা দরকার। মুখ শুকিয়ে উঠল এবং ক্ষীণ কণ্ঠে একবার প্রতিবাদও করলাম—'কী দরকার, বড়লোকেদের মন পাবো না, শুধু শুধু—এক গাদা খরচা আর ঝঞ্ঝাট!'

কিন্তু গৃহিণী সে কথা উড়িয়ে দিলেন, 'তা কি হয়, নিজের জাঠ্‌তুতো ভাই তোমার, ভাইঝির বিয়ে। মেয়ে-জামাইকে একদিন না বললে চলে? লোকে কি বলবে?'

অগত্যা—লোক লজ্জার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল। দুটিমাত্র লোকের আহারের আয়োজনে কুড়িটি টাকা অতিরিক্ত খরচা হয়ে গেল। ফল? যা পূর্বাহ্ণেই অনুমান করেছিলাম। জামাই শুধু খাদ্যবস্তুগুলো নাড়াচাড়া করলেন এবং প্রকাশ্যেই বললেন যে অফিসে লাঞ্চ খেয়ে খেয়ে তাঁর এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে—ভাত ডাল্‌ তরকারী খেলে বড্ড অস্বস্তি হয়। মিলি দু আঙ্গুলে ক'রে একটু মাছ খেলে। পায়েস খেলে তার গা-কেমন করে, মিষ্টি খেলে নাকের ডগা ঘামে—এমনি নানান কারণে অধিকাংশ খাদ্যই অস্পর্শিত রইল। আরও একটি বস্তু মিলি খেয়েছিল—একখানা বেগুনি।

যাবার সময় জামাই বাবাজী কিন্তু খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল তার আলিপুরের বাড়িতে একদিন যাবার জন্য। ছেলেটি দেখলাম সত্যিই ভাল—সৌজন্য কিংবা আন্তরিকতার অভাব নেই। শেষ পর্যন্ত একটা তারিখ নিয়ে তবে ছাড়ল। স্থির হ'ল আগামী রবিবারের পরের রবিবারে আমরা ওদের বাড়ি দেখতে যাবো। মিলি এখন থেকেই ওখানে আছে। ওর শাশুড়ী এখন আছেন বৌকে ঘর-সংসার তালিম দিয়ে চলে আসবেন দিন আষ্টেক বাদে—ছেলের কোয়ার্টারে মুসলমান চাকর—এসব তাঁর শাশুড়ী (মিলির দিদি-শাশুড়ী) বরদাস্ত করতে পারবেন না। তাছাড়া ছেলের সংসারে তিনি বসে অশান্তি করবেন, এও তাঁর পছন্দ নয়। যাই হোক—মিলির বরাতটা সব দিক দিয়েই ভাল—এটা আমার গৃহিণীও স্বীকার করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে আলিপুর যেতে হ'ল। কারণ কথা দিয়েছি। রবিবারের বিশ্রাম সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে আড়াইটে নাগাদ যাত্রা করতে হ'ল। কারণ আমাদের ট্রাম-বাস ভরসা। আড়াইটেয় না বেরোলে চারটে নাগাদ পৌছনো যাবে না। ওদিকে ফিরতে রাত হবে। তা ছাড়া সিনেমা যাবার সময়টা ওদের ছেড়ে দেওয়া দরকার।

বাবাজীর বাসাটি দেখলাম ভালই। বাগানওলা দোতলা বাড়ি। গাড়ী ত সানেই দাঁড়িয়ে। শোবার ঘরটি এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ড্‌ করা। ফার্ণিচারগুলিও কোম্পানী থেকে দিয়েছে—এক কথায় রামরাজত্ব। আমরা যেতে মিলি আনন্দিতও হল, একটু অপ্রতিভও হ'ল। তার স্বামী-সৌভাগ্যটা আমরা প্রত্যক্ষ ক'রে গেলাম এই আনন্দ। আর লজ্জা এই কারণে যে, সেদিনই ওদের বাবুর্চির কে মারা গেছে—সে সেইখানে ছুটেছে। চাকরটার জ্বর—বেয়ারাটা নাকি কলকাতায় নতুন। কিছু জানে না—চেনেও না। মিলি কোন মতে শুধু একটু চা করে দিলে। কিছুই খাওয়াতে পারলেন না বলে বার বার বাবাজী দুঃখ প্রকাশ করলেন। এ যা পোড়া জায়গা—কাছাকাছি কোন decent দোকানও নেই যে কিছু আনিয়ে দেবেন। আর একদিন আমরা যেন নিশ্চিত আসি,—নইলে তার লজ্জা রাখবার স্থান থাকবে না। ইত্যাদি—

প্রসঙ্গত গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, 'আজ তাহলে তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কি হবে? আমি রেঁধে দিয়ে যাবো নাকি—ছ্যাখো!'

জামাই ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না না—ছি! সে কি কথা। আমরা ফোন্ করে দিয়েছি, ওবাড়ি থেকে খাবার আসবে। আমরাই যেতাম—রাত্রে সিনেমার টিকিট কাটা আছে কিনা—'

অবশ্য আপ্যায়নের ত্রুটি সৌজন্যে ঢেকে গেল। জামাই বাবাজী তাঁর গাড়ী ক'রে আমাদের পৌছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। ছুটির দিনে ট্রামে-বাসে যা ভীড়!

কাছাকাছি বহু আত্মীয় থাকার জরিমানা দিতে হয় ঢের। মাস দুই না যেতে যেতে আর এক ভাইঝির বিবাহ লাগল। এটি আমার মাসতুতো ভাইয়ের মেয়ে—কমলা। আমার ভাই আমারই মত মাঝারি কেরাণী, শহরতলীতে কোনমতে একটু মাথা গোঁজার জায়গা করেছে। জামাইটিও তথৈবচ, কোন্ এক প্রাইভেট কলেজে অধ্যাপকের কাজ পেয়েছে সম্প্রতি, অতি সামান্যই

মাইনে। বাবা দেশের এক ইস্কুলে মাষ্টারী করে, সামান্য জমিজমা আছে। কোন-মতে চলে যায়। পাত্রের দাদাও কোন এক সরকারী অফিসে কাজ করে, দুজনে মেসে থাকে, সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যায়। অতি সাধারণ পাত্র। তা তার বেশী কমলার জন্য আশা করাও অন্যায়। শ্যামলা ধরণের মেয়ে, চলন-সই চেহারা, ম্যাট্রিক পাস ক'রে আই-এ পড়ছে—লেখাপড়াতে এমন কিছু ভাল নয়। গুণের মধ্যে কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লেখে—সে কবিতা নাকি পাত্রের খুব ভাল লেগেছে।

প্রশ্ন করলাম, 'তা দিতে হচ্ছে কত ?'

ভাই বললেন, 'তা বেশ। আট শ' টাকা নগদ, ষোল ভরি সোনা আর যা সচরাচর দিতে হয়—খাট বিছানা আংটি বোতাম ঘড়ি। ফার্ণিচারও চেয়েছিল, আমি হাত জোড় ক'রে রেহাই নিয়েছি।...তা সবসুদ্ধ ঘর খরচা-টরচা নিয়ে পাঁচে গিয়ে পৌঁছবে বৈ কি, তাতেই এখন অব্যাহতি পেলে বাঁচি।'

বললাম, 'পাত্র হিসেবে একটু বেশি পড়েছে না কি ? প্রাইভেট কলেজের প্রফেসর—এমন কীই বা প্রস্পেক্ট্, চিরকাল টিউশ্যনী খুঁজে বেড়াতে হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু আর ত ভাই পেলুম না। ছেলেটি মোদ্দা ভাল। খুব ঠাণ্ডা আর হাসিখুশী। পড়াশুনোও আছে ভাল।'

ভাই ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। তাঁর আরও নিমন্ত্রন বাকী—একা মানুষ! গৃহিণীর দিকে ফিরে বললাম, 'কী করবে ?'

তিনি একটু কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন, 'ছাখো পিণ্টুর জন্য এবারে যে কাপড়টা এনেছিলে না, ওটা মোটে পছন্দ নয় ওর। নানা ওজুহাতে ঠেলে ঠেলে রাখছে। আমি ওকে চিনি ত—কিছুতেই পরবে না, পরলেও দু-একদিন। আমি বলি কি, ঐ কাপড়টাই দিয়ে দাও। পিণ্টুকে বরং আর একখানা কিনে দিলে হবে।'

পিণ্টু আমার বড় মেয়ে—কাপড়-চোপড়ের রং সম্বন্ধে তার মতামত চিরকালই প্রবল। সুতরাং গৃহিণীর কথাটা প্রণিধানযোগ্য। ছোট মেয়ে পিন্টু—এখনও ফ্রক পরে। গৃহিণীও রঙ্গীন কাপড় পরতে চান না—সুতরাং কাপড়টা নষ্টই হবে ফেলে রাখলে।

তবু মনটা খুঁত-খুঁত করতে লাগল।

বললাম, 'কিন্তু ওটা নিতান্তই সাধারণ কাপড়। মোটে সাড়ে ন টাকা দাম। একটু খেলো দেখাবে না ?'

'তুমি থামো ত! ঐ ত অত দামী কাপড় দিয়েও গাদায় উঠল। কত পড়ল—কে আর তার দাম যাচাই করছে। কিছু একটা দেওয়া নিয়ে কথা। তা ছাড়া এরা ত আর তেমন উৎকট বড়লোক নন যে এসব দামের কাপড় অঙ্গে ওঠে না!'

যুক্তি অকাট্য। তবু মন খুঁত-খুঁত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিবেকের সঙ্গে একটা রফা করে ফেললাম, কবি ভাইঝির জন্য নগদ দুটাকা খরচ করে, কোন আধুনিক কবির এক চক্‌চকে মলাটযুক্ত কাব্যগ্রন্থ ক্রয় করলাম। কাপড়ের সঙ্গে বইটা মন্দ দেখাবে না।

বিবাহের দিনে অবশ্য আমার যাওয়া হ'ল না। গৃহিণীর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিলাম (ছেলেমেয়েদের কথা ভায়া বিশেষ করে ব'লে গিয়েছিলেন)। ওরা ফিরল হাসতে হাসতে। গৃহিণীও খুব খুশী দেখলাম। আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি হয়নি, গৃহিণীকে ধরে এয়োর কাজে লাগানো হয়েছে—হৈ হৈ করেছেন খুব—আবার আসবার সময় আমার জন্য এক পুঁটুলি খাবার নিয়ে এসেছেন!

আমি ত যাকে বলে shocked! বললাম, 'করেছ কি, এই বিংশ শতাব্দীতে ছাঁদা বয়ে এনেছ।'

ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে গৃহিণী বললেন, 'কী করব। জয়া কিছুতেই ছাড়লে না, বললে, ভাসুরঠাকুরের খাবার না নিয়ে গেলে আমি অনর্থ করব। কী করি বলো। খাবার সাজিয়ে বেঁধে ঠিক ক'রে রেখেছিল। একেবারে এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল!… তা যাই বলো বাবু—খাবার-দাবার ভালই হয়েছে। সস্তার ঘি হয়ত—তবু ঘিয়ের গন্ধ আছে।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'গাড়ী? গাড়ী কোথায় পেলে?'

'ওমা—তা জানো না? ঠাকুরপো যে কোথা থেকে দুখানা গাড়ী জোগাড় করেছে। বলে, আমি ত জানি—ফেরবার সময় মেয়েছেলে নিয়ে কত কষ্ট হয়—গাড়ী দুখানা অমনি পেয়েছি—শুধু তেলের খরচ। কতই বা যাবে—না হয় বিশ পঁচিশ যাক্ কিন্তু কত অসুবিধা কমে বলত!'

গরদের কাপড়খানা যত্নে ভাঁজ করতে করতে গৃহিণী বললেন, 'ওদের আমি সামনের রবিবারের পরের রবিবার এখানে খেতে বলেছি কিন্তু। শুক্রবার ওরা জোড়ে আসবে। শনিবার জয়া ওদের নিয়ে কালিঘাট যাবে—রবিবার ছাড়া সময় হবে না।'

'কী সর্বনাশ—ততক্ষণে যে মাসকাবারের মুখ হয়ে আসবে !'

'তা কি করব বল ! বলতেই ত হবে।'

'কাছাকাছি একটা দিন ঠিক করতে পারলে না ?'

'ওরা ত দেশে যাচ্ছে। সেখান থেকে কি আর আসতে পারে ! নইলে ত আমার এখান থেকেই ধূলোপায়ে দিন করাবো ইচ্ছে ছিল।'

'মিছিমিছি হাঙ্গামা করার দরকারই বা কি ছিল ? মিলিদের দিয়ে তোমার শিক্ষা হল না ?'

'করতে ত হবেই। নইলে লোকে কি বলবে ! নিজের মাসতুতো ভাইয়ের মেয়ে।...তবে এবার অত খরচ করব না—সেটুকু শিক্ষা হয়েছে !'

'আশার কথা বটে !'

কমলা এল আমারই দেওয়া কাপড়খানি পরে। ঘরে ঢুকেই আমার স্ত্রীকে প্রণাম করে বললে, 'শাড়ীখানা চিনতে পারেন জ্যাঠাইমা ? এ আপনারই দেওয়া, আমার কিন্তু বড্ড ভাল লেগেছে এখানা।'

তারপর একটু থেমে, একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে বললে, 'এ রংটা ওরও খুব পছন্দ—জানেন ! এর ভেতর দুদিন পরিয়েছে আমাকে। বলে এটা নাকি আমাকে খুব মানায় !'

বলতে বলতে ওর শ্যামল মুখে যেন সুখের ও লজ্জার আবীর ছড়িয়ে গেল। মুখ-চোখে খুশী উপচে পড়ছে।

চা খেতে খেতে আমাদের রান্নাঘরে বসে গৃহিণীকে বলছে শুনতে পেলাম, 'জানেন জ্যাঠাইমা, ওরা এমন অদ্ভুত লোক—এ কদিন একদিনও আমাকে নিজে হাতে খেতে দেয় নি। বলে নতুন বৌকে নাকি নিজে হাতে খেতে নেই। রোজ চারবার করে শাশুড়ী আমাকে খাইয়ে দিতেন।'

জামাইটির সঙ্গে আলাপ করেও খুশী হলুম। একটু গম্ভীর প্রকৃতির বটে—তবে আদৌ অহঙ্কারী নয়। ওটা স্বভাব-গাম্ভীর্য। লেখাপড়া দেখলাম সত্যিই জানে বেশ। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক—কিন্তু বাংলা সাহিত্যেও বেশ দখল আছে। তা ছাড়া অধ্যাপনা শুধু পেশা হিসাবে নেয়নি, নেশাও বটে। পড়াতে ভালবাসে।

খুব তৃপ্তি করে খেলে। জামাইটি স্বল্পভাষী—তবু খেতে খেতে বললে, 'শুক্তোটি ঠিক আমার মা'র মত রান্না হয়েছে—মনে হচ্ছে যেন মা'য়ের হাতেই খাচ্ছি।'

কমলা ফিস্ ফিস্ করে জ্যাঠাইমাকে বললে, 'ওকে আর একটু পায়েস দিন জ্যাঠাইমা, পায়েস খাবার যম।'

যাবার সময় জামাই বার বার অনুরোধ ক'রে গেল—একবার তাদের দেশে যাবার জন্য। তখনকার মত ঝঞ্ঝাট এড়াতে তাকে কথা দিলাম, একটা আজেমৌজে তারিখও ব'লে দিলাম। কে জানে যে সেই তারিখ বাবাজী মুখস্থ করে রাখবে। যে শনিবার যাবার কথা সেই শনিবার ঠিক দেড়টার সময় সে এসে হাজির—বলে 'আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। মা বাবা বিশেষ করে চিঠি লিখেছেন আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে।'

কমলাও একটা চিঠি পাঠিয়েছে ওর মারফৎ। লিখেছে—'আপনাদের জামাই এসে আপনাদের এত সুখ্যাতি করেছেন যে, এঁরা সকলেই আপনাদের দেখবার জন্য উৎসুক। অবশ্যই আসবেন!'

কী বিপদ! কোন মতে আমার কাজ এবং গৃহিণীর শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে এবং ভবিষ্যতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ত আমরা অব্যাহতি পেলাম কিন্তু ছেলেমেয়েদের সে ছাড়ল না। তাদের বিশেষ আপত্তিও ছিল না অবশ্য—কলকাতায় এই খাঁচার মত বাড়ি থেকে বেরোবার সুযোগ পেলে তাদের বোধহয় নরকে যেতেও আপত্তি নেই।

ফিরে এল ওরা লাফাতে লাফাতে। পিণ্টু বললে, বাবা ওরা রীতিমত বড়লোক। কত বড় বাড়ি—কত লোকজন কী বলব। সাত আটটা মরাই বাড়ির উঠোনে—উনিশটা গরু। সারাদিন ধরে কত লোক যে খেয়ে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। চাকরী করেন জামাইবাবু স্রেফ শখ ক'রে। আর কমলাদিকে খুব যত্ন করে বাবা। পাশ করা মেয়ে বলে শাশুড়ীরা সবাই সমীহ করে। এখনই যেন কমলাদি বাড়ির গিন্নি। খুব খাইয়েছে কদিন—পেটের অসুখ ধরবার জোগাড়। শুধু খাওয়াননি, বেয়াই মশাই বহু জিনিস আমাদের জন্য সঙ্গেও দিয়েছেন। সোনামুগের ডাল, ঘরের গুড়, মানকচু—কত কি! এক হাঁড়ি মিষ্টিও।

কমলার সৌভাগ্যে মনে মনে খুশী হলাম। বারবার আশীর্বাদ করলাম জামাইকে। তার একটা বিশেষ কারণও ছিল। সেইদিনই এক বিষম দুঃসংবাদ শুনেছি অফিসে গিয়ে। মিলির বর নাকি তার কোম্পানীর সত্তর হাজার টাকা গোলমাল করে ফেলেছিল ইতিমধ্যে। কোম্পানী ফোন করেছে, জামাই পলাতক। আদালতের লোক এসে ওখানে যা পেয়েছে তাই নিয়েছে এমন কি

মিলির নিজস্ব জিনিসপত্র সুদ্ধ। মিলি আপাতত তার বাপের বাড়িতে। দাদা ছুটোছুটি করছেন উকীল ব্যারিষ্টারের কাছে, জামাইকে বাঁচাতে হবে ত! গরজ ত এখন তাঁরই।